পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক সমাজতত্ত্ব **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায়
ESO 07 : 25

	রচনা	সম্পাদনা
একক (1)	অধ্যাপক অংশুমান চক্রবর্তী	অধ্যাপক স্বপন প্রামাণিক
একক (2)	ঐ	ঐ
একক (3)	ঐ	ঐ

পাঠক্রম : পর্যায়
ESO 07 : 26

একক (1)	অধ্যাপক অনিরুদ্ধ চৌধুরী	অধ্যাপক স্বপন প্রামাণিক
একক (2)	ঐ	ঐ
একক (3)	ঐ	ঐ
একক (4)	ঐ	ঐ

পাঠক্রম : পর্যায়
ESO 07 : 27

অধ্যাপক রেবতী মোহন সরকার অধ্যাপক স্বপন ব্যানার্জী

পাঠক্রম : পর্যায়
ESO 07 : 28

একক (1)	অধ্যাপক ত্রিদিব চক্রবর্ত্তী	অধ্যাপক প্রশান্ত রায়
একক (2)	ঐ	ঐ
একক (3)	ঐ	ঐ
একক (4)	ঐ	ঐ
একক (5)	ঐ	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

অধ্যাপিক (ড.) দেবেশ রায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ESO 07

সমাজতত্ত্বের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
25

একক 1	❑ সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ	7 — 19
একক 2	❑ সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রগতির পারস্পরিক সম্পর্ক	20 — 30
একক 3	❑ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহ	31 — 44
একক 4	❑ সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক বিপ্লব	45 — 57

পর্যায়
26

একক 1	❑ সামাজিক পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা	58 — 68
একক 2	❑ থর্স্টেইন ভেবলেন ঃ সামাজিক পরিবর্তনের প্রযুক্তিগত তত্ত্ব	69 — 77
একক 3	❑ সামাজিক পরিবর্তনের ভৌগোলিক ব্যাখ্যা	78 — 85
একক 4	❑ সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়ন ঃ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি	86 — 99

পর্যায়
27

একক 1	❑	জনবিজ্ঞান — প্রকৃতি ও বিস্তার	100 — 124
একক 2	❑	জনবিজ্ঞানের তথ্যাবলীর উৎস	125 — 139
একক 3	❑	ভারতের জনসংখ্যার আকার, বৃদ্ধি এবং বর্তমান পরিস্থিতি	140 — 160
একক 4	❑	উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজন ঃ বিভিন্ন কার্যকারণের প্রভাব	161 — 181

পর্যায়
28

একক 1	❑	ম্যালথাস পূর্ববর্তী জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা	182 — 187
একক 2	❑	ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব	188 — 198
একক 3	❑	কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব	199 — 203
একক 4	❑	মার্ক্সীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব	204 — 210
একক 5	❑	জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্ব	211 — 224

একক ১ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

১.৪ সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ

১.৫ সামাজিক পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

১.৬ সামাজিক পরিবর্তন কেন সংঘটিত হয়?

১.৬.১ সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণ

১.৬.২ সামাজিক পরিবর্তনের সামাজিক এবং সমাজবহির্ভূত পরিবেশের প্রভাব

১.৭ সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

১.৮ সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

১.৯ সারাংশ

১.১০ অনুশীলনী

১.১১ উত্তরমালা

১.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারবেন এবং এইগুলির সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ সক্ষম হবেন :—

- সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝানো হয় এবং এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য,
- সামাজিক পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্পর্ক,
- সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে কোন্ কোন্ বিষয় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে,
- দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা,
- সামাজিক পরিবর্তনে কী কী বিষয় সক্রিয়ভাবে বাধা সৃষ্টি করে

১.২. প্রস্তাবনা

পৃথিবীতে আজ থেকে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল। বারো হাজার বছর আগে কৃষি ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটে। সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে ছয় হাজার অথবা তার সামান্য কিছু আগে। সমস্ত মানব জীবনের অস্তিত্বকে যদি একটি দিনের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, কৃষি ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে ১১-৫৬ মিনিটে, সভ্যতার সূচনা ঘটেছে ১১-৫৭ মিনিটে। আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে মাত্র ১১-৫৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ড সময়ে।

আধুনিক যুগে প্রাযুক্তিক কলাকৌশলের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং ক্যামেরা, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন, বেতার থেকে উচ্চমানের কম্পিউটারের মতো বৈদ্যুতিক সামগ্রী এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি সমাজজীবনে দ্রুত পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। ফলশ্রুতি হিসাবে আধুনিক বিশ্বের জীবনযাত্রায় এবং সামাজিক সংগঠনসমূহে পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়েছে। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন হ'ল গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামগ্রিক অর্থে কী বোঝায় এককে সে বিষয়েই আলোচনা করা হবে।

১.৩. সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা

প্রকৃতি জগত সদাই পরিবর্তনশীল। মানবসমাজও এই নিয়মের উর্ধ্বে নয়। পরিবর্তনশীলতার জন্যই মানবসমাজ আদিম, বন্য, গুহাবাসী জীবনযাত্রার স্তর অতিক্রম করে আধুনিক শিল্পোন্নত সভ্যতায় পদার্পণ করেছে এবং ক্রমশ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে কেন্দ্র করেই সমাজ ব্যবস্থা আবর্তিত হয়ে থাকে। এই বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়াগুলি গতিশীল এবং পরিবর্তনমুখী। ফলস্বরূপ, সমাজ ব্যবস্থাও গতিশীল এবং পরিবর্তনমুখী। এই বিষয়ে অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ (R. M. MacIver and C. H. Page)-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, সমাজ হ'ল জীবনপ্রবাহের একটি কালক্রম যার ধারণা গতিশীল। সমাজ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, এটি কোনো ফলশ্রুতি নয়। সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের বাহ্যিক তথা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস (Heraclitus) মন্তব্য করেছেন যে, একজন মানুষের পক্ষে একই নদীতে দু'বার অবগাহন করা সম্ভবপর নয় (it is impossible for a man to step into the same river twice)। এর কারণ হ'ল মূলত দু'টি। প্রথমত, দ্বিতীয়বার নদীটি আর ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থায় থাকে না। দ্বিতীয়ত, দ্বিতীয়বার মানুষটিও আর ঠিক আগের মতো নেই। প্রথম থেকে দ্বিতীয়বারের মধ্যে যে সময়-সীমাটুকু পার হয়ে গেল সেই সময়ের মধ্যে নদী এবং মানুষ — উভয়ই বদলে গেল। এই সময়-সীমা স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী — দুইই হতে পারে। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের অনিবার্যতার কথাই হেরাক্লিটাসের উক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis)-এর মতে, সামাজিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে গেলে সময়ের ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলেই ভালো। সুতরাং, সামাজিক পরিবর্তনে সময়ের ব্যাপ্তি বা time-dimension নির্দেশ করা বিশেষভাবে দরকার। আলোচ্য সময়ের ব্যাপ্তি সংকীর্ণ হলে অনেক ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা নির্ধারণের পূর্বে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, পরিবর্তন বলতে আমরা সেই ধরনের পরিবর্তনকে বোঝাব যেটির পরিমাপ সম্ভব। যে পরিবর্তনকে আমরা পরিমাপ করতে পারব না, সেই পরিবর্তন অর্থবহও হবে না। পরিবর্তনের একক হিসাবে সমগ্র সমাজকে গ্রহণ করার পরিবর্তে সমাজের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনগুলির স্বতন্ত্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য এবং এই জাতীয় পরিবর্তনগুলি

পরিমাপযোগ্য। সুতরাং, পরিবর্তনের একক হিসাবে সমগ্র সমাজের পরিবর্তে সমাজের বিশেষ বিশেষ দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণাকে সুস্পষ্ট করার জন্য সমাজের কোনো অংশে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এটি স্মরণে রাখা দরকার যে সমস্ত ক্ষেত্রে পরিবর্তনের 'হার' পরিমাপ করা এবং পরিবর্তনের 'গতি' নির্দেশ করা সম্ভব হয় না।

এই আলোচনার পটভূমিতে সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন। সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক ব্যবস্থার সকল পরিবর্তনকেই বোঝান। এই পরিবর্তন যেমন সাময়িক অথবা স্থায়ী হতে পারে, আবার তেমনই আভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক হতে পারে। আবার এমন অনেক সমাজবিজ্ঞানী রয়েছেন যাঁরা সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ ব্যবস্থার স্থায়ী এবং অপরিহার্য অংশের পরিবর্তনকে বোঝান। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন : (ক) গৌণ ও মৌলিক অথবা কাঠামোগত পরিবর্তন এবং (খ) সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন। রস (Ross) এবং লী (Mec. Clung Lee) প্রমুখেরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক যাঁরা সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামোর অথবা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনকে বোঝান। তাঁরা সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অথবা মৌলিক পরিবর্তনকে বোঝান না। আবার, সামাজিক পরিবর্তনকে অনেক সমাজবিজ্ঞানী সামগ্রিক এবং আংশিক — এই দু'ভাগে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। আবার কেউ কেউ সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের পরিবর্তে আংশিক সামাজিক পরিবর্তনকেই সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

ইংরেজ সমাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক মরিস জিন্সবার্গ (Morris Ginsberg) 'British Journal of Sociology (September, 1958)'-এ 'Social Change' শীর্ষক রচনায় সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায় : ''সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমি বুঝি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে, অর্থাৎ সমাজের পরিধি, তার বিভিন্ন অংশের গঠন বা ভারসাম্য বা তার গঠনবিন্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তন। ... দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসের পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার অন্তর্ভুক্ত।'' [''By social change I understand a change in social structure, eg., the size of the society, the composition or balance of its parts or the type of its organisation ..... The term 'social change' must also include changes in attitudes and beliefs.''] তবে এই দু'ধরনের পরিবর্তন পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলে যেমন আচার-ব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে; আবার তেমনই আচারব্যবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশ্বাসের পরিবর্তন কাঠামোগত পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। এইভাবেই এই দু'ধরনের পরিবর্তন পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে থাকে।

অধ্যাপক কিংস্লে ডেভিস (Kingsley Davis) এর মতে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজের গঠন এবং কার্যধারা অর্থাৎ সমাজ কাঠামো এবং কার্যাবলীর পরিবর্তনকে বোঝানো হয়। সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন (cultural change)-এর কথা বলেছেন। ডেভিস সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের পার্থক্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মনে করেন যে, এমন অনেক সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আছে, যা সামাজিক কাঠামোকে কোনোভাবেই স্পর্শ করে না। এ ক্ষেত্রে তিনি বাচন এবং উচ্চারণভঙ্গির পরিবর্তনের (phonetic change) উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, উচ্চারণভঙ্গির পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অন্তর্গত এবং এর সাথে সমাজ কাঠামোগত পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ডেভিসের এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না।

কারণ, উচ্চারণভঙ্গির পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত নয়। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতির ফলে

যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষাবলম্বী মানুষদের উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গিতে কিছু কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গিগত পরিবর্তন বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সহজসাধ্য করে। ফলস্বরূপ, প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক কাঠামোতে অল্প-বিস্তর পরিবর্তন ঘটে। যেহেতু, সমাজ এক এবং অভিন্ন, তাই কাঠামোগত এবং সাংস্কৃতিক দিকের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।

লুণ্ডবার্গ (G. A. Lundberg), লারসেন (Otto N. Larsen) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সমাজবদ্ধ মানুষের আন্ত-মানবিক সম্পর্ক সমূহের প্রতিষ্ঠিত ধারা এবং আচার-আচরণের মানের যে কোনো ধরনের পরিবর্তনকেই 'সামাজিক পরিবর্তন' বলে আখ্যা দেওয়া যায়। অধ্যাপক ম্যাকাইভার (R. M. MacIver) এবং পেজের (C. H. Page) অভিমত অনুসারে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক পরিবর্তন হ'ল মূলত সামাজিক সম্পর্কগুলির পরিবর্তন। গিলিন এবং গিলিন (Gillin and Gillin) মন্তব্য করেছেন যে, সমাজস্বীকৃত জীবনধারার পরিবর্তনই হ'ল সামাজিক পরিবর্তন।

অধ্যাপক বটোমোর (T. B. Bottomore) সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, সামাজিক পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন ধরনের মতবাদ বর্তমান, সেগুলি ইতিহাসের দর্শন অথবা সাংস্কৃতিক নৃবিদ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি আরও বলেছেন যে, বিবর্তন, উন্নয়ন, প্রগতি সম্পর্কিত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে যে মতবাদগুলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, সেগুলির মধ্যে নানা সমস্যা নজরে পড়ে। এইসব সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মানবসমাজের যাবতীয় ইতিহাসগত পরিবর্তনই সাধারণভাবে সামাজিক পরিবর্তন। তিনি বলেন যে, কোঁৎ (Auguste Comte) সামাজিক পরিবর্তনকে বৌদ্ধিক পরিবর্তনের ফল হিসাবে দেখিয়েছেন। বৌদ্ধিক উন্নয়নের উপাদান হিসাবে নৈতিক উন্নতি, অহংবাদের বদলে পরার্থবাদের প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনের কথা তিনি বলেছেন।

মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সমর্থকরা সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণ এবং যাবতীয় নিয়মকানুনের অনুসন্ধানের পক্ষপাতী। কারণ, এইগুলি সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাঠামো এবং কার্যাবলীতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পাদিত করে। মার্ক্সীয় দর্শনকে মূলত বস্তুবাদী দর্শন বলা যায়। মার্ক্সীয় চিন্তাধারা সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়ে দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। মার্ক্সীয় মতবাদ অনুযায়ী, শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই সমাজে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তন কেবলমাত্র আংশিক পরিবর্তন নয়। মার্ক্সবাদীরা সামাজিক পরিবর্তনকে বস্তুনিষ্ঠ এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হিসাবে বিচার-বিশ্লেষণের পক্ষপাতী। কারণ, এই পরিবর্তন বস্তুনিষ্ঠ সামাজিক নিয়মাবলীর (objective social laws) অধীন। মার্ক্সীয় দর্শনানুযায়ী, সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত মৌলিক পরিবর্তনে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং, সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা বিচার-বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজে বসবাসকারী মানুষের জীবনধারাগত পরিবর্তন। এই পরিবর্তন হ'ল দিক এবং মাত্রা-নিরপেক্ষ। সমাজের যে কোনো পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন নয়। সামাজিক কাঠামো, সংগঠন, মিথস্ক্রিয়া (social inter-actions), সামাজিক কার্য-প্রক্রিয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত হয়। সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) এবং মূল্যমানগত (normative) কাঠামোতে পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তন হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

১.৪. সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞার মধ্য দিয়েই এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই অংশে সেই বিষয়েই আমরা আলোচনা করব।

প্রথমত, সামাজিক পরিবর্তন সর্বজনীন। অর্থাৎ, সব সমাজেই সামাজিক পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। তবে কোনো সমাজে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে দ্রুতগতিতে, আবার কোথাও বা মন্থরগতিতে। মূলত কোনো সমাজই প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণভাবে স্থিতিশীল নয়। এই কথা যেমন আদিম, সরল সমাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ঠিক তেমনই আধুনিক, উন্নত, জটিল সমাজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক পরিবর্তনের গতি এবং মাত্রা বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারণ, যুগ বা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সামাজিক পরিবর্তনের গতি এবং মাত্রার তুলনায় স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সামাজিক পরিবর্তনে সহায়ক উপাদানগুলির প্রকৃতিগত পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনকে আরো গতিশীল করে তুলেছে।

তৃতীয়ত, সামাজিক পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। প্রকৃতিজগত সততই পরিবর্তনশীল। কাজেই, মানবসমাজ প্রকৃতিগতভাবেই পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ। মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদার পরিবর্তনের সূত্র ধরেই সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন যেমন প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিকভাবে ঘটতে পারে, আবার সমাজবদ্ধ মানুষের পরিকল্পনা এবং উদ্যোগের ফলেও ঘটতে পারে।

চতুর্থত, সামাজিক পরিবর্তন হ'ল সেই ধরনের পরিবর্তন যার প্রভাব সমগ্র জনমানসে পড়ে। কোনো একজন ব্যক্তির জীবনধারায় পরিবর্তনকে আমরা সামাজিক পরিবর্তন বলতে পারি না। অর্থাৎ, সামাজিক পরিবর্তন ব্যক্তিগত নয়।

পঞ্চমত, সামাজিক পরিবর্তন বৈচিত্র্যময়। এই পরিবর্তন কখনও বা সুপরিকল্পিত এবং একমুখী, আবার কখনও বা অপরিকল্পিত এবং বহুমুখী। পরিবর্তন আবার কখনও দীর্ঘস্থায়ী অথবা ক্ষণস্থায়ী, কখনও উন্নতিসূচক এবং জনকল্যাণমুখী, কখনও বা অবনতিসূচক অথবা ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

ষষ্ঠত, সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত এবং শ্লথগতিসম্পন্ন হতে পারে। কখনও কখনও সামাজিক পরিবর্তন এত দ্রুতগতিতে ঘটে থাকে যে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আকস্মিক বলে মনে হয়। সমাজে কোনো বিপ্লব সংঘটিত হলে অথবা বিশ্বযুদ্ধের ফলে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে সামাজিক পরিবর্তন সম্পাদিত হতে পারে। কোনো কোনো সমাজে সামাজিক পরিবর্তন এতই ধীরে হয় যে তাকে উপলব্ধিই করা যায় না। গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তনের বেগ বা গতির তুলনায় শহরে পরিবর্তনের বেগ বা গতি অপেক্ষাকৃত বেশি।

সপ্তমত, সামাজিক পরিবর্তনে সহায়ক উপাদানগুলি অস্থায়ী এবং জটিল প্রকৃতির হওয়ার জন্য সামাজিক পরিবর্তন অনিশ্চিত হতে পারে। এই অনিশ্চয়তার জন্যই সামাজিক পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আগে থেকেই কিছু অনুধাবন করা যায় না। সামাজিক পরিবর্তন কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা ধারা মেনে চলে না।

অষ্টমত, সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন প্রকৃতির কারণ থাকলেও তাদের মধ্যে পারম্পর্য থাকে বলেই এই পরিবর্তনের মধ্যে একটি নিরবচ্ছিন্নতা বজায় থাকে। যে কোনো সমাজ তার নিজস্ব ধারা, স্বকীয়তা অব্যাহত রাখে সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও। ফলে মানবসমাজের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

সর্বোপরি, সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেমন বস্তুগত দ্রব্য সামগ্রীর পরিবর্তন হয়, ঠিক তেমনই সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন বা সংস্কার সাধিত হতে পারে। মানুষের খাদ্যাভ্যাস অথবা খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালীর পরিবর্তন যেমন ঘটতে পারে, আবার মানুষের সম্পর্কেরও পরিবর্তন হতে পারে। ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্রের মতে, সাবেকী আমলের কর্তৃত্বমূলক যৌথ পরিবার থেকে আধুনিক দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবারে রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

১.৫. সামাজিক পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনার সময় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা আমরা করেছি। এই অংশে আমরা এই বিষয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করব।

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে এই পরিবর্তন হ'ল সমাজ কাঠামো, কার্যাবলী এবং সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হ'ল সংস্কৃতির যেকোনো ক্ষেত্রে অর্থাৎ শিল্পকলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন ইত্যাদিতে এবং সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন রূপ এবং নিয়মাবলীর পরিবর্তন। অর্থাৎ, এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণাটি সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা থেকে বৃহত্তর এবং সামাজিক পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরই অংশবিশেষ।

সমস্ত ধরনের সামাজিক পরিবর্তনই সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অঙ্গ কিন্তু সমস্ত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তনের অঙ্গ হবে — এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে তখনই সামাজিক পরিবর্তন বলা হবে যখন এই পরিবর্তন মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক সংগঠনসমূহকে প্রভাবিত করবে এবং তাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, সঙ্গীতের কিছু কলাকৌশল, চিত্রাঙ্কনের কিছু ধরন, কবিতা, গদ্য এবং নাটক লেখার কিছু নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন কিন্তু সম্পূর্ণ অর্থে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। তাদের সামাজিক পরিবর্তন এই কারণে বলা হয় না, কারণ তারা অস্তিত্বশীল সামাজিক কাঠামো, সামাজিক সংগঠন, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয়।

অন্যদিকে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংগঠিত শ্রম (organized labour)-এর উদ্ভব সামাজিক পরিবর্তনকেই নির্দেশ করে। একই ধরনের পরিবর্তন সূচিত হবে যদি সাম্যবাদ (communism) প্রতিষ্ঠার দাবি ফলপ্রসূ হয়। এই দুটি পরিবর্তন মানবিক সম্পর্ক এবং সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বিবিধ পরিবর্তন সাধন করে। নিয়োগকর্তা (employer) এবং কর্মচারী (employee), শাসক এবং শাসিত-এর পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনকে সূচিত করে। আবার, বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংগঠন, প্রশাসনিক পদ্ধতি, আইন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিবিধ কর্মসূচীতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনগুলি সম্মিলিতভাবে মানুষের জীবনধারার ওপরও প্রভাব ফেলে। তাই, এদের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হিসাবেও উল্লেখ করা যায়।

সুতরাং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ব্যাপকতা সামাজিক পরিবর্তনের থেকে অনেক বেশি। যদিও, সংস্কৃতির কোনো অংশ সাধারণভাবে সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পর্কহীন থাকে না, তবুও কোনো কোনো সময় লক্ষ্য করা যায় যে,

সংস্কৃতির কোনো শাখায় পরিবর্তন সমাজ কাঠামোয় কোনো প্রত্যক্ষগোচর প্রভাব ফেলতে পারে না। কাজেই, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সেই ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকে নজর দেব যেটি সামাজিক সংগঠনের ওপর কোনো প্রভাব ফেলে।

১.৬. সামাজিক পরিবর্তন কেন সংঘটিত হয়?

সামাজিক পরিবর্তন মূলত একটি জটিল প্রক্রিয়া। এর কারণ এবং প্রভাব সব সময় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। বিশ্বজগতে কোনো কিছু ঘটার পিছনে কেবলমাত্র একটি কারণ থাকে না। অনেকগুলি কারণের (plurality of causation) সমন্বয়ে কোনো কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে, অনেকগুলি কারণ সম্মিলিতভাবে একই ধরনের ফলাফলের জন্ম দেয়।

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ হ্যারি. এম. জনসন (Harry M. Johnson) এর মতে, সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি মোটামুটিভাবে তিন ধরনের। প্রথমত, সামাজিক পরিবর্তনের কারণগুলি বিশেষ ধরনের কোনো সমাজ ব্যবস্থা (social system) অথবা সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্নিহিত অবস্থায় থাকে। দ্বিতীয়ত, সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সামাজিক পরিবেশের প্রভাবেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। সর্বোপরি, সমাজবহির্ভূত পরিবেশ (non-social environment)-এর প্রভাবেও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। জনসনের মতে, এই ধরনের কারণসমূহ বিভিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। একটি পরিবর্তন অনেকগুলি পরিবর্তনের জন্ম দেয়। সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলি এতটাই পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ যে, যে কোনো একটি অংশের পরিবর্তন অন্যান্য অংশগুলিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসে।

১.৬.১ সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণ

সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দ্বন্দ্ব (conflict)-এর কথা। সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই স্বার্থকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বার্থকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের প্রকাশ সর্বাধিক। ক্ষমতা (power)-এর ধারণা বিভিন্ন উদ্দেশ্য অথবা লক্ষ্য পূরণের জন্য দ্বন্দ্ব বা সংঘাতকেই নির্দেশ করে। স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম-নীতির মাধ্যমে স্বার্থ বা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের মীমাংসার চেষ্টা করা হয়।

সুতরাং, দ্বন্দ্ব ব্যতীত সমাজ কল্পনা করা যায় না। দ্বন্দ্ব সমাধানের যে-কোনো ধরনের প্রচেষ্টাই পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা যাদের কাছে অনুকূল এবং যাদের কাছে প্রতিকূল বলে বিবেচিত হয়, তাদের মধ্যে সবসময়ই এক ধরনের সুপ্ত (latent) দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। এই দ্বন্দ্ব তখনই প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন প্রতিকূলতার পাল্লা অনেক ভারী হয়ে যায় যা সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত করে।

সামাজিক সমস্যা, যেমন-জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় যা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এই সমস্ত সামাজিক সমস্যার উৎপত্তি হয় কিছু না কিছু আভ্যন্তরীণ অসম্পূর্ণতা (internal deficiencies)-এর জন্য। যদি এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়, তাহলে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার কিছু না কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। সুতরাং, সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি পরিবর্তনের পটভূমি প্রস্তুত করে। এই বিষয়টিকে একটি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা যেতে

পারে। ভারতবর্ষে জনসংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে জনসাধারণকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি (birth control measures), পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কর্মসূচীসমূহকে (family planning programmes) অনুসরণের ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। এই সচেতনতা অবশ্যই আমাদের সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ, বিবাহ এবং পরিবার ব্যবস্থা ও নীতিবোধকে প্রভাবিত করবে এবং ঐসমস্ত ক্ষেত্রে কোনো না কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হবে।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজে দ্বন্দ্ব আরো বিশেষ এবং ব্যাপকভাবে ঘনীভূত হয়। বিপ্লব সংঘটনের পিছনে নানাধরনের উপাদানের অস্তিত্ব বর্তমান। শোষণ, স্বাধীনতার অবদমন, ক্ষুধা, দুর্নীতি, কূটনৈতিক পরাজয়, দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যের উচ্চমূল্য, নিম্ন মজুরি, বেকারত্ব এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণের জন্য আমেরিকার বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয় যেগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

১.৬.২. সামাজিক পরিবর্তনে সামাজিক এবং সমাজবহির্ভূত পরিবেশের প্রভাব

সমাজ কাঠামোর ওপর সামাজিক পরিবেশ এবং সমাজবহির্ভূত পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। সমাজ পরিবর্তনের ওপর সমাজ বহির্ভূত পরিবেশ অপেক্ষা সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অনেক বেশি। সাধারণ পরিস্থিতিতে সমাজ কাঠামোর ওপর সমাজবহির্ভূত পরিবেশের প্রভাব খুব একটা বেশি নয়। মূলত, মানবিক ক্রিয়াকলাপের দৌলতে সমাজবহির্ভূত পরিবেশে পরিবর্তন আসে। মৃত্তিকার ক্ষয় (soil erosion), বৃক্ষছেদন, খনিজ সম্পদের নিঃশেষীকরণ প্রভৃতি সামাজিক পরিবর্তনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট সমাজবহির্ভূত পরিবেশের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রস্তুত করে।

সামাজিক পরিবর্তনের সামাজিক পরিবেশের প্রভাব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। রাজনৈতিক মৈত্রীর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সামরিক আক্রমণ, শান্তিপূর্ণ অভিবাসন (peaceful immigration), বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন ইত্যাদি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করে। ঐসমস্ত ঘটনাগুলির যে কোনো একটির প্রভাবে সমাজ কাঠামোর কোনো অংশে প্রাথমিক পরিবর্তন হয় এবং ঐ পরিবর্তনের প্রভাব সমাজ কাঠামোর অন্যান্য অংশেও পরিব্যাপ্ত হয়।

১.৭. সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ

সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক মহলে অনেক আগে থেকেই বিতর্ক এবং আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ (cultural anthropologists) এই বিষয়ে বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ববিদ্‌দের দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায় —

(১) যাঁরা সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির সমর্থক (cultural diffusionists) এবং (২) যাঁরা উদ্ভাবনী শক্তির সমর্থক (inventionists)।

সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির সমর্থকদের মতে, সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির (cultural diffusion) ফলেই সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। পরিব্যাপনের মধ্য দিয়েই কোনও বিশেষ সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষের আচার-ব্যবহারের ওপর ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়ে। সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির মধ্য দিয়েই সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানসমূহ এককভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর থেকে অন্য একটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই মতের সমর্থকদের অভিমত হ'ল, যেহেতু উদ্ভাবন (invention) একইভাবে সব সময় সব সমাজে ঘটে না, সেহেতু প্রত্যেকটি সমাজকে

প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিজ উন্নতির জন্য অন্য সমাজ থেকে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ গ্রহণ করতে হয়। সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির পদ্ধতির মাধ্যমেই অনেক উপজাতি সম্প্রদায় অন্য সংস্কৃতির উপাদানসমূহ গ্রহণ করে উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ হিসাবে আমরা নিউজিল্যান্ডের মাওরি (Maori) সম্প্রদায়ের উল্লেখ করতে পারি, যারা অন্যদের সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে একশ বছরের মধ্যেই সভ্য হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সাংস্কৃতিক পরিব্যাপন প্রক্রিয়াকে সামাজিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম উৎস বলে মনে করা হয়।

উদ্ভাবন (invention) প্রক্রিয়ায় যাঁরা সমর্থক, তাঁদের অভিমত হ'ল মানুষের উদ্ভাবন করার অন্তর্নিহিত ক্ষমতাই সামাজিক পরিবর্তনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। সামাজিক সংগঠন অথবা সাংস্কৃতিক পটভূমিতে উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নতুন পরিকাঠামোর মধ্যে পরিচিত প্রলক্ষণগুলিকে (known traits) পুনরায় নতুনভাবে সাজানো অথবা বিন্যস্ত করা হয়। বস্তুগত অথবা অ-বস্তুগত — যাই হউক না কেন, উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বিদ্যুতের উদ্ভাবন শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার সমর্থকদের (inventionists) মতে, সাংস্কৃতিক পরিব্যাপনের মাধ্যমেই যে কেবলমাত্র সামাজিক পরিবর্তন হয় — এটি যথার্থ নয়। তাঁদের মতে, মানুষ নিজ অন্তর্নিহিত ক্ষমতার মাধ্যমেই পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ।

সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কে পরিব্যাপন এবং উদ্ভাবন সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিসমূহের মধ্যে যথেষ্ট সারবত্তা বর্তমান। তবে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ অথবা বর্জন করা যায় না। কিন্তু, সামাজিক পরিবর্তনের উৎসকে এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

১.৮. সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ

একথা অনস্বীকার্য যে, সামাজিক পরিবর্তন সার্বজনীন (universal)। অর্থাৎ সমস্ত ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় কোনো না কোনো সময়ে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু, সামাজিক পরিবর্তনের গতিপথ সর্বদা সমান হয় না। পরিবর্তনকে কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়। এমন কোন সমাজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না যেখানে পরিবর্তনকে কোনো ধরনের প্রশ্ন অথবা প্রতিরোধ ব্যতীত মানুষ স্বাগত জানাচ্ছে। ভারতবর্ষেও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কুপ্রথা, যেমন বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি উচ্ছেদের জন্য দীর্ঘসময় ধরে সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকারের বিরোধিতা দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছিল, ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রামও সুদীর্ঘ সময় ধরে অব্যাহত হয়েছিল। প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ব্রিটেনে নারী ভোটাধিকারের অধিকারকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে যে, সামাজিক পরিবর্তনের স্বচ্ছন্দ গতি বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার দ্বারা ব্যাহত হয়েছিল। এই অংশে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করব।

সামাজিক পরিবর্তন নির্ভরশীল নতুন নতুন বস্তু, প্রযুক্তি, চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা ইত্যাদির উদ্ভাবনের ওপর। যদি মানুষ নতুন কিছু গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হয়, তাহলে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খুব একটা বাধা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু নতুন কিছু উদ্ভাবনের মানসিকতার অভাব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

সমাজবদ্ধ মানুষ নতুন কিছু উদ্ভাবনকে যদি বর্জন করে, তাহলেও সামাজিক পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সমাজে নতুন কিছু উদ্ভাবন মানুষের স্বাগত লাভের পরিবর্তে বিরোধিতারই বেশি সম্মুখীন

হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ডঃ উইলিয়াম হার্ভে (Dr. William Harvey)-এর রক্ত সংবহন তত্ত্ব (Blood Circulation Theory), গ্যালিলিও (Galileo)-এর গ্রহ-নক্ষত্র এবং পৃথিবীর পরিভ্রমণসংক্রান্ত তত্ত্ব প্রাথমিক ক্ষেত্রে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল।

নতুন ধরনের উদ্ভাবনের অসম্পূর্ণতা এবং নতুন ধরনের বস্তু, চিন্তা-ভাবনা এবং অভ্যাস গ্রহণের ভয় সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ভারতীয়রা প্রথম দিকে ব্রিটিশ ভেষজবিদ্যা, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতিকে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের চোখে দেখত। তাছাড়াও ঐতিহ্যের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ও মানুষের অজ্ঞানতা নতুনের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সমাজে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যারা প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সুবিধাগুলি ভোগ করে, তারা নতুন কোনো পরিবর্তনকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। কারণ, তার ফলে তাদের প্রচলিত ব্যবস্থার সুবিধাগুলি হারাতে হতে পারে। এর ফলে তারা নতুন কোনো পরিবর্তনকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দিক থেকে অপারগ থাকে। মার্ক্সের মতে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিপত্তিশালীদের এই প্রতিবন্ধকতা কেবলমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই দূর করা যেতে পারে।

পুরনো বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে নতুন কিছু গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজন মানুষের সৃজনশীলতা, পরিবর্তনীয়তা এবং যুক্তি ও বিচারবোধ। এইগুলি অনুপস্থিত থাকলে নতুন চিন্তাভাবনা, নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে মানুষের যথার্থ কোনো ধারণাই গড়ে উঠবে না। ফলে সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হবে না। আবার, অক্ষম এবং দুর্নীতিপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাও সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। প্রশাসনিক আমলাতান্ত্রিক পরিকাঠামো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রক্ষণশীল হয় এবং সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

কায়েমী স্বার্থ (vested interest)-ও কোনো কিছু উদ্ভাবনের পিছনে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যে সমস্ত মানুষ মনে করে যে, সামাজিক পরিবর্তন তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবে, তারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করে। বিরোধী গোষ্ঠী হিসাবে তারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থাৎ, নিজ স্বার্থক্ষুণ্ণকারী এমন কিছু পরিবর্তন তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সমাজে পুঁজিপতি সম্প্রদায় নিজ স্বার্থক্ষুণ্ণকারী শ্রমিক উন্নয়নমূলক আইনের বিরোধিতা করে।

তবে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা যে ক্ষতিকারক তা আমরা বলতে পারব না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধিতা যথার্থ বলে প্রতিভাত হয়। একটি নির্দিষ্ট সামাজিক মূল্যবোধের নিরিখে কোনো কোনো উদ্ভাবন অথবা পরিবর্তন ক্ষতিকারক বলে বিবেচিত হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থার (totalitarian system) প্রবর্তনের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে বিরোধিতার যোগ্য। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতা যদি বেশি হয় তাহলে ঐ উদ্ভাবনের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি গ্রহণযোগ্য। সুতরাং, সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকতার কিছু শুভ দিকও বর্তমান। সমস্ত ধরনের পরিবর্তন কিন্তু মানবজাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক বলে বিবেচিত হয় না।

১.৯. সারাংশ

পরিবর্তনশীলতাই প্রকৃতির নিয়ম। মানবসমাজও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মানবসভ্যতা গতিশীল এবং পরিবর্তনমুখী। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সমাজের বিভিন্ন অংশের পরিমাপযোগ্য পরিবর্তনগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণ, সমাজের কোন্ অংশে কি ধরনের পরিবর্তন

ঘটছে তা নির্ধারণ করার মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব হয়। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে সমাজবিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞার মধ্য দিয়েই সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি হয়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি সম্পর্ক বর্তমান। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা থেকে বৃহত্তর এবং সামাজিক পরিবর্তন সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরই অংশমাত্র।

সামাজিক পরিবর্তন ঘটার পিছনে যে সমস্ত অন্তর্নিহিত কারণ বর্তমান, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যাসমূহ, বিপ্লব ইত্যাদি। সামাজিক পরিবর্তনে সামাজিক এবং সমাজবহির্ভূত পরিবেশের প্রভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির সমর্থকগণ এবং উদ্ভাবনী শক্তির সমর্থকগণ নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সামাজিক পরিবর্তন সাধনে নানা ধরনের উপাদান বাধা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কু-প্রথা, নতুন কিছু উদ্ভাবনের মানসিকতার অভাব, নতুন কিছু উদ্ভাবনকে বর্জন, নতুন ধরনের উদ্ভাবনের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তন সাধনে বাধা দান করে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সামাজিক পরিবর্তন সার্বজনীন। অর্থাৎ সকল সমাজেই কোনো না কোনো সময়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

১.১০. অনুশীলনী

১। নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

		ঠিক	ভুল
(ক)	অপরিবর্তনীয়তাই মানব সমাজের নিয়ম।	☐	☐
(খ)	সামাজিক পরিবর্তনে সময়ের ব্যাপ্তি নির্দেশ করা প্রয়োজন।	☐	☐
(গ)	অনেক সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক পরিবর্তনকে সামগ্রিক এবং আংশিক — এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন।	☐	☐
		ঠিক	ভুল
(ঘ)	অধ্যাপক কিংসলে ডেভিসের মতে, বাচন এবং উচ্চারণভঙ্গিগত পরিবর্তন সমাজ কাঠামোগত পরিবর্তনের অন্তর্গত।	☐	☐
(ঙ)	কোঁতের অভিমত হ'ল, সামাজিক পরিবর্তন বৌদ্ধিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতি।	☐	☐
(চ)	সামাজিক পরিবর্তনকে বস্তুনিষ্ঠ এবং ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন মার্কসবাদীরা।	☐	☐
(ছ)	সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারণা থেকে ব্যাপক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনেরই অংশবিশেষ।	☐	☐

(জ) বিবিধ কারণের সমন্বয়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। ☐ ☐

(ঝ) সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির সমর্থক এবং উদ্ভাবনী শক্তির সমর্থক — এই দুই দলেরই অভিমতের গ্রহণ-যোগ্যতা বর্তমান। ☐ ☐

(ঞ) সামাজিক পরিবর্তনে গতি প্রতিবন্ধকতাহীন। ☐ ☐

২। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে অধ্যাপক জিনস্‌বার্গের অভিমত কী ছিল?

(খ) অধ্যাপক কিংস্‌লে ডেভিস সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বুঝিয়েছেন?

(গ) সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে মার্কসবাদীদের বক্তব্য কী ছিল?

(ঘ) সামাজিক পরিবর্তনের উৎস সম্পর্কে সাংস্কৃতিক পরিব্যাপ্তির সমর্থকদের বক্তব্য বিষয় উপস্থাপিত করুন।

(ঙ) সামাজিক পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভূমিকা কী?

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিশ্‌দ উত্তর লিখুন ঃ

(ক) সামাজিক পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(খ) 'সামাজিক পরিবর্তন' এবং 'সাংস্কৃতিক পরিবর্তন' বলতে আপনি কী বোঝেন?

(গ) সামাজিক পরিবর্তন ঘটার পিছনে যে সমস্ত কারণ বর্তমান সেগুলি আলোচনা করুন।

(ঘ) সামাজিক পরিবর্তন মসৃণ গতিতে অব্যাহত থাকে — এই বক্তব্যের কী আপনি বিরোধী? তাহলে কেন?

১.১১. উত্তরমালা

১। (ক) ভুল ; (খ) ঠিক ; (গ) ঠিক ; (ঘ) ভুল ; (ঙ) ঠিক ;
(চ) ঠিক ; (ছ) ভুল ; (জ) ঠিক ; (ঝ) ঠিক ; (ঞ) ভুল।

১.১২. গ্রন্থপঞ্জী

১। কর পরিমল ভূষণ ঞ্জ সমাজতত্ত্ব ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ; কলকাতা ; ১৯৮২ (তৃতীয় সংস্করণ)

২। মহাপাত্র অনাদিকুমার ঞ্জ বিষয় সমাজতত্ত্ব ; ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন ; কলকাতা ; ১৯৯৬ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

৩। MacIver, R. M. And Page, Charles H. : Society — An Introductory Analysis ; MacMillan; London ; Melbourne ; Toronto ; 1967.

৪। Rao, C. N. Shankar : Sociology — Primary Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought ; S. Chand & Company Ltd. ; New Delhi ; 2000 (Third Revised and Enlarged Edition).

একক ২ ❑ সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রগতির পারস্পরিক সম্পর্ক

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ সামাজিক বিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

২.৪ সামাজিক বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণার সমালোচনা

২.৫ সামাজিক প্রগতির অর্থ

২.৬ সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন এবং প্রগতির পারস্পরিক সম্পর্ক

২.৭ সারাংশ

২.৮ অনুশীলনী

২.৯ উত্তরমালা

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর একটি সুচিন্তিত এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সমর্থ হবেন এবং এইগুলির সঠিক বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন ঃ—

- সামাজিক বিবর্তন কাকে বলে,
- সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর অভিমত এবং তাঁদের সমালোচনা,
- সামাজিক প্রগতির অর্থ এবং এর প্রকৃত সংজ্ঞা নির্ধারণে সমস্যা,
- সামাজিক প্রগতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ,
- সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রগতির পারস্পরিক সম্পর্ক

২.২. প্রস্তাবনা

প্রকৃতি জগত কখনই স্থিতিশীল নয়। এটি সদা পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন যেহেতু প্রকৃতির নিয়ম, সেইহেতু পৃথিবীর সর্বত্রই পরিবর্তনশীলতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতি জগতের মতো সমাজও স্থিতিশীল নয় — এটিও পরিবর্তনশীল। সমাজে পরিবর্তন ধারাবাহিক এবং নিরবচ্ছিন্ন। সমস্ত সমাজেই সমস্ত সময়ই সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেকোনো সমাজ এবং সংস্কৃতি — তা যতই সনাতন এবং রক্ষণশীল হোক না কেন — সবসময়ই পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে যায়। এখানেই এসে পড়ে বিবর্তন এবং প্রগতির প্রশ্ন। পূর্ববর্তী এককে সামাজিক পরিবর্তনের অর্থকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এককে সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২.৩. সামাজিক বিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

সমাজবিদ্যার মূল আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল মানবসমাজ। কিন্তু এই মানবসমাজ হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক সমাজব্যবস্থার। মানবসমাজের এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াটি অবিরাম এবং ধারাবাহিক। অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ এই বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সামাজিক বিবর্তনের ধারণাটির আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা বিশেষত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থাসমূহ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সামাজিক বিবর্তনের উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদ্বয় অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ (R. M. MacIver and C. H. Page) তাঁদের ''Society : An Introductory Analysis'' নামক গ্রন্থে সামাজিক বিবর্তন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''ধারাবাহিকতা হচ্ছে পরিবর্তন ও স্থায়িত্বের মধ্যে একটা সংযুক্তি। যখন এই সংযুক্তিমূলক অবস্থার মধ্যে অবস্থিত থেকে আমরা সামাজিক পৃথকীকরণের কাজে ব্রতী হই তখন বুঝতে হবে আমরা বিবর্তনের পথ অনুসরণ করে চলেছি।'' (''Continuity is the union of change and permanence, and when in this union we move in the direction of social differentiation, we are following the road of evolution.'') পৃথকীকরণের কাজে ব্রতী হওয়ার অর্থ হ'ল কোনো বস্তু অথবা বিষয়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় যে ধরনের স্বতন্ত্র, নতুন অথবা জটিল রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেগুলির এবং সেই উন্মোচন প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করা। অর্থাৎ, বিবর্তন হ'ল এমন ধরনের একটি উন্মোচন প্রক্রিয়া যার মধ্যে বস্তু বিষয়ের সহজাত অথবা অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

'বিবর্তন' শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হ'ল 'evolution'। এই ইংরাজী শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'evoluere' থেকে যার অর্থ হ'ল 'উন্নতি' বা 'উন্মোচন' ('to develop' or 'to unfold')। এটি সংস্কৃত শব্দ 'বিকাশ' (Vikas)-এর সাথে সংযুক্ত। আক্ষরিক অর্থে বিবর্তনের অর্থ হ'ল ধীরে ধীরে উন্মোচন। বিবর্তন মূলত অন্তর্নিহিত পরিবর্তনকে নির্দেশ করে, বাহ্যিক নয়। এই পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্ত। এই পরিবর্তন স্বেচ্ছামূলক। বিশেষত, কোনো একটি কাঠামোর মধ্যে অবিরাম পরিবর্তনকেই বিবর্তন বলা হয়। বিবর্তন শব্দটি প্রাণীদেহের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

জীববিদ্যায় একটি জীবের ক্রমবিকাশের ধারা বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে 'বিবর্তন' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সামাজিক বিবর্তনের ধারণাটি এসেছে চার্লস ডারউইন (Charles Darwin)-এর বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ থেকে। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Origin of Species'-এ কীভাবে প্রথমে ধীরে ধীরে জড় জগতে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে,

কীভাবেই বা বিরতিহীন বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জীবদেহের মধ্যে জীবনের প্রকাশ ঘটেছে, আবার কীভাবে মানুষের উৎপত্তি ঘটল — এই সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। অনেক সমাজবিজ্ঞানীই ডারউইনের বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদকে সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

বিবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধারণত সমাজকে এমনভাবে দেখা হয় যেন মানুষের সামাজিক বিকাশ প্রণালীর মধ্যে আসন্ন এমন একটি কিছু নিহিত রয়েছে যার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতিটি পরিবর্তন স্তর স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে নিজ ভূমিকাটি পালনের জন্য পালাক্রমে এসে আবির্ভূত হয়। সমাজ বিবর্তনের এই ধারাবাহিক স্তর বা পর্যায় বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিকরা বিভিন্ন তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন। অগাস্ত কোঁত (Auguste Comte)-এর মতে, প্রত্যেক সমাজই সমরভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, আইননির্ভর এবং আনুষ্ঠানিক সমাজব্যবস্থা এবং আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজব্যবস্থা — এই তিনটি বৃহৎ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। এই প্রতিটি পর্যায়ে আবার মানুষের চিন্তাধারাও সমান্তরালভাবে বিকশিত হয়।

হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তন ধারণারই সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর 'Principles of Sociology' নামক গ্রন্থে মানবসমাজের ক্রমবিকাশের একটি ধারা আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মতে, জীবজগত এবং মানবসমাজ — প্রত্যেকেরই ধারা হ'ল একই ধরনের। অর্থাৎ, প্রাণীজগতের ক্রমবিবর্তনের নীতিই সমাজজীবনের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে। এই নীতিতে ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, সরল থেকে জটিল অবস্থা, অবিভক্ততা থেকে বিভক্ততায়, অসংলগ্নতা থেকে সংলগ্নতায়, অনির্দিষ্টতা থেকে নির্দিষ্টতায়, সমসত্ততা (homogeneity) থেকে অসমসত্ততায় (heterogeneity) উত্তরণের কথা বলা হয়। স্পেনসার মনে করেন যে, জীবজগতের সঙ্গে মানবসমাজের কাঠামোগত মিল বর্তমান। তাই জীবজগতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তত্ত্বের মানবসমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। বিষয়টির বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্পেনসার মন্তব্য করেছেন যে, এককোষী প্রাণীদের মধ্যেই জীবজগতে সর্বপ্রথম জীবনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। শারীরিক গঠনকাঠামোর দিক থেকে এই প্রাণীরা ছিল সহজ এবং সরল। ঠিক তেমনই ছোটো ছোটো দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে প্রাচীন আদিম সমাজে মানুষ বসবাস করত। সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবজগতে কাঠামো এবং কার্যগত পরিবর্তনের সৃষ্টি যেমন হয়েছে, ঠিক তেমনই দেখা দিয়েছে বৈচিত্র্য এবং জটিলতা। প্রাণীজগতের মতো মানুষের সমাজজীবনও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয় এবং কালক্রমে বৈচিত্র্য এবং জটিলতার সৃষ্টি হয়। স্পেনসার জীবদেহের ক্রমবিকাশের সাথে সমাজের ক্রমবিকাশের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে বিবর্তন প্রক্রিয়া জীবদেহ ও সমাজ — উভয়ের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়। সামাজিক বিবর্তনের সাথে সামাজিক অগ্রগতি বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে তিনি মনে করেন।

স্পেনসারের মতে, বিবর্তন এমনই এক সর্বজাগতিক নিয়ম যা জীব, জড় এবং মানবসমাজ — এই তিনটির ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়ে থাকে। তিনি মূলত তিন ধরনের বিবর্তনের উল্লেখ করেছেন — (১) জৈব বিবর্তন (organic evolution) — এই বিবর্তন হ'ল জীবজগতের বিবর্তন; (২) অজৈব বিবর্তন (inorganic evolution) — জড় জগতে এই ধরনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; এবং (৩) অতিজৈব বিবর্তন (super organic evolution) — সামাজিক বিবর্তন হ'ল এই ধরনের বিবর্তন।

সর্বজাগতিক নিয়ম হিসাবে স্পেনসার বিবর্তন প্রক্রিয়ার উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হ'ল — (১) পৃথকীকরণ (differentiation) — পৃথকীকরণের ফলশ্রুতি হিসাবে জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। আঙ্গিক বিবর্তনে যেমন পৃথকীকরণ লক্ষ্য করা যায়, ঠিক তেমনই সমাজের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। (২) সংহতি সাধন (integration) — পৃথকীকরণের ফলে প্রাণীদেহের নানাধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এবং

তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের ধরন-ধারণের বিশেষীকরণের জন্য প্রাণীদেহের পুষ্টি এবং বিকাশ সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই বিশেষীকৃত কার্যাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেয়। সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও এই সংহতি সাধন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। সমাজের বিশেষীকৃত বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংহতি সাধন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অনুসারে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

অধ্যাপক এডওয়ার্ড টাইলর (Edward Tylor) স্পেনসারের মতো সামাজিক পরিবর্তনকে বিবর্তনমূলক ধরে নিয়ে জীব অভিব্যক্তির সঙ্গে সামাজিক অভিব্যক্তির তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আবার, কার্ল মার্কস (Karl Marx)-এর মতে, প্রত্যেক সমাজই ঘটনা-পরিণতির কোনো বিশেষ অবস্থায় কিছু নির্দিষ্ট এবং সীমিত-সংখ্যক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অবশ্যই অগ্রসর হবে। এই বক্তব্যের মধ্যেই কোঁতের বক্তব্যের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। এমিল ডুর্কহেইম (Emile Durkheim) কোঁতের সাথে একমত না হয়েও সমাজের শ্রেণী বিভক্তিকরণের মাধ্যমেই বিবর্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে উপস্থাপিত করেছেন। ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মানদণ্ডে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের উত্থান এবং বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি মানবজীবনে স্বাধীনতা নামক বস্তুটি কী তাৎপর্য বহন করে এবং সমাজজীবনের বৈজ্ঞানিক গঠনাকৃতিই বা ক্রমশ কীভাবে গড়ে উঠেছে — এইসব বিষয়েও ব্যাখ্যা - বিশ্লেষণ করেছেন।

২.৪. সামাজিক বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণার সমালোচনা

অনেক সমাজবিজ্ঞানী নানা কারণে সামাজিক বিবর্তনের ধারণার সমালোচনা করেছেন। তাঁরা যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিত করেন, সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

প্রথমত, সামগ্রিক অর্থে, সামাজিক বিবর্তনের প্রকৃতি বিবর্তনের সাধারণ রীতি-নীতির অনুসরণে বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভব কি না — সে বিষয়ে সমালোচকরা সন্দেহ পোষণ করেন। অনেকেই মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তন হ'ল ক্রমবিকাশের ধারায় একটি নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে মানবসমাজের উত্তরোত্তর নতুন অবস্থায় উপনীত হওয়া। সমালোচকরাও সমাজের নিরবচ্ছিন্ন এবং ধারাবাহিক পরিবর্তনের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা সামাজিক পরিবর্তনের নির্ধারিত গতিপথ রয়েছে — এই বক্তব্যের সমালোচনা করেন। অধ্যাপক টাইলর মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক পরিবর্তনের গতিপথ পরিবর্তিত হতে পারে ঐতিহাসিক অথবা সমকালীন ঘটনাধারার মাধ্যমে। মূলত, মানবসমাজের গতি নির্ভর করে সমাজ প্রচলিত আদর্শ, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির ওপর। এইগুলির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে সামাজিক পরিবর্তনের গতি নির্ধারিত পথ হারায়।

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন যে, প্রাণীদের ক্ষেত্রে 'বিবর্তন' শব্দটির যে ধরনের কার্যকারিতা বর্তমান, সমাজের মতো অজৈব ক্ষেত্রে ঐ ধরনের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায় না। অর্থাৎ, বিবর্তনের ধারণা প্রাণীজগতের ক্ষেত্রে যেমন অর্থবহ, সমাজের ক্ষেত্রে তেমন নয়। সুতরাং, জৈবিক বিবর্তন এবং সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা অনেক সময়ই বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।

তৃতীয়ত, চার্লস ডারউইন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাণীদেহের গঠন এবং শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। প্রাণীদেহের উদ্‌বর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে জন্ম, বৃদ্ধি এবং মৃত্যু — এই অনিবার্য ধারাটি পরিলক্ষিত হয়। প্রাণীদেহের মতো সমাজেরও বিকাশের একটি ধারাবাহিকতা বর্তমান। কিন্তু প্রাণীদেহের ক্ষেত্রে বিনাশ বা মৃত্যু যেমন অপরিহার্য, সমাজের ক্ষেত্রে তা অবধারিত নয়। তাছাড়াও, মানবসমাজের গঠন এবং শ্রেণীবিন্যাসের সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞানসম্মত সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, জৈব বিবর্তন বংশানুক্রমিক নিয়মের অধীন। মানুষ এই বিষয়ে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। জৈবিক নিয়মেই জীবদেহের বিকাশ ঘটে। ফলস্বরূপ, জীবদেহে বিবর্তন অপরিবর্তনীয় কোনো অমোঘ নিয়ন্ত্রণের অধীন। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। সামাজিক উত্তরাধিকার হ'ল বাহ্যিক বিষয় যার ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান থাকে। সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আচার-বিচার প্রভৃতি মানুষকে যেমন অভিপ্রেত পথে পরিবর্তিত করতে পারে, আবার তেমনই সামাজিক উত্তরাধিকারকে পরিশোধিত করতে পারে। মানুষের সামাজিক উত্তরাধিকার ঐতিহ্যবাহী হলেও তা মনুষ্যসৃষ্ট এবং প্রয়োজন বা ইচ্ছা অনুযায়ী মানুষ এর পরিবর্তন বা পরিমার্জনে সক্ষম।

পঞ্চমত, বিবর্তনবাদের সমর্থক হার্বার্ট স্পেনসার মানবসমাজের ক্রমবিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন যে, সমাজ ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরল থেকে জটিল, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ, অবিভক্ততা থেকে বিভক্ততা, সমসত্ততা থেকে অসমসত্ততায় উপনীত হয়। কিন্তু মরিস জিন্সবার্গ (Morris Ginsberg) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী স্পেনসারের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন না। জিন্সবার্গের অভিমত হ'ল সমস্ত বিবর্তন সরল থেকে জটিল অথবা সমসত্ততা থেকে অসমসত্ততায় উপনীত হওয়াকে বোঝায় না। অতীতের কোনো সরল অবস্থা থেকে বর্তমান আধুনিক মানবসমাজের উৎপত্তি হয়েছে — এই ধারণা সর্বক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ হয় না।

ষষ্ঠত, হার্বার্ট স্পেনসার এবং অন্যান্য বিবর্তনবাদী চিন্তাবিদ্দের মত হ'ল যে, সামাজিক বিবর্তনের গতি সর্বদা উন্নয়নমুখী। সুতরাং, সামাজিক পরিবর্তন এক অর্থে সামাজিক অগ্রগতি। কাজেই, তাঁদের অভিমত হ'ল, সামাজিক বিবর্তন এবং অগ্রগতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু, সমাজবিজ্ঞানী হবহাউস (L. T. Hobhouse) এই অভিমতের সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক বিবর্তন সর্বদা সামাজিক উন্নয়ন বা অগ্রগতির নামান্তর নয়। অধ্যাপক বটোমোর (T. B. Bottomore) 'ক্রমবিকাশ' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, সমাজের বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দুটি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 'ক্রমবিকাশ' শব্দটির প্রয়োগ হয়। এই দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত প্রক্রিয়া হ'ল জ্ঞানের বিকাশ সম্পর্কিত প্রক্রিয়া এবং মানব প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণমূলক প্রক্রিয়া।

সর্বোপরি, অধ্যাপক ম্যাকাইভার এবং পেজ প্রমুখরা সামাজিক বিবর্তনকে নৈতিকতার সাথে সংযুক্ত করে আলোচনার বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তনের সাথে নৈতিক অগ্রগতির কোনো সম্পর্ক নেই। এঁরা সামাজিক বিবর্তনকে গ্রহণ করলেও বিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেন। সামাজিক বিবর্তন হল একটি আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যার ফলে সংহতির মধ্যে কাঠামোগত এবং কার্যগত বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। মূলত, বিবর্তনের প্রধান প্রক্রিয়া হ'ল পৃথকীকরণ। কিন্তু সমালোচকরা মন্তব্য করেন যে, পৃথকীকরণ সামাজিক বিবর্তনের অন্যতম প্রক্রিয়া হলেও সমগ্র সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা কেবলমাত্র সংহতিসাধন এবং পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের উপাদানও সামাজিক বিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে উপরিল্লিখিত বিভিন্ন সমালোচনা সত্ত্বেও এই কথা অনস্বীকার্য যে বিশেষত, আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের প্রভাবেই সামাজিক বিবর্তন সংঘটিত হয়। সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরেই সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান বর্তমান থাকে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি সামাজিক বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করে। তাই অনেকেই মনে করেন যে, সমাজে বসবাসকারী মানুষের বিবর্তনই হ'ল সামাজিক বিবর্তন। তবে সামাজিক বিবর্তনে বাহ্যিক পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

২.৫. সামাজিক প্রগতির অর্থ

'সামাজিক প্রগতির' ধারণাকে কেন্দ্র করে সমাজতাত্ত্বিক মহলে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সঠিক অর্থে 'সামাজিক প্রগতি' বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কোনো সংজ্ঞা প্রদান অসুবিধাজনক। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদ্বয় অধ্যাপক ম্যাকইভার এবং পেজ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, কোনো ধরনের সংশয় ব্যতীত বিবর্তনের সংজ্ঞা প্রদানে প্রগতির ধারণাকে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। (''We cannot without confusion introduce the idea of progress into our definition of evolution.'')

সামাজিক পরিবর্তনকেন্দ্রিক আলোচনায় সামাজিক প্রগতির ধারণাটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। মূলত, সামাজিক পরিবর্তনের অভিমুখ সম্পর্কে আলোচনার সময় সামাজিক প্রগতির ধারণা অনিবার্য হয়ে পড়ে। তবে সামাজিক পরিবর্তনের অভিমুখ কোন্ দিকে হলে তা সামাজিক প্রগতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে সে সম্পর্কে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না পাওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়।

এক সময় সামাজিক পরিবর্তনের গতি নির্দেশ করতে গিয়ে অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ সমস্ত ধরনের পরিবর্তনকেই প্রগতিসূচক বলে মনে করতেন। সামাজিক পরিবর্তন হলেই সামাজিক অগ্রগতি হবে — এই ধরনের ধারণা ঊনবিংশ শতকে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। জিন্স্বার্গের (Ginsberg) অভিমত হ'ল মূলত দু'টি কারণে এই ধরনের ধারণার উদ্ভব হয়। প্রথমত, ফলিত বিজ্ঞানের (applied science) সাফল্যের ফলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কার মানুষের মনে উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে যার ফলশ্রুতি হিসাবে মানবসভ্যতা উত্তরোত্তর প্রগতির পথে অগ্রসর হবে — এই সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ রইল না। দ্বিতীয়ত, মানুষের আশাকে আরো বলবৎ করল ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্পর্কিত তত্ত্ব। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা মানুষকে নানা ধরনের সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন করতে প্রলুব্ধ করেছে। ফলস্বরূপ, নানা ধরনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক আদর্শবাদের উৎপত্তি ঘটেছে, তবে প্রগতি বলতে কী বোঝায়, প্রগতি সম্পর্কে মান বা নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি সম্পর্কে অস্পষ্টতা বর্তমান ছিল। এই ধরনের অস্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও প্রগতিকেন্দ্রিক ধারণা মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মানব সভ্যতার অগ্রগতি নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। সমাজে যা পরিবর্তন হয়, তা সবই যে ব্যক্তি এবং সমাজের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক — এই ধারণা ক্রমশ পরিত্যক্ত হতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ প্রগতি সম্পর্কে মানুষের ধারণাকে আঘাত করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্য সব সময়ই সামাজিক এবং নৈতিক উন্নয়নে সহায়ক — এই বিশ্বাসে ফাটল ধরতে শুরু করে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষকে আরো আশাবাদী না করে তাকে 'সভ্যতার সঙ্কট' সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতি নানা ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দেয়। ফলস্বরূপ সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা উৎসাহহীন হয়ে পড়েন।

এছাড়াও, আরো নানা কারণে সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীদের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, কোনো বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবর্তন প্রগতি নির্দেশ করে কিন — তা বিচার করার কোনো সর্বসম্মত মানদণ্ড নেই। সুতরাং একজনের কাছে কোনো পরিবর্তন প্রগতির নির্দেশক বলে বিবেচিত হলেও, অন্যজনের কাছে তা নাও হতে পারে। মূলত, যা বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত হয় তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্তনকেই প্রগতিমূলক পরিবর্তন বলে

বিবেচনা করা যায়। কিন্তু কোন ব্যবস্থাকে বাঞ্ছনীয় বলা যাবে, তা নির্ভর করে বিষয়ীগত (subjective) ব্যাপারের ওপর। কারণ, এই ধরনের বিষয় বিচার করার সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বিষয়গত (objective) মাপকাঠি নেই। সুতরাং, একই পরিবর্তনের মূল্যায়ন বিভিন্ন জনে বিভিন্নভাবে করে থাকে। দ্বিতীয়ত, ভালো-মন্দ বিচার করার এমন কোনো মাপকাঠি নেই, যেটিকে সব সময় সমস্ত পরিস্থিতিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায়। প্রাচীনকালে সমাজে যা শুভ বা ভালো বলে স্বীকৃতি লাভ করতো, বর্তমানে তা নাও পেতে পারে। আবার, বর্তমানে যা ভালো বা শুভ বলে বিবেচিত হয়, ভবিষ্যতেও যে তা হবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তৃতীয়ত, সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এক অংশে কোনো পরিবর্তন ঘটলে অন্য অংশে তার প্রভাব পড়ে থাকে। কোনো কোনো প্রভাব যেমন প্রত্যাশিত এবং বাঞ্ছিত, আবার কোনো কোনো প্রভাব অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছিত। সুতরাং, সামাজিক পরিবর্তনের সদর্থক এবং নঞর্থক — উভয় প্রভাবই বর্তমান। যাঁরা সামাজিক পরিবর্তনের সদর্থক প্রভাবের সমর্থক, তাঁরা এই ধরনের পরিবর্তনকে প্রগতি নির্দেশক বলে মনে করেন, আর যাঁরা নঞর্থক প্রভাবের সমর্থক, তাঁরা এই ধরনের পরিবর্তনকে প্রগতিবিমুখ বলে মনে করেন।

প্রগতির সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে উপরিল্লিখিত সমস্যাগুলি থাকায় কোনো কোনো সমাজতত্ত্ববিদ্ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রগতির উল্লেখ করেন। উদাহরণ হিসাবে অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রগতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু, এই ধরনের বিশ্লেষণও সমস্যাপূর্ণ। এর কারণ হ'ল, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রগতি হয়েছে কিনা বা হলেও কী পরিমাণে হয়েছে — এই বিষয়টি পরিমাপযোগ্য। পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি নির্দেশ করা গেলেও, সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের পরিবর্তন অভিমুখ কোন দিকে তা নির্ণয় করা সমস্যাজনক।

প্রগতির সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা প্রদানে অসুবিধা থাকলেও সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রগতির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'progress' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'progredior' থেকে যার অর্থ হ'ল 'অগ্রবর্তী হওয়া'। সংস্কৃত পরিভাষায় একেই প্রগতি বলা হয়ে থাকে।

সাধারণ অর্থে, সামাজিক প্রগতির ধারণার সাথে সামাজিক আদর্শ এবং মূল্যবোধের ধারণা বিশেষভাবে সম্পর্কিত। আদর্শ সমাজজীবন প্রতিষ্ঠাই হ'ল প্রগতির লক্ষ্য। সুতরাং, এই লক্ষ্যের দিকে সমাজের এগিয়ে চলাকেই সামাজিক প্রগতি বলা হয়। সমাজের কোনো পরিবর্তন যখন একটি বাঞ্ছিত লক্ষ্য বা আদর্শের দিকে চালিত হয়, তখন সেই পরিবর্তনই সামাজিক প্রগতির পর্যায়ভুক্ত হয় এবং অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে পরিবর্তনের দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রগতির পরিমাপ করা হয়।

সামাজিক প্রগতি বলতে সেই সমস্ত বিকশিত অথবা প্রকাশিত সামাজিক আদর্শ এবং নৈতিক গুণাবলীকে বোঝায়, যেগুলি সমাজে বসবাসকারী মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে থাকে। অধ্যাপক অগবার্ণ এবং **নিমকফ**-এর অভিমত হ'ল, উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর অভিমুখে পরিবর্তনকে বলা হয় প্রগতি। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মূল্যমান বিচারের প্রশ্ন বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকবে। অধ্যাপক হবহাউস (L. T. Hobhouse)-এর বক্তব্য হ'ল যে, সামাজিক প্রগতি বলতে মানব প্রজাতির সাথে সংযুক্ত এবং যুক্তিসম্মতভাবে মূল্যমান সমন্বিত সামাজিক জীবন ধারার বিকাশ। তাঁর নিজের ভাষায়, ''..... by social progress (I mean) the growth of social life in respect of those qualities to which human beings attach or can rationally attach value.'' সমাজবিজ্ঞানী লুমলে (F. Lumley)-এর অভিমত হ'ল, প্রগতি এক ধরনের পরিবর্তনকে বোঝায়। কিন্তু এই পরিবর্তন কোনো একটি আকাঙ্ক্ষিত অথবা অনুমোদিত অভিমুখ পরিবর্তন, যে কোনো দিকে পরিবর্তন নয় (''Progress is a change, but it is a change in a desired or approved direction, not any direction.'') অধ্যাপক জিনসবার্গের মতে, এক

বিশেষ দিকে অগ্রগতি অথবা বিবর্তনকে বলা হয় প্রগতি যেখানে ঐ অগ্রগতি বা বিবর্তন মূল্যবোধ অথবা আদর্শের যুক্তিসঙ্গত মূল্যমানকে পূরণ করে। অধ্যাপক **হবহাউস, ম্যাকাইভার** প্রমুখরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সামাজিক প্রগতি নির্ধারিত হয় নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে। সামাজিক প্রগতির বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে এই নৈতিক লক্ষ্য অথবা আদর্শের কথাই বিশেষভাবে অনুরণিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক প্রগতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে পড়ে। সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

প্রথমত, সামাজিক প্রগতির ধারণার মধ্যেই পরিবর্তনের ধারণা নিহিত থাকবে। কোনো ধরনের পরিবর্তন না ঘটলে তাকে সামাজিক প্রগতি বলা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত ধরনের পরিবর্তনই আবার সামাজিক প্রগতি নয়। সেই পরিবর্তনকেই সামাজিক প্রগতি বলা হবে যার মাধ্যমে কোনো আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যপূরণ করা যাবে।

তৃতীয়ত, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে প্রগতি সম্প্রদায়ভিত্তিক। প্রগতি বলতে সামগ্রিকভাবে কোনো একটি গোষ্ঠী অথবা সমাজের একটি নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষিত অভিমুখে অগ্রগতিকে বোঝানো হয়, মানুষের ব্যক্তিগত সুখকে বোঝায় না।

চতুর্থত, মূল্যবোধ (values)-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সবসময়ই নির্ধারণ করার চেষ্টা করি যে একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন প্রগতির পথ প্রশস্ত করছে কি না। মূল্যবোধই আমাদের বলে দেয় যে পরিবর্তন পূর্ব নির্ধারিত অথবা আকাঙ্ক্ষিত কোন লক্ষ্য অভিমুখে হচ্ছে কি না।

পঞ্চমত, প্রগতির ধারণা বিষয়গত (objective) অপেক্ষা অনেক বেশি বিষয়ীগত (subjective)। কারণ, প্রগতি পরিমাপের কোনো বিষয়গত উপায় অথবা পদ্ধতি নেই। প্রগতিকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কারো কাছে যা প্রগতি হিসাবে বিবেচিত হয়, অন্য কারো কাছে তা নাও হতে পারে। এমনকি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একজন মানুষেরই প্রগতি সম্পর্কিত ধারণার পার্থক্য ঘটতে পারে।

পরিশেষে, মূল্যবোধ এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে পরিবর্তিত যেমন হতে পারে, আবার তেমনই একটি নির্দিষ্ট সমাজে সময়ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে। ফলশ্রুতি হিসাবে, প্রগতি সম্পর্কিত বিচার-বিশ্লেষণেও মতপার্থক্য ঘটে থাকে। সময়ভেদে এবং স্থানভেদে লক্ষ্য এবং আদর্শের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রগতির ধারণারও পরিবর্তন ঘটে।

২.৬. সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন এবং প্রগতির পারস্পরিক সম্পর্ক

সমাজতত্ত্বের প্রাথমিক লগ্নে সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতি — এই শব্দগুলিকে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হতো। কোনো কোনো সময়ে এই শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্য করা হলেও এদের যুক্তিসম্মত সম্বন্ধযুক্ত শব্দ হিসাবে পরিগণিত করা হতো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই ধরনের শব্দ প্রয়োগের যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। এই শব্দগুলির মধ্যে কতটুকু যুক্তিসম্মত সম্বন্ধ বর্তমান, তা নিয়েও সংশয়ের সূত্রপাত হয়েছে। সুতরাং, এই অংশে সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের কি ধরনের বৈশিষ্ট্যের উন্মোচন ঘটানো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করলে এই শব্দগুলির প্রয়োগের যথার্থতা সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তন অথবা পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতির ধারণা অভিন্ন বা সমার্থক। এ প্রসঙ্গে আমরা কোঁৎ, স্পেনসার প্রমুখদের নাম উল্লেখ করতে পারি। স্পেনসার মনে করেন যে, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতি মূলত এক এবং অভিন্ন। কারণ, সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমেই সামাজিক প্রগতি সম্ভব হয়। তবে এই ধারণাও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সামাজিক পরিবর্তন হলেই সামাজিক প্রগতি হবে — এই ধারণা ভিত্তিহীন। সদা পরিবর্তনশীল মানবসমাজে পরিবর্তনের ফলে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক রূপ বা প্রকৃতিতে পরিবর্তন হলে সব সময় সামাজিক প্রগতি ঘটবে — এই কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। মানব সমাজে পরিবর্তনের গতিপথ কখনও কখনও পশ্চাৎমুখী, আবার কখনও স্থিতিশীল হতে পারে। সুতরাং সমাজের পরিবর্তনের গতিপথ সর্বদা সরল এবং সম্মুখবর্তী না হওয়ার জন্য পরিবর্তন মানেই প্রগতিশীলতা প্রতিপন্ন হয় না।

সমাজবিজ্ঞানী হবহাউস বিবর্তন এবং প্রগতির মধ্যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর 'Social Evolution and Political Theory' — গ্রন্থে বলেছেন, ''বিবর্তন বলতে আমি যে কোনো ধরনের বিবর্ধনকেই বোঝাতে চাই। অন্য পক্ষে, আমার ধারণায় সামাজিক প্রগতি বলতে বুঝতে হবে সমাজজীবনের সেই সকল লক্ষণের ক্ষেত্রে বিবর্ধন যে লক্ষণসমূহের মধ্যে মানুষ যুক্তিসঙ্গত কারণেই একটি মূল্যমান দেখতে পায়। সুতরাং, সামাজিক প্রগতি হচ্ছে সামাজিক বিবর্তনের বহুবিধ সম্ভাব্য পরিণতির মধ্যে স্বতন্ত্র একটি পরিণতি।'' তিনি আরো বলেছেন যে, যে কোনো জিনিস বিবর্তিত হলেই যে সেটি ভালো হবে — এর যেমন কোনো মানে নেই, ঠিক তেমনই যে সমাজ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে, সেটি যে প্রগতিশীল হবে — এরও কোনো মানে নেই। সমাজের প্রগতি তখনই হবে, যখন সমাজবদ্ধ মানুষ মূল্যবোধসম্পন্ন এবং নৈতিক আদর্শযুক্ত জীবনযাপনের ব্যাপারে আগ্রহী এবং উদ্যোগী হয়। কিন্তু নৈতিক লক্ষ্য এবং আদর্শের নিরিখে প্রগতি নির্ধারণের ধারণা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

অধ্যাপক অগবার্ণ এবং নিমকফের (Ogburn and Nimkoff) মতে, বিবর্তন হ'ল এক ধরনের পর্যায়ক্রমিক এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনসমষ্টি এবং এক্ষেত্রে মূল বিষয়গত অবস্থাগুলিই প্রাধান্য পায়, ঐ অবস্থাগুলির উৎকৃষ্টতা, নিকৃষ্টতামূলক প্রশ্নসমূহ নয়। তাঁরা মনে করেন যে, প্রগতি যেহেতু উৎকৃষ্টতর কিছুর দিকে পরিবর্তন, সেইহেতু তাতে মূল্যমান বিচারের প্রশ্ন অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে (''Progress ..... means change for the better, and hence must imply a value judgement.'') অধ্যাপক ম্যাকাইভার (MacIver)-ও প্রগতি এবং বিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষপাতী।

ধারণাগত দিক থেকে সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রগতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। এক বিশেষ ধরনের সামাজিক পরিবর্তনই হ'ল প্রগতি। সমস্ত ধরনের সামাজিক প্রগতির মাধ্যমে কোনো না কোনো ধরনের সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক পরিবর্তনের ইতিবাচক দিকটিই হ'ল সামাজিক প্রগতি। তবে এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সামাজিক পরিবর্তন ঘটলেও সামাজিক প্রগতি নাও ঘটতে পারে। আবার জিনসবার্গের অভিমত হ'ল যে, সামাজিক প্রগতি সামাজিক বিবর্তনেরই একটি উন্নতমানসূচক সামাজিক পর্যায়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বটোমোর যথার্থই মন্তব্য করেছেন, ''ক্রমবিকাশ এবং প্রগতি, এই দু'টি ধারণাকে যখন সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োগ করা হয়, তখন উভয়ের মধ্যে আদৌ কোনো প্রকার পার্থক্য নিরূপণ সম্ভবপর কিনা সেই সম্পর্কে সংশয় জাগে'' (''It is not clear whether a precise distinction can be made between the notions of development and progress in their application to social changes.'')।

২.৭. সারাংশ

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সামাজিক বিবর্তনের ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবর্তন মূলত অন্তর্নিহিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বেচ্ছামূলক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের জনক হলেন চার্লস ডারউইন। এই ধারণাটিকে সমাজের ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন কোঁৎ, স্পেনসার, টাইলর, মার্ক্স, ডুর্কহেইম, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখরা। সামাজিক বিবর্তনের ধারণা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হলেও সমাজ পরিবর্তনে এর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না।

সামাজিক প্রগতির সংজ্ঞা প্রদানে নানা ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। ম্যাকাইভার এবং পেজ, জিনস্‌বার্গ প্রমুখদের বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তা প্রতিফলিত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও হবহাউস, লুমলে প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক প্রগতির সংজ্ঞা নির্ধারণে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের প্রবর্তিত সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রগতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়।

ধারণাগত দিক থেকে সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন এবং প্রগতির মধ্যে আপাত পার্থক্য থাকলেও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবং বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান।

২.৮. অনুশীলনী

১। নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে ((✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

		ঠিক	ভুল
(ক)	বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ম্যাক্স ওয়েবার।	☐	☐
(খ)	জীবদেহের বিবর্তনকে সমাজদেহের সাথে সংযুক্ত করে আলোচনা করেন স্পেনসার।	☐	☐
(গ)	স্পেনসার তিন ধরনের বিবর্তনকে উপস্থাপিত করেছেন।	☐	☐
(ঘ)	হবহাউসের মতে, সামাজিক বিবর্তন ও প্রগতি এক এবং অভিন্ন।	☐	☐
(ঙ)	অধ্যাপক বটোমোর ক্রমবিকাশ শব্দটির ব্যবহার করেছেন।	☐	☐

২। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(ক) সামাজিক বিবর্তন সম্বন্ধে হার্বার্ট স্পেনসারের অভিমত সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(খ) সামাজিক প্রগতি সম্পর্কে আলোচনার সমস্যা সংক্ষেপে লিখুন।

(গ) সামাজিক বিবর্তন এবং প্রগতির সম্পর্ক কি?

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন ঃ

(ক) সামাজিক বিবর্তন বলতে কী বোঝানো হয়? এই বিষয়ে সমালোচকদের অভিমত কী ছিল?

(খ) সামাজিক প্রগতির অর্থ পরিস্ফুট করুন। এর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

(গ) সামাজিক বিবর্তন এবং প্রগতি বলতে কী বোঝেন? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২.৯. উত্তরমালা

১। (ক) ভুল

(খ) ঠিক

(গ) ঠিক

(ঘ) ভুল

(ঙ) ঠিক

২.৮. অনুশীলনী

১। কর পরিমল ভূষণ ঃ সমাজতত্ত্ব ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ; কলকাতা ; ১৯৮২ (তৃতীয় সংস্করণ)

২। বটোমার টম (অনুবাদ হিমাচল চক্রবর্তী) ঃ সমাজবিদ্যা — তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা; ১৯৯৫ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৩। মহাপাত্র অনাদিকুমার ঃ বিষয় সমাজতত্ত্ব; ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন; কলকাতা; ১৯৯৬ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

৪। MacIver, R. M. And Page, Charles H. : Society — An Introductory Analysis ; London; Melbourne ; Toronto ; 1967.

৫। Rao, C. N. Shankar : Sociology — Primary Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought ; S. Chand & Company Ltd. New Delhi ; 2000 (Third Revised and Enlarged Edition).

একক ৩ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহ

গঠন

৩.১. উদ্দেশ্য

৩.২. প্রস্তাবনা

৩.৩. সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ

৩.৩.১. ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

৩.৩.২. জৈব উপাদানসমূহ

৩.৩.৩. প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহ

৩.৩.৪. সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ

৩.৩.৫. মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ

৩.৩.৬. রাজনৈতিক উপাদানসমূহ

৩.৩.৭. অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ

৩.৪. সারাংশ

৩.৫. অনুশীলনী

৩.৬. উত্তরমালা

৩.৭. গ্রন্থপঞ্জী

৩.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সম্যক অনুধাবন এবং সঠিক বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন ঃ—

- সামাজিক পরিবর্তনে ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদানগুলির ভূমিকা,
- জৈব উপাদানগুলির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া,
- প্রযুক্তিগত উপাদানের সঙ্গে সমাজ-পরিবর্তনের সম্পর্ক,

- মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি সামাজিক পরিবর্তনে কী ধরনের প্রভাব ফেলে,
- রাজনৈতিক উপাদানগুলির কার্য-প্রক্রিয়া,
- অর্থনৈতিক উপাদানগুলির ভূমিকা।

৩.২. প্রস্তাবনা

সামাজিক পরিবর্তনের কোনো সাধারণ তত্ত্ব হতে পারে না। এর কারণ হ'ল, সামাজিক পরিবর্তন নানা কারণে এবং নানা রূপে সংঘটিত হতে পারে। স্থান এবং কাল-ভেদে একই কারণে পরিবর্তনের চেহারা যেমন স্বতন্ত্র হতে পারে, আবার তেমনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে পরিবর্তনের চেহারা মোটামুটি একরকম হতে পারে। এইজন্য যেসব কারণে সামাজিক পরিবর্তন সাধারণত সংঘটিত হতে পারে সেগুলির বিস্তারিতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্যকভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী এককে আমরা সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক প্রগতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান এককে প্রয়োজনের তাগিদেই সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন ধরনের উপাদানগুলির সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৩.৩. সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ

সামাজিক পরিবর্তন মূলত একটি জটিল প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন উপাদানের (factors) অস্তিত্ব বর্তমান। সাধারণত, একাধিক কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। কোনো সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাবিধ কারণের ফলশ্রুতি হিসাবে যেমন পরিবর্তন হতে পারে, তেমনই সকল সমাজে এবং প্রতিটি সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে একই রকম উপাদান সক্রিয় নাও থাকতে পারে। আবার, সামাজিক পরিবর্তন দেশ-কাল নির্বিশেষেও ঘটে থাকতে পারে। তবে বিভিন্ন সমাজে সামাজিক পরিবর্তনের গতি এবং মাত্রার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো সমাজে সামাজিক পরিবর্তন যেমন দ্রুত হয়, আবার কোথাও কোথাও এর গতি খুবই মন্থর। সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন উপাদানসমূহ সামাজিক পরিবর্তনের গতি এবং লক্ষ্য নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

মরিস জিনসবার্গ (Morris Ginsberg) এবং অন্যান্য আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানগুলির পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তাঁদের অভিমতকে যুক্তিসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। জিনসবার্গ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান হিসাবে আটটি কারণের উল্লেখ করেছেন এবং তাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বস্তুগত উপাদান (material factors) এবং ভাবগত উপাদান (ideas)-এর প্রভাব এবং ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকার গুরুত্ব প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা এবং বিতর্কের ভিত্তিতে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। সেগুলি হল হ্ল (ক) ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ (Geographic or the physical factors), (খ) জৈব উপাদানসমূহ (Biological factors), (গ) প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহ (Technological factors), (ঘ) মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ (Psychological factors), (ঙ) রাজনৈতিক উপাদানসমূহ (Political factors) এবং (চ) অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ (Economic factors)।

আমরা এখন এই উপাদানগুলির বিস্তারিত আলোচনা করব ঃ

৩.৩.১. ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী এবং পর্বতসমূহ, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগত, বনভূমি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদিকে ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মানবসমাজের ওপর এইসমস্ত উপাদানগুলির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। সামাজিক পরিবর্তন কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং নির্ধারিত হয়ে থাকে। মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে (polar regions) এবং মরুভূমিতে আমরা কোনো শহরের অস্তিত্ব বড় একটা দেখতে পাব না এবং ঐ অঞ্চলগুলিতে সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা প্রায় আক্ষরিক অর্থেই অনুপস্থিত। ভূপৃষ্ঠ কখনই পরিবর্তনহীন নয়। কখনও কখনও ধীর ভৌগোলিক পরিবর্তন আবার কখনও কখনও ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, সাইক্লোন (cyclone) ইত্যাদির ফলে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা যায়। প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধারণত মানবিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। বিশ্বের সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি যেমন — মিশরীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, সিন্ধুসভ্যতা ইত্যাদি জলবায়ুগত কারণেই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আবার, ১৯২৩ সালে জাপানের ইয়োকোহামা (Yokohama)-য় ভয়ঙ্কর অগ্নুৎপাত ঐ দেশে এক নতুন স্থাপত্যশিল্পের জন্ম দিয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবিক ক্রিয়াকলাপ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের পিছনে দায়িত্বশীল। খনিজ সম্পদ নিঃশেষ করে, বনভূমি ধ্বংস করে, ভূমির উর্বরা শক্তি হ্রাস করে এবং বন্য জীবজন্তুর নির্বিচারে হত্যার মাধ্যমে মানুষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করেছে।

কোনো কোনো সামাজিক বাস্তব্যবিদ্‌গণ (social ecologists) সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকেই বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। তাঁদের অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এইসমস্ত উপাদানগুলির প্রভাব অস্বীকার করা না গেলেও, পরিবর্তনের পিছনে এদের চূড়ান্ত ভূমিকাকে মেনে নেওয়া যায় না। সামাজিক পরিবর্তনকে শুধুমাত্র ভৌগোলিক উপাদানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। বিভিন্ন সভ্যতার উত্থান-পতনকে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করা যায় না। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, মানবসভ্যতা যতই জটিল থেকে জটিলতর হবে, সংস্কৃতির যতই পুঞ্জীভবন (accumulation) ঘটবে, ততই প্রাকৃতিক অথবা ভৌগোলিক উপাদানগুলির সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য হ্রাস পাবে।

৩.৩.২. জৈব উপাদানসমূহ

জৈব উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক গতি-প্রকৃতি বিশেষভাবে নির্ধারিত হয় জনসংখ্যার আয়তন, গঠন-বিন্যাস এবং প্রকৃতির ওপর। সমাজবিজ্ঞানীরা জনসংখ্যা-সম্পর্কিত শাস্ত্র (demography)-এর ভিত্তিতে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জৈব উপাদান হিসাবে জন্ম-মৃত্যু হারের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তার সামাজিক ফলাফল, জন্ম-মৃত্যু হারের হ্রাস-বৃদ্ধির সামাজিক এবং জৈব কারণগুলির কার্য-প্রক্রিয়া, যৌন নির্বাচনের রীতি-নীতি প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি মানবসমাজের ওপর এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যার আয়তনগত পরিবর্তন যেমন সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনই সামাজিক পরিবর্তন জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর প্রভাব ফেলে। সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি সংক্রান্ত সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয় জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

জন্মসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যার তারতম্য এবং অভিবাসন (immigration) ও প্রবাসন (emigration)-এর আপেক্ষিকতা ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর জনসংখ্যার আয়তন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এছাড়াও, প্রাকৃতিক সম্পদ, লোকঘনত্ব, জনগণের গড় আয়ু, জন্ম-মৃত্যুর হার, পরিযান (migration), বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদির দ্বারা জনসংখ্যার আয়তন প্রভাবিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রথা, যেমন — বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সন্তান উৎসর্গ ইত্যাদি এবং জরা, ব্যাধি, মহামারী ইত্যাদি নিরাময় সংক্রান্ত সামাজিক কুসংস্কার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

আধুনিক উন্নত সভ্য সমাজের প্রধান লক্ষ্য এবং নীতি হ'ল জন্মহার নিয়ন্ত্রণ এবং মৃত্যুহার হ্রাস। জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিভিন্ন কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। মানুষ স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে নানা ধরনের গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সমস্ত দেশই এই ধরনের ব্যবস্থাকে কম-বেশী অনুমোদন করেছে। কোনো কোনো দেশে গর্ভপাতের ব্যবস্থাও আইনগত এবং সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাছাড়াও আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি, পরিবেশ সংরক্ষণ, স্বাস্থ্যবিধি পালন মৃত্যু হার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার প্রকৃতিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দেশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিকে নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং তরুণ-তরুণীর আনুপাতিক হার বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে জনগণের পেশাভিত্তিক বিভাজনও গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিন্যাসও সামাজিক পরিবর্তনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। জনসংখ্যার গড় বয়স হ্রাস পেলে সমাজে অল্পবয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে থাকে। ফলস্বরূপ, সমাজে আধুনিক আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতির প্রতি এক স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এবং সমাজ সাধারণত প্রগতিবাদী হয়। অন্যদিকে, জনসংখ্যার গড় বয়স বৃদ্ধি পেলে সমাজে বয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে এবং পুরাতন ও চিরায়ত বিধি-ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা দেওয়ার ফলে সামাজিক রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়াও, সমাজে বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যাধিক্য ঘটলে ভরণপোষণের সমস্যা দেখা দেয় এবং আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পুত্র-সন্তানের থেকে কন্যা-সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পারিবারিক সংগঠন, বিবাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের ওপরও জনসংখ্যার আয়তনের সক্রিয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে টমাস রবার্ট ম্যালথাস্ (Thomas Robert Malthus) একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বের উপস্থাপন করেছিলেন। তাঁর মতে, জ্যামিতিক হার (geometrical progression)-এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু আঙ্কিক হার (arithmetical progression)-এ বৃদ্ধি পায় খাদ্য উৎপাদন। এই কারণে ধীরে ধীরে খাদ্যসামগ্রীর থেকে জনসংখ্যা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বাভাবিক ফল হিসাবে দেশে অনাহার, অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। যদিও, ম্যালথাসের এই তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, তবুও তাঁর যুক্তির সারবত্তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণায় নিকট ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে 'জন বিস্ফোরণ' (population explosion)-এর আশঙ্কার কথাই বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছে। এই দেশগুলিতে নিম্ন মৃত্যুহার এবং নিম্ন জন্মহারের মধ্যে একটা সমতা বিধান করা গেছে। কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রাম থেকে শহরে

এবং দেশ থেকে দেশান্তরে পরিযান (migration) সংঘটিত হচ্ছে এবং অত্যধিক নগরায়ণ (over-urbanization) পদ্ধতির সূত্রপাত ঘটেছে।

সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিকতার ওপরও জনসংখ্যার আয়তন প্রভাব ফেলে। কোনো দেশের জনসংখ্যার আয়তন ঐ দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদের অনুপাতে যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তাহলে অবস্থা অনুকূল থাকলে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা এবং সামরিক মানসিকতা সৃষ্টি এবং তা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার, দেশবাসীর এই মনোভাব পুনরায় জনসংখ্যার আয়তন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

অনেক চিন্তাবিদ্ বংশগতিকে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, বংশগতির ক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের আকৃতি-প্রকৃতি এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে 'সৌজাত্য' (Eugenics) নামে একটি নতুন বিদ্যার সৃষ্টি হয়। পূর্বপুরুষের বিশেষ বিশেষ গুণ এবং বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তান-সন্ততিদের ওপর বর্তায় — এটিই সৌজাত্যবিদ্যার মূল কথা। কাজেই সৌজাত্য বিদ্যায় বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বিশেষ বাছ-বিচারের কথা বলা হয়। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান হিসাবে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেওয়া হয় না, আধুনিককালে বিবাহ ব্যবস্থায় ভৌগোলিক তথা সামাজিক তথা সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিবাহের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। পূর্বে পাত্র-পাত্রী নির্বচনে জাতি, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক অবস্থান ইত্যাদির প্রভাব ছিল সিদ্ধান্তকেন্দ্রিক। কিন্তু বর্তমানে এই প্রভাব অনেকটাই ক্ষয়িষ্ণু। এখন এই ধরনের বৈবাহিক সম্পর্ক এবং উত্তরপুরুষের ওপর তার প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

৩.৩.৩. প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহ

প্রযুক্তিগত উপাদানগুলি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বাস্তবক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি শব্দ দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis)-এর মতে, বিজ্ঞান বলতে মানুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের অংশবিশেষকে বোঝায়। বিজ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় এবং প্রযুক্তি বলতে এই জ্ঞানের প্রায়োগিক দিককেই বোঝানো হয়।

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় 'প্রযুক্তিবিদ্যা' শব্দটি বিস্তারিত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রযুক্তিবিদ্যার যথার্থ বিকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক এবং মানসিক কাঠামোর সহযোগিতা অত্যন্ত অপরিহার্য বিবেচিত হয়ে থাকে। শিল্প বিজ্ঞান অথবা যন্ত্রীকরণ (mechanization)-এর সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল সামাজিক এবং মানসিক অনুকূল অবস্থার ওপর। সুতরাং, উপযুক্ত সামাজিক এবং মানসিক প্রস্তুতি প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণে অনুকূল পটভূমির সৃষ্টি করে থাকে। আবার সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রচলন এবং প্রসারের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধগুলিও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। আধুনিক সমাজব্যবস্থা প্রযুক্তিবিদ্যা এবং তার অবদানের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক সভ্য মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদি জীবনধারাগত যাবতীয় বিষয় প্রযুক্তিবিদ্যার এক্তিয়ারভুক্ত হয়ে পড়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে অধ্যাপক অগবার্ণ এবং নিমকফ্ (W. F. Ogburn and M. F. Nimkoff) তিনটি স্বতন্ত্র প্রণালীর উল্লেখ করেছেন — (ক) বিকিরণ (dispersion), (খ) সমকেন্দ্রিকতা (convergence) এবং (গ) সর্পিল বৃত্তাকার (spiral)। এই তিনটি প্রণালী নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব।

(ক) বিকিরণ ধ্ম

সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা প্রসঙ্গে বিকিরণ হ'ল প্রথম প্রণালী। যে কোনো আবিষ্কার অথবা যান্ত্রিক উদ্ভাবনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ এবং মুখ্য উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। সুতরাং, সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি আবিষ্কারের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিক্রিয়া সমাজের সর্বত্র সম্প্রসারিত হয়। বিকিরণ প্রণালী বলতে একেই বোঝানো হয়। এখানে আমরা উদাহরণ হিসাবে বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করতে পারি। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার এক যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। বাস্তবিক অর্থে, বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবেই সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের জীবনধারার মৌলিক এবং সামগ্রিক পরিবর্তন এসেছে।

(খ) সমকেন্দ্রিকতা :

সমকেন্দ্রিকতা হ'ল সামাজিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় প্রণালী। বিভিন্ন যান্ত্রিক আবিষ্কারের সমষ্টিগত ফলাফল হিসাবে উল্লেখযোগ্য সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়। আমরা কখনই কতকগুলি যান্ত্রিক আবিষ্কারের সমষ্টিগত প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারব না। এই সামগ্রিক প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসাবে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। বৃহদায়তন বিশিষ্ট সৌধ নগরীর চারপাশে গড়ে ওঠা মফঃস্বল শহর-শহরতলীর সমাজজীবন অনেকগুলি যান্ত্রিক আবিষ্কারের সমষ্টিগত ফল। এই ধরনের শহরতলীর সমাজজীবনকে এককভাবে কোনো একটি যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফল হিসাবে উল্লেখ করা যাবে না।

(গ) সর্পিল বৃত্তাকার :

সর্পিল বৃত্তাকার হ'ল সামাজিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার তৃতীয় প্রণালী। বিশ্ববিখ্যাত সুইডিশ সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ্ মির্ডাল (Gunnar Myrdal) এই প্রণালীর নাম দিয়েছেন 'বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত দ্রুতগতির প্রবাহ' (Circular Cumulative Accelerating Process)। মির্ডাল মনে করেন যে, বিভিন্ন উন্নত দেশে সর্পিল বৃত্তাকার প্রণালীর প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে, উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের বিনিয়োগ যদি বাড়ানো যায় তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলশ্রুতি হিসাবে এই পরিবর্তন নতুন করে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। মূলধন বিনিয়োগের প্রভাবে যে পরিবর্তন দেখা যায় তা মূলত বৃত্তাকারে ঊর্ধমুখী হয়ে থাকে।

এখন আমরা প্রযুক্তিবিদ্যা কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমি প্রস্তুত করে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রথমত, প্রযুক্তিবিদ্যা উৎপাদন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক এবং সার্বিক প্রয়োগের ফলশ্রুতি হিসাবে আধুনিক যুগের শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বৃহদায়তন বিশিষ্ট শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন এবং গুণগত উৎকর্ষতা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বড় বড় কল-কারখানায় প্রচুর পরিমাণে শিল্পোৎপাদন যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনই উৎপাদন ব্যবস্থাও অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। সুতরাং, প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে উৎপাদন ব্যবস্থায় এবং শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী এবং সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সমগ্র সমাজজীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে।

দ্বিতীয়ত, কৃষিক্ষেত্রেও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদানকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে অধিক ফলনশীল বীজ, প্রয়োজনীয় জলসেচ, উন্নত মানের রাসায়নিক সার, প্রযুক্তিগত কৌশল ইত্যাদির কৃষিভূমিতে ব্যবহার প্রযুক্তিবিদ্যার

কল্যাণেই সম্ভবপর হচ্ছে। ফল হিসাবে কৃষিজাত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় সমাজে 'সবুজ বিপ্লব' (Green Revolution)-এর পটভূমি রচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রযুক্তিবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নানাধরনের পণ্যের উৎপাদন এবং উৎকর্ষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হয়েছে। সাধারণ শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা এবং উপার্জন বৃদ্ধি, শ্রম লাঘব এবং শ্রমের মনোন্নয়নে প্রাযুক্তিক কলাকৌশল এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলশ্রুতি হিসাবে সমাজবদ্ধ মানুষের অবকাশ বৃদ্ধি পাওয়ায় অবসর বিনোদনের বিভিন্ন পদ্ধতির উদ্ভাবনের ফলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রায় মানোন্নয়ন ঘটেছে।

চতুর্থত, পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকার ওপর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে বহুলাংশেই হ্রাস পেয়েছে। প্রাচীনকালে কুটির শিল্প এবং পরিবারকেন্দ্রিক বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগে শিল্প সভ্যতার ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে নতুন নতুন বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহদায়তন কলকারখানার মাধ্যমে শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। পারিবারিক অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব বর্তমানে ব্যাঙ্ক, দোকান-বাজার, কলকারখানা এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থা পালন করছে।

পঞ্চমত, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব পারিবারিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সমাজজীবনে নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর মর্যাদা পূর্বের তুলনায় অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী স্বাধীনতার পটভূমিতে বৈবাহিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটেছে। যৌথ পারিবারিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই সমস্ত কিছুর মিশ্র প্রতিক্রিয়া পারিবারিক জীবনের ওপর পড়ে। আবার, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পারিবারিক শান্তিও ব্যাহত হয়।

ষষ্ঠত, সমাজে বসবাসকারী মানুষের মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তনে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মানুষ এখন বাস্তবতাবোধের ওপর ভিত্তি করে সমস্ত কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা, আচার-বিশ্বাস এবং সর্বোপরি জীবনাদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে।

সপ্তমত, সামাজিক কাঠামো এবং গঠনবিন্যাসও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবমুক্ত নয়। প্রাচীনকালে সমাজে চিরনির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমান সামাজিক কাঠামোতে সচল শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে সামাজিক সচলতার (social mobility) সৃষ্টি হয়েছে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং মতাদর্শের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বর্তমান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা, ব্যবসাকেন্দ্রিক আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার-ই ফলশ্রুতি। আবার, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে আবাসন এবং বস্তি জীবনের সমস্যার যেমন সৃষ্টি হয়েছে, তেমনই মানুষের সাধারণ মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে।

অষ্টমত, আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রেক্ষাপটে সরকারকে নানাধরনের জনকল্যাণমূলক এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজকর্ম সম্পাদন করতে হয়। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্ট আধুনিক বৃহদায়তন-বিশিষ্ট কল-কারখানার কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসাধারণের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ-নির্যাতনের সম্ভাবনা থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনস্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকারকে বিভিন্ন কার্যাবলী গ্রহণ করতে হয়। আবার, চাপসৃষ্টিকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীও নানাভাবে সরকারের ওপর প্রভাব ফেলে।

সর্বোপরি, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের ধর্মীয় জীবনকেও নানাভাবে প্রভাবিত করে। বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা ভাবনা মানুষের মন থেকে একদিকে যেমন বিভিন্ন কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস দূর করে, তেমনই অন্যদিকে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করে।

৩.৩.৪. সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ

সংস্কৃতি মানব সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের আত্মিক বোধ বিকাশে সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বর্তমান। যে কোনো ধরনের সমাজের সাংস্কৃতিক গঠনে বিভিন্ন ধরনের উপাদান বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের সমাজ-চেতনা, ন্যায়-নীতিবোধ, ধর্ম-বিশ্বাস ইত্যাদি সংস্কৃতির অপার্থিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতি অন্তর্নিহিত অথবা পরোক্ষ উপাদান হিসাবে ক্রিয়াশীল। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সমাজ তথা দেশের মূল সামাজিক কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। মানব সভ্যতার ইতিহাস বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের ইতিহাস। এই সমস্ত বিপ্লবের পিছনে সাংস্কৃতিক উপাদান বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন নানাভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, ন্যায়-নীতিবোধের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তনও সাধিত হয়। সংস্কৃতির ধারণা কোন স্থিতিশীল ধারণা নয়। পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় সংস্কৃতি নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করে। ফলস্বরূপ, সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবসমাজের গতিশীলতা বজায় থাকে। সাধারণত, কালের বিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পাদিত হয়ে থকে।

প্রযুক্তিবিদ্যার সাথে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রযুক্তিগত উপাদানের পরিবর্তনের ফলে সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের আদর্শ, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয়। ফলে সমগ্র সংস্কৃতিই বদলে যায়। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আবার, সংস্কৃতি প্রযুক্তিকে প্রভাবিত করে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনও দেখা যায়। কারণ, সমকালীন সভ্যতা- সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে প্রযুক্তিবিদ্যা পরিচালিত হতে পারে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থার আদর্শ এবং মূল্যবোধের দ্বারা প্রযুক্তিবিদ্যা এবং যন্ত্রসভ্যতার উপযোগিতা এবং ব্যবহার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সমকালীন সংস্কৃতি প্রযুক্তির প্রকৃতি এবং গতিপথ নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং, সামাজিক পরিবর্তনে প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতি — উভয়ের সম্মিলিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৩.৩.৫. মনস্তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ

সামাজিক পরিবর্তনে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলির প্রভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যে কোনো সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের উৎসই হ'ল মানুষের মানসিক জগত। বিশেষত, সামাজিক বিভিন্ন ঘটনাবলীর সাথে মানুষের মনোবৃত্তির একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বর্তমান। সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের সাথে বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া এবং সম্পর্কে লিপ্ত থাকে। এই সমস্ত মিথস্ক্রিয়া এবং সম্পর্কগুলি মানুষের চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগুলি পালন করে :—

প্রথমত, সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান থাকে, তেমনই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, সংঘাত, রেষারেষি বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতার মানসিকতাও লক্ষ্য করা যায়। মানুষের এই ধরনের মনোভাব বা মানসিকতা থেকে সমাজজীবনে পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। মূলত, এই ধরনের মানসিকতাগত পরিবর্তনের ফলেই যৌথ পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তে দম্পতিকেন্দ্রিক একক পরিবারের উদ্ভব হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, সমাজে বসবাসকারী মানুষের মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে। এরই সাথে তাল মিলিয়ে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। হিন্দু সমাজ বিবর্তনের কথা এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন সনাতন হিন্দু সমাজে আমরা সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাই। কিন্তু আধুনিক সমাজে এই ধরনের প্রথাগুলি অনৈতিক, অমানবিক এবং পাশবিক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ, মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি এবং ভাবনা-চিন্তার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও, এখনও ভারতবর্ষের বহু জায়গায় সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক প্রথার সংঘটনের সংবাদ পাওয়া যায়, তবুও সার্বিক ভাবে মানুষের মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে এই সমস্ত নিষ্ঠুর, অমানবিক কুপ্রথার হাত থেকে সমাজজীবন অনেকটাই পরিত্রাণ পেয়েছে।

তৃতীয়ত, অনুকরণপ্রিয় মানুষের সমাজে প্রচলিত আনন্দানুষ্ঠানগুলির অনুসরণ করার প্রবণতাও সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। এই প্রবণতার ফলে মানুষ অন্য সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-ব্যবস্থাগুলি অনুকরণে উৎসাহী হয়। ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই সমাজ প্রভাবিত এবং পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

চতুর্থত, সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন। নতুন কিছুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। এই আকর্ষণকে কেন্দ্র করেই সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। মানুষের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা ইত্যাদি জীবনধারার কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনো নতুন ফ্যাশনের (fashion) উদ্ভব হয়, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সমাজে প্রচলিত পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পারিবারিক এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

সর্বোপরি, সামাজিক পরিবর্তনে দেশনেতাদের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যাবে না। দেশ তথা জাতির জীবনে তাঁরা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে থাকেন। তাঁদের আবেদন-নিবেদন, উপদেশ-নির্দেশ সমগ্র দেশবাসীকে নতুন মত এবং পথের সন্ধান দেয় যা সমাজ পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করে। উদাহরণ হিসাবে আমাদের ভারতীয় সমাজে মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যাঁদের সুনির্দিষ্ট চিন্তা-ভাবনা, মতাদর্শ ভারতবর্ষের পরাধীনতা মুক্তির পথকে প্রশস্ত করেছিল।

৩.৩.৬. রাজনৈতিক উপাদানসমূহ

সমাজ পরিবর্তনে রাজনৈতিক উপাদানগুলির গুরুত্বও অপরিসীম। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ Anthony Giddens তাঁর 'Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, রাজনৈতিক সংস্থাসমূহ (political organisations) সামাজিক পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যে সমস্ত সমাজে মানুষের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশু শিকার এবং খাদ্যদ্রব্য নানাভাবে সংগ্রহ করা, সেই সমস্ত সমাজে রাজনৈতিক সংস্থার প্রভাব ছিল যৎসামান্য। মূলত, তখনকার সমাজে একটি সম্প্রদায়কে চালনা করার মতো কোনো স্বতন্ত্র রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের

অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমাজে গোষ্ঠীপ্রধান (chiefs), ভূস্বামী (lords), রাজা, সরকার ইত্যাদি নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক সংস্থার উত্থান সমাজের উন্নয়ন এবং প্রগতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

কার্ল মার্ক্সের মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোনো একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন নয়। বিভিন্ন সমাজে এমন অনেক রাজনৈতিক প্রণালীর (political order) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যেখানে মোটামুটি একই ধাঁচের উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমান। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ক্ষুদ্র, পশুপালনভিত্তিক সমাজজীবনে উৎপাদনের ধরনের সাথে বৃহৎ, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সভ্যতার উৎপাদন ধরনের খুব একটা মূলগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এই দুই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদ বৃদ্ধির স্বার্থে আঞ্চলিক সীমানার বিস্তার সাধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। অন্যদিকে, শাসক যখন আঞ্চলিক সীমানা বৃদ্ধিতে ব্যর্থ হয়, তখন সমাজে দেখা যায় অর্থনৈতিক সংকট যা চূড়ান্ত পর্যায়ে সমাজকে ধ্বংসের অভিমুখে পরিচালিত করতে পারে।

Anthony Giddens-এর অভিমত অনুসারে বলা যায় যে, সামরিক শক্তি (military strength) সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রভাব হিসাবে কাজ করে। সামরিক শক্তির জোরেই বিশ্বের বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। কোনো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এবং বিস্তার নির্ভর করে তার সামরিক ক্ষমতার ওপর। মূলত সামরিক ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে আঞ্চলিক সীমানা সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়েই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে।

৩.৩.৭. অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ

অর্থনৈতিক উপাদানগুলি সামাজিক পরিবর্তন সাধনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সমাজব্যবস্থার একটি অন্যতম সংগঠন হিসাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক উপাদানগুলি সামাজিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করে। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কারমূলক পরিকল্পনা এবং তার সার্থক রূপায়ণ গ্রামবাংলার কৃষকসমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া এবং ব্যবহারিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের অধিক পরিমাণে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, যেগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত সমাজে খুব একটা দেখা যায় না। শিক্ষার সামাজিক গুরুত্বকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষত, শিক্ষার সংস্কার এবং প্রসারের জন্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠন খুবই দরকারি।

অর্থনৈতিক উপাদানগুলি সমাজে বসবাসকারী মানুষের রীতিনীতি এবং কর্মপদ্ধতিকেও প্রভাবিত করে। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনও অর্থনৈতিক উপাদানের অধীন। সমাজ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত মনোভাব অথবা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। মানবসমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করি। মানুষের সার্বিক জীবনদর্শন এগুলির দ্বারাই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। মূলত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। সমাজের অধিবাসীরা প্রগতিশীল হবে না রক্ষণশীল হবে তা নির্ভর করে ঐ নির্দিষ্ট সমাজে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার ওপর। এখানে আমরা উদাহরণ হিসাবে কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনধারার সাথে আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজের অধিবাসীদের জীবনধারার পার্থক্যের কথা উল্লেখ করতে পারি।

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্ ভিলফ্রেডো প্যারেটো (Vilfredo Pareto) মনে করেন যে, সামাজিক পরিবর্তন সাধনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মন্দা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কোনো দেশ যখন অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হয়, তখন ঐ দেশের পরিস্থিতি ফাট্‌কা কারবারীদের (speculators) প্রতিকূল থাকে। আবার, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রারম্ভে পরিস্থিতি

নির্দিষ্ট আয়ের লোকেদের অনুকূলে থাকে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাট্‌কা কারবারীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। ফাট্‌কা কারবারীরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিপুল সম্পদের মালিকানা ভোগ করে থাকে। অপরিমেয় সম্পদের মালিক হয়ে এই শ্রেণী তখন দেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকেও দখল করে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী মিল্‌স্ (C. Wright Mills) মন্তব্য করেছেন যে, অর্থনৈতিক উৎপাদনের উপাদানগুলি সমাজের বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী যাদের 'Power Elite' বলা হয়, তাদের কুক্ষিগত থাকে। এই ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী সমগ্র সমাজজীবনের ওপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এ ধরনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে শ্রমজীবীরা, যারা কায়িক পরিশ্রম করে, তারা দ্রব্য-সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফলশ্রুতি হিসাবে, কায়িক শ্রমিকদের কর্মকুশলতা খোলা বাজারে দ্রব্য-সামগ্রীর সাথে ক্রয়-বিক্রয় হয়। আবার, একইভাবে কায়িক পরিশ্রম করে না এমন শ্রমিকরাও নিজেদের ব্যক্তিত্বসহ কর্মকুশলতাকে খোলা বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকে। মিল্‌স্ মনে করেন যে, এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে 'ব্যক্তিত্ব বিক্রয়ের বাজার' (personality market) বলে উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ ব্যক্তিত্বশূন্য হয়ে পড়ে।

কার্ল মার্ক্স (Karl Marx) এই ধারণা পোষণ করেন যে, যে কোনো উৎপাদনব্যবস্থায় মানুষের ওপর কাজের বোঝা জোর করে চাপিয়ে দিলে মানুষ কাজ করার ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে। সে নিঃসঙ্গতা এবং একাকীত্ববোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মার্ক্স মন্তব্য করেছেন যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ একরকম 'বিচ্ছিন্ন মানুষ' (alienated man)-এ পরিণত হয়।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, একাধিক কারণে এবং বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের সম্মিলিত প্রভাবে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। মূলত, কোনো একটি কারণ সামাজিক পরিবর্তনকে সামগ্রিকভাবে সূচিত করতে পারে না।

৩.৪. সারাংশ

সামাজিক পরিবর্তন একটি অতি জটিল প্রক্রিয়া। বিভিন্ন উপাদানের ওপর সামাজিক পরিবর্তন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সমাজভেদে সামাজিক পরিবর্তনের গতি এবং মাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একই সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানাবিধ কারণে যেমন সামাজিক পরিবর্তন হয়, তেমনই সকল সমাজে এবং প্রতিটি সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে নানা ধরনের উপাদানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আবার দেশকাল নির্বিশেষে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদান, জৈব উপাদান, প্রযুক্তিগত উপাদান, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান, রাজনৈতিক উপাদান এবং অর্থনৈতিক উপাদান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী, পর্বতমালা, উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগত, বনভূমি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি ভৌগোলিক অথবা প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে থাকে। তবে এই সমস্ত উপাদানগুলির চূড়ান্ত প্রভাব সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক মহলে সংশয় বর্তমান।

সামাজিক পরিবর্তনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল জৈব উপাদান। জৈব উপাদান হিসাবে জন্ম-মৃত্যু হারের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তার সামাজিক ফলাফল, জন্ম-মৃত্যু হারের হ্রাসবৃদ্ধির সামাজিক এবং জৈব কারণ সমূহের কার্যপ্রক্রিয়া, যৌন নির্বাচনের রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচিত

হয়ে থাকে। জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি সমাজের বিভিন্ন বিষয় যেমন — অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে। আবার সামাজিক পরিবর্তন জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির বিষয়টিকেও প্রভাবিত করে। এছাড়াও, জন্মসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যার তারতম্য, অভিবাসন ও প্রবাসনের আপেক্ষিকতা, জনগণের গড় আয়ু, লোকঘনত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যার প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেকে আবার বংশগতির প্রভাবের কথা বলেন। বংশগতির ক্ষেত্রে পার্থক্যজনিত কারণে সমাজবদ্ধ মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, যেটি হল সৌজাত্যবিদ্যার মূল কথা।

প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহও সামাজিক পরিবর্তনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রচলন এবং প্রসারের মাধ্যমে সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসমষ্টির মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। অধ্যাপক অগবার্ণ এবং নিমকফ্ সামাজিক পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার কার্যকর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিকিরণ, সমকেন্দ্রিকতা, সর্পিল বৃত্তাকার — এই তিনটি পৃথক প্রণালীর কথা বলেছেন। যে কোন আবিষ্কার বা যান্ত্রিক উদ্ভাবনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ এবং মুখ্য উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়। একে বিকিরণ প্রণালী বলে। বিভিন্ন যান্ত্রিক উদ্ভাবনের সম্মিলিত ফলাফল হিসাবে সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই প্রণালী হল সমকেন্দ্রিকতা। সর্পিল বৃত্তাকার প্রণালী হল তৃতীয় প্রণালী, যেটিকে সুইডিশ সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ্ মির্ডাল 'বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত দ্রুতগতির প্রবাহ' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগের ফলে উৎপাদনব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটেছে, পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে, নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে, সমাজবদ্ধ মানুষের মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সামাজিক কাঠামো এবং গঠনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটেছে। এছাড়াও, ধর্মীয় জীবনের উপর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব অনস্বীকার্য।

সাংস্কৃতিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সামাজিক কাঠামোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। প্রযুক্তিগত উপাদানের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবদ্ধ মানুষের বিশ্বাস, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিবর্তনের মাধ্যমে সমগ্র সংস্কৃতির বদল ঘটে। আবার সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দ্বারা প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তনও প্রভাবিত হয়ে থাকে। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি এবং গতিপথ নির্ধারিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয় সমকালীন সংস্কৃতির দ্বারা।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাব অনস্বীকার্য। মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা অথবা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাজজীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এছাড়াও, মানুষের অনুকরণপ্রিয়তা, রুচিবোধের পরিবর্তন, জননায়কদের উপদেশ বা নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সংস্থা, সামরিক শক্তি এবং আঞ্চলিক সীমানা সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ইত্যাদি রাজনৈতিক উপাদানসমূহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাবকে আমরা কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। সমাজবদ্ধ মানুষের রীতিনীতি এবং কার্যপদ্ধতি, সমাজবদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন প্রভৃতি অর্থনৈতিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী প্যারেটো, মিলস এবং কার্ল মার্ক্স তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

৩.৫. অনুশীলনী

১। নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

		ঠিক	ভুল
(ক)	সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান হিসাবে আটটি কারণের উল্লেখ করেছেন সমাজবিজ্ঞানী মরিস জিনসবার্গ।	☐	☐
(খ)	ম্যালথাসের বক্তব্য অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সমান্তর হারে এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় গুণোত্তর হারে।	☐	☐
(গ)	বংশগতি সম্পর্কিত বিদ্যাকে বলা হয় সৌজাত্যবিদ্যা।	☐	☐
(ঘ)	বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস।	☐	☐
(ঙ)	প্রযুক্তিবিদ্যার ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনটি পৃথক প্রণালীর অবতারণা করেছেন ম্যাকাইভার এবং পেজ।	☐	☐
(চ)	'বৃত্তাকার ক্রমপুঞ্জিত দ্রুতগতির প্রবাহ' — এই নামকরণের প্রবক্তা হলেন মির্ডাল।	☐	☐
(ছ)	সমাজ বিজ্ঞানী প্যারেটো 'ব্যক্তিত্ব বিক্রয়ের বাজার' — এই কথাটি ব্যবহার করেছেন।	☐	☐
(জ)	'বিচ্ছিন্ন মানুষ' ধারণাটি মার্কসের চিন্তাজগতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।	☐	☐

২। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানগুলিকে আমরা মোটামুটি কটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি এবং সেগুলি কি কি?

(খ) জনগণের জীবনযাত্রার মানের ওপর জনসংখ্যার আয়তনের প্রভাব সম্পর্কিত ম্যালথাসের তত্ত্বটি কি ছিল?

(গ) সৌজাত্যবিদ্যা বলতে কি বোঝেন?

(ঘ) সমাজবিজ্ঞানে 'প্রযুক্তিবিদ্যা' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়?

(ঙ) বিকিরণ প্রণালী বলতে কি বোঝেন?

(চ) সর্পিল বৃত্তাকার প্রণালীটি কি?

(ছ) সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকা সম্পর্কে প্যারেটোর বক্তব্য কি ছিল?

(জ) কিভাবে মিলস সামাজিক পরিবর্তনের ওপর অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করেছেন?

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন :

(ক) সামাজিক পরিবর্তনে জৈব উপাদানগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করুন।

(খ) প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে কি বোঝানো হয়? প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহ কিভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে।

(গ) সামাজিক পরিবর্তনে সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব এবং অর্থনীতির অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(ঘ) সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানগুলি কি কি? কিভাবে এই উপাদানগুলি সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

৩.৬. উত্তরমালা

১। (ক) ঠিক

(খ) ভুল

(গ) ঠিক

(ঘ) ঠিক

(ঙ) ভুল

(চ) ঠিক

(ছ) ভুল

(জ) ঠিক

৩.৭. গ্রন্থপঞ্জী

১। কর পরিমল ভূষণ : সমাজতত্ত্ব; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; কলকাতা; ১৯৮২ (তৃতীয় সংস্করণ)

২। বটোমোর টম (অনুবাদ হিমাচল চক্রবর্তী) : সমাজবিদ্যা — তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা; কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি; কলকাতা; ১৯৯৫ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

৩। মহাপাত্র অনাদিকুমার : বিষয় সমাজতত্ত্ব; ইন্ডিয়ান বুক কনসার্ন; কলকাতা; ১৯৯৬ (দ্বিতীয় প্রকাশ)

৪। MacIver, R. M. And Page, Charles H. : Society — An Introductory Analysis; MacMillan; London; Melbourne; Toronto; 1967.

৫। Rao, C. N. Shankar : Sociology — Primary Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought; S. Chand & Company Ltd; New Delhi; 2000 (Third Revised and Enlarged Edition)

একক ৪ ❑ সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক বিপ্লব

গঠন

৪.১. উদ্দেশ্য

৪.২. প্রস্তাবনা

৪.৩. বিপ্লব বলতে কী বোঝায়?

৪.৪. পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তসৃষ্টিকারী কয়েকটি বিপ্লবের উদাহরণ

৪.৫. বিপ্লব সম্পর্কিত মতবাদসমূহ

৪.৫.১. মার্ক্সীয় বিপ্লব তত্ত্ব

৪.৫.২. জেমস ডেভিস-এর বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব

৪.৫.৩. চার্লস টিলির প্রতিবাদ তত্ত্ব

৪.৬. বিপ্লবের ভবিষ্যৎ

৪.৭. সারাংশ

৪.৮. অনুশীলনী

৪.৯. উত্তরমালা

৪.১০. গ্রন্থপঞ্জী

৪.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর একটি সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে পারবেন এবং এইগুলির সঠিক বিচার-বিশ্লেষণে সক্ষম হবেন :—

- বিপ্লবের প্রকৃত অর্থ এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ,
- বিপ্লবের বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ,
- বিপ্লব সম্পর্কিত কার্ল মার্ক্স, জেমস ডেভিস এবং চার্লস টিলির অভিমতসমূহ,
- আধুনিক সমাজে বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা আছে কি না।

৪.২. প্রস্তাবনা

১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতন আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পূর্ব জার্মানী এবং পশ্চিম বার্লিনের মানুষের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে। এই ঘটনার ফলশ্রুতি হিসাবে পূর্ব ইউরোপ থেকে সাম্যবাদের অবসান ঘটে এবং পরবর্তী সময়ে সাম্যবাদী সোভিয়েত ইউনিয়নও ভেঙে যায়। এই পরিবর্তনের পিছনে মূল সামাজিক শক্তি ছিল জন অসন্তোষ। এই অসন্তোষই বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল। ঐ বছরেই বহু মানুষ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেমন — পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে এবং তারা তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি জানাতে থাকে। ফলে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয় এবং ১৯৮৯ সালের বিপ্লব পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটায়। সুতরাং বিপ্লবই সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট রচনা করে।

পূর্ববর্তী এককে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এককে বিপ্লব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

৪.৩. বিপ্লব বলতে কী বোঝায়?

সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক প্রগতির মাধ্যমেই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রগতি সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল হলেও মানুষের প্রয়াস এবং পরিকল্পনার মাধ্যমেই তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। এই অগ্রগামী পরিবর্তন সম্পন্ন হয় কখনো ধীরে ধীরে এবং সংস্কারের মধ্য দিয়ে, আবার কখনোও বা অল্প সময়ে অতি দ্রুত সমাজের আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই শেষোক্ত পরিবর্তনকেই বলা হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন অথবা বিপ্লব (Revolution)। অর্থাৎ, সমাজের হঠাৎ কোনো সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে জীবন প্রণালীতে এবং ভাবধারার অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে ঐ ধরনের পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। আবার, শিল্প বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবর্তনের তাৎপর্য তুলে ধরে 'বিপ্লব' শব্দটিকে নানাভাবে বিশেষিত করা হয়ে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষত রাজনৈতিক বিপ্লবকে নির্দেশ করার জন্য 'বিপ্লব' শব্দের ব্যবহার হতো। তাই তখন 'বিপ্লব' এবং 'হিংসা' পরস্পর পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ বলে মনে করা হতো। কোনো অবাঞ্ছিত শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তনের জন্য আইন-বিরোধী পন্থা অনুসরণের প্রয়োজন অনেক সময় হয়। কারণ, স্বেচ্ছায় কেউ ক্ষমতা ত্যাগ করে না। এই আইন-বিরোধী পন্থা বলতে বিশেষত সহিংস আন্দোলনকে বোঝানো হয়। হিংসার আশ্রয় ব্যতীত বিপ্লব সংঘটন সম্ভব — এই ধারণাই ছিল কাল্পনিক এবং বর্তমানেও অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন।

কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজতত্ত্বে 'বিপ্লব' কথাটি একটু স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনাধর্মী। বিপ্লব এবং রাজনৈতিক অভ্যুত্থান একই বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয় না। ফলস্বরূপ, হিংসাও বিপ্লবের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয় না। সরকারের গঠন এবং কার্যাবলী বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ঘটনাসমূহ এবং পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই সরকারের গঠন এবং কার্যাবলী সমাজ বহির্ভূত নয়। সরকার সামাজিক ব্যবস্থার (social system)-ই একটি অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং, সরকারের ওপর সমাজের প্রভাব বিশেষভাবে বর্তমান। কিন্তু সরকার তথা রাষ্ট্রসম্পর্কিত বিষয়ে কোনো পরিবর্তন সবসময়ই সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলবে — তা বলা যায় না। তাই, বিপ্লব এখন কেবলমাত্র রাজনৈতিক কাঠামোয়

পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য সহিংস আন্দোলনকে নির্দেশ করে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সঙ্গে বিপ্লবের পার্থক্য করা হয়ে থাকে।

যখন সমাজের ক্ষমতাশীল গোষ্ঠীর ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে সাধারণ জনগণের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়, তখন বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সাম্প্রতিক ধ্যান-ধারণা এবং মূল্যবোধের অসঙ্গতি কেবলমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দূরীভূত করা সম্ভব। লেনিনের অভিমত হ'ল, সমাজের ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে এবং অপেক্ষাকৃত নীচু শ্রেণীর মানুষ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নিতে অনাগ্রহী হলে বিপ্লব ঘটার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবের পূর্ববর্তী সময় এই দুই শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে

বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত একটি দীর্ঘকালীন বিষয়। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন কারণে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। মাঝে মধ্যে নানা সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই-একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে এই ধরনের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রাথমিক পর্বে এই ধরনের আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনাসমূহকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ হঠাৎই কোনো একটি তুচ্ছ কারণে পুঞ্জীভূত হয়ে বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে যাকে বিপ্লব বলে অভিহিত করা যায়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) বিপ্লব বলতে একেই বুঝিয়েছেন। তাঁর অভিমত হ'ল যে, সম্পদ বন্টনে অসাম্যই বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ এবং বুদ্ধিজীবী বিপ্লবের সংগ্রামী ভাবমূর্তি নিয়ে সহমত পোষণ করেছিলেন। তবে এই ভাবমূর্তি সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে টক্‌ভিল্ (Tocqueville), লরেঞ্জ ভন্ স্টেনিন্ (Lorenz Von Stenin এবং কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)-এর চিন্তা এবং চেতনায়। এছাড়াও, বিখ্যাত বিপ্লব ভাষ্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন এমিল লেডারার (Emil Lederer), গুস্টফ লডুয়ার (Gustav Lauduer), থিওডোর গাইগার (Theodor Geiger), ইউজেন রোজেনস্টক্ হিউসী (Eugen Rosenstock Huessy) প্রমুখরা। এঁরা সকলেই বিভিন্ন সময় সংঘটিত বিপ্লবের উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ইউরোপের বৈপ্লবিক ঘটনাপ্রবাহের প্রকৃতি বর্ণনার মধ্য দিয়ে এঁরা সকলেই একমত যে, বিপ্লবের ভবিষ্যৎ গতিপথ একটি বিশ্বজনীন রূপ নেওয়ার লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, মার্ক্সবাদের মাধ্যমে বিপ্লবের বিশ্বজনীন রূপটি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মার্ক্সবাদের সমর্থকগণ বুর্জোয়া বিপ্লবের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ রক্ষাকে সমালোচনা করেছেন। তবে তাঁরা মেনে নিয়েছেন যে, এই ধরনের বিপ্লবের মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শক্তির ব্যাপক সমন্বয়ের ফলে সামাজিক পরিবর্তনের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ পরিবর্তনের প্রাক-শর্ত হিসাবে কিছু সুনির্দিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তির সমন্বয় সাধন প্রয়োজন, যে বিষয় সম্পর্কে সমস্ত চিন্তাবিদ্ এবং বুদ্ধিজীবী একমত।

জনসাধারণ যখন কোনো বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে তখন তার পিছনে এক বা একাধিক আদর্শ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ঐ সমস্ত আদর্শসমূহের মধ্য দিয়েই বিপ্লবের লক্ষ্য এবং যৌক্তিকতা প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ হিসাবে ফরাসী বিপ্লব এবং রুশ বিপ্লবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐসমস্ত বিপ্লবের আদর্শ সামনে রেখে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিপ্লবীরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। বিপ্লব সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে আদর্শগুলিকে কেন্দ্র করেই। বিপ্লব সংঘটনে আদর্শ ব্যতীত সংগঠনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান। কারণ, সংগঠনের অভাবে বিপ্লব কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ করতে পারে না। সুতরাং আদর্শ এবং সংগঠন — উভয়ই বিপ্লব সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। বৈপ্লবিক আদর্শের উদ্ভব হয় সামাজিক প্রয়োজন থেকেই। বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে যে আদর্শ সম্পর্কযুক্ত নয়, সেই আদর্শ বিপ্লবের ভিত্তিভূমি তৈরি করতে পারে না। বাস্তব পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত আদর্শ সংগঠন গঠনের

পথ ত্বরান্বিত করে। কাজেই, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আদর্শ ব্যতীত যেমন কার্যকরী সংগঠন তৈরি হতে পারে না, ঠিক তেমনই সংগঠন ব্যতীত আদর্শের কোনো মানে হয় না।

বিপ্লবী আন্দোলন যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষ তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। পুরনো ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বিপ্লবের প্রাথমিক পর্বে চরমপন্থী (radicals) এবং নরমপন্থী (moderates) — উভয়ই বিপ্লবে যোগদান করেন। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী সময়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে এবং ফলশ্রুতি হিসাবে অপ্রকাশিত দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিরোধিতার সৃষ্টি হতে পারে। বাস্তবধর্মী মানুষের অভাবে বিপ্লব অনেক সময় গোষ্ঠী সংঘর্ষে পরিণত হয় এবং আদর্শচ্যুত হয়। বিপ্লবী আন্দোলনের পরিচালকবর্গের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং, বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে গেলে যে তিনটি শর্ত পূরণ প্রয়োজন, সেগুলি হ'ল — (১) বাস্তব পরিস্থিতির সাথে সমন্বয়সাধনকারী একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ থাকা প্রয়োজন। (২) একটি উপযুক্ত সংগঠন থাকা আবশ্যক যা আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটাবে এবং আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। (৩) বাস্তবধর্মী নেতৃত্ব যা বিপ্লবকে যথার্থ রূপ দেবে।

উপরোক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা এইবার বিপ্লবের সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করব। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেনস্ (Anthony Giddens) বিপ্লবের সংজ্ঞা দেওয়ার পূর্বে বিপ্লবের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর অভিমত হল — (১) সামাজিক গণ-আন্দোলনকেই বিপ্লব বলা যায়। তাই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো গোষ্ঠীর ক্ষমতা লাভ বা কোনো ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর যথা সামরিক নেতার ক্ষমতা লাভ বিপ্লব বলে বিবেচিত হয় না। (২) বিপ্লব হ'ল ব্যাপক সংস্কার প্রক্রিয়া যা পরিবর্তনকে সম্প্রসারিত করে। জন ডান (John Dunn) -এর অভিমত হ'ল, বিপ্লবের ফলে যারা ক্ষমতায় আসে, তারা অবশ্যই আগে যারা সমাজ নিয়ন্ত্রণ করতো তাদের থেকে দক্ষ হবে এবং নেতৃবর্গ অবশ্যই কতকগুলি উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। কোনো সমাজে আন্দোলন এবং ক্ষমতা দখল আনুষ্ঠানিকভাবে সফল হলেও শাসনব্যবস্থা যদি কার্যকরভাবে বলবৎ না করা যায়, তাহলে তা প্রকৃত বিপ্লব পদবাচ্য নয়। কারণ, এর ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা অথবা সমাজ ভেঙে যাওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে। (৩) বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ হিংসা অথবা ভীতি প্রদর্শনের আশ্রয় নেয়। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটনের নামই বিপ্লব। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষকে ভয় না দেখালে অথবা হিংসার দ্বারা উৎখাত না করা পর্যন্ত তারা ক্ষমতা ত্যাগ করে না।

উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে গিডেনস্ বিপ্লবকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বিপ্লব বলতে বোঝায় যে প্রায়ই হিংসাকে যুক্ত করে গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকার এবং সেই অধিকৃত ক্ষমতাকে পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবহার করে সামাজিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করা। আবার, আইজেনস্ট্যাড্ (S. N. Eisenstadt) এর 'Revolution and the Transformation of Societies' শীর্ষক গ্রন্থে আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ইউজিন কামেন্কা (Eugene Kamenka) বিপ্লবকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে — ''বিপ্লব হচ্ছে সামাজিক অবস্থানগত ক্ষেত্রে এমন একটা দ্রুত, আকস্মিক পরিবর্তন যার দরুন সরকারি কার্য-প্রক্রিয়ায়, সার্বভৌমিকতার স্বীকৃত ভিত্তিমূলে এবং সামাজিক শৃঙ্খলার ধারণায় একটা আমূল রূপান্তর দেখা দেয়। সাধারণত, এই রূপান্তর হিংসাত্মক পন্থা ছাড়া সম্ভবপর নয়। যদি এমন হয় যে রক্তপাতহীন উপায়েই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে, তবু তা বিপ্লবই বটে।''

আলোচিত সংজ্ঞাগুলির নিরিখে বিপ্লবের উদ্দেশ্যগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করলে যেগুলি আমাদের সামনে ফুটে ওঠে, সেগুলি হল — (১) প্রচলিত শাসনব্যবস্থা এবং তার বৈধতামূলক প্রতীকগুলির সার্বিক পরিবর্তন। (২) ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণীকে অন্য কোনো শ্রেণী দ্বারা অপসারণ। (৩) প্রধান সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষত, অর্থনৈতিক এবং শ্রেণী সম্পর্কে আবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন। ফলশ্রুতি হিসাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, সমাজের আধুনিকীকরণ ইত্যাদি সংঘটনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি। (৪) প্রচলিত সামাজিক ধারাবাহিকতার অবসান ঘটানো অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুতির ফলশ্রুতি হিসাবে। (৫) কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ অথবা কোনো নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি।

৪.৪. পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্ত সৃষ্টিকারী কয়েকটি বিপ্লবের উদাহরণ

ঐতিহাসিক পটভূমিতে বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আধুনিক যুগের সৃষ্টিতে কয়েকটি বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বর্তমান। ইংল্যান্ডের 'মহান বিপ্লব' (১৬৪০-৬০), 'গৌরবময় বিপ্লব' (১৬৮৮), আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৬১-৭৬), ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৭-৯৯) ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তন সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল। এই সমস্ত বিপ্লবের পরিবর্তিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় ইউরোপীয় বিপ্লব (১৮৪৮), প্যারী কমিউন (১৮৭০-৭১), রুশ বিপ্লব (১৯১৭-১৮) এবং সুদীর্ঘ চীন বিপ্লব (১৯১১-৪৯) প্রভৃতির মধ্যে। তাছাড়াও, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন মেক্সিকো, তুরস্ক, মিশর, ভিয়েতনাম, কিউবা, নিকারাগুয়া প্রভৃতিতে বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের 'আগষ্ট বিপ্লব' (১৯৪২)-কে কোনো কোনো লেখক 'স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। এই সমস্ত বিপ্লবগুলি সংশ্লিষ্ট সমাজের যেমন একটি ভাবমূর্তি নির্মাণ, তেমনই কয়েকটি বৈপ্লবিক প্রতীকীবাদ (symbolism) এবং রূপকল্প (imagery) নির্মাণে সহায়তা করেছে যেগুলি আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা এবং আধুনিক সমাজতত্ত্বের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে চিহ্নিত হয়।

৪.৫. বিপ্লব সম্পর্কিত মতবাদসমূহ

বিশ্বের ইতিহাসে বিপ্লবের গুরুত্ব এতই ক্রমবর্ধমান যে বিপ্লবের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন মতবাদসমূহ গড়ে উঠেছে। কয়েকটি মতবাদ অনেক আগেই সমাজবিজ্ঞান ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল এবং তার মধ্যে কার্ল মার্ক্সের মতবাদ খুবই উল্লেখযোগ্য। বিপ্লব সম্পর্কিত মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গি কেবলমাত্র বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শর্তগুলিকেই বিশ্লেষণ করে না, বরং ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিবর্তন কীভাবে সম্প্রসারিত হবে সেই বিষয়েও আলোকপাত করে। মূলত, বিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবর্তনে মার্ক্সীয় তত্ত্বের উল্লেখযোগ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেনস্ বিপ্লবের রূপরেখা বিচার-বিশ্লেষণে কার্ল মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গি, জেমস ডেভিস (James Davies)-এর বিপ্লব এবং বর্ধিত অর্থনৈতিক আকাঙক্ষার তত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক চার্লস টিলি (Charles Tilly)-এর যৌথ প্রতিবাদের তত্ত্ব ইত্যাদিকে তুলে ধরেছেন।

৪.৫.১. মার্ক্সীয় বিপ্লব তত্ত্ব

কার্ল মার্ক্স সামাজিক পরিবর্তন বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism)-এর পটভূমিতে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বিষয়বস্তু হ'ল যে সমসাময়িক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন এবং বিপ্লবের কারণ জড়িয়ে থাকে। কারণ, মানুষের ভাবধারা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ উৎপাদন

পদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদে উৎপাদন পদ্ধতি বলতে বোঝায় উৎপাদন সম্পর্কগুলির সমষ্টিকে (the sum total of the relations of production)। মার্ক্সের অভিমত হ'ল যে, উৎপাদনের জন্য যে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় অথবা কারখানা যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তার গঠন বিন্যাস উৎপাদন সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত হয় না। মার্ক্সের মতে, উৎপাদন সম্পর্ক হ'ল সমাজের বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ। সম্পত্তি এবং স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত আচার-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উৎপাদন সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উত্থানের পিছনে সম্পত্তি এবং স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত আচার-ব্যবস্থা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসাবে আমরা সামন্ত প্রভু এবং ভূমিদাস, মালিক এবং শ্রমিক প্রভৃতির কথা উল্লেখ করতে পারি। উৎপাদনমূলক কার্যকলাপে বিভিন্ন শ্রেণী বিভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলশ্রুতি হিসাবে, স্বার্থকেন্দ্রিক সংঘাতের সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো সময় শ্রেণী-দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, আবার কোনো কোনো সময় বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। তবে যাই হউক না কেন, শ্রেণীদ্বন্দ্বের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভবের ফলশ্রুতি হিসাবে জন্ম হয় বিভিন্ন ভাবাদর্শের। ভাবাদর্শের মধ্য দিয়েই শ্রেণীস্বার্থ প্রতিফলিত হয়। ভাবাদর্শের সাহায্যে প্রতিটি শ্রেণীই নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থ পূরণ করতে সচেষ্ট হয়। ফলে ভাবদ্বন্দ্বের (conflict of ideas) সূত্রপাত হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণী প্রচারমাধ্যম, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মার্ক্সের অভিমত হ'ল, প্রত্যেক যুগে ক্ষমতাশালী শ্রেণী এইভাবে নিজের ভাবাদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা করে এবং সমাজের উপরি-কাঠামো (superstructure) একইভাবে পরিবর্তিত হয়। তাঁর নিজের ভাষায়, ''In every epoch the ruling ideas have been the ideas of the ruling class.''

প্রাচীনকাল থেকেই নানা সময় নানা কারণে উৎপাদন শক্তিসমূহের (material forces of production) বিরামহীন পরিবর্তন ঘটছে। মূলত, উৎপাদন-যন্ত্রের উদ্ভাবনের (development in the instruments of production) ফলেই এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন শক্তিসমূহের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে মার্ক্স দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর সামন্তপ্রভুদের সাথে পুঁজিবাদীদের স্বার্থসংঘাত দেখা দেয়। অর্থাৎ, পূর্বতন বিত্তবানদের সাথে উদীয়মান বিত্তবানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। উৎপাদন শক্তির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পূর্বের সম্পত্তি এবং স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পরিবর্তিত অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত হয় না। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন হলেও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা আশাব্যঞ্জক হয় না। এর কারণ হ'ল পুঁজি কেন্দ্রীভূত থাকে সামন্ত প্রভুদের হাতে। কিন্তু শিল্পে তা বিনিয়োগ করতে তারা ইচ্ছুক নয়। পুঁজির অভাবে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সরকারও সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় শিল্প প্রসারের অনুকূল নীতি গৃহীত হয় না এবং শিল্পের অগ্রগতিও আশাপ্রদ হয় না। এইরূপ পরিস্থিতিতে জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। জনসাধারণের যে অংশ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে এবং শিল্প সম্প্রসারণের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে চায়, তারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে আগ্রহী হয়। কারণ, রাষ্ট্রযন্ত্র বিত্তবান শ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থ চরিতার্থ করার হাতিয়ারস্বরূপ। বিপ্লবের সাফল্য নতুন সমাজব্যবস্থার জন্ম দেয়।

দার্শনিক হেগেলের (Hegel) দ্বন্দ্বমূলক নীতির (dialetic principle) প্রেক্ষাপটে মার্ক্স সমাজ বিবর্তনের বিকাশ ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন যে, প্রবর্তিত নতুন সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে অন্তর্নিহিত গতিশীলতা হারিয়ে

ফেলে এবং আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য (inner contradiction)-এর দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলস্বরূপ, পরবর্তী সময়ের বিপ্লবের অনুকূল পটভূমি তৈরি হতে থাকে। তিনি আরো বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট সমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে শেষ না হয়, ততদিন সেই সমাজ লুপ্ত হয় না। একটি সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষয়প্রাপ্তির মধ্য দিয়েই ভবিষ্যত সমাজ ব্যবস্থার জন্ম হয়।

মার্ক্সীয় বিপ্লবতত্ত্ব অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। উৎপাদন শক্তির পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসাবে উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয় বা সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনে সক্ষম। সুতরাং, এটি বলা যেতে পারে যে, বিপ্লবের বীজ নিহিত থাকে সামাজিক প্রকৃতির মধ্যেই। মার্ক্স মন্তব্য করেন যে, পৃথিবীর সবরকম সমাজব্যবস্থাই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর নিজের ভাষায়, ''The history of all hiterto existing society is the history of class struggle.'' উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, দাস সমাজ ব্যবস্থার অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্রের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার জন্ম হয়।

মার্ক্স মন্তব্য করেছেন যে, পূর্বে উৎপাদন সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সেগুলি আংশিক বিপ্লব। কারণ, এইসব বিপ্লবের ফলে সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশই মুক্তিলাভ করেছে। উদাহরণ হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেছেন যে, এই বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন করে সমাজে রাজনৈতিক সাম্য এবং অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক পটভূমিতে সম্পদের পুনর্বন্টন এবং সামাজিক কুফল দূর করতে ব্যর্থ হয়।

মার্ক্স মনে করেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতি এবং সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম হ'ল সর্বশেষ শ্রেণীসংগ্রাম। কারণ এই সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে সর্বহারাদের অধিনায়কত্বে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন উপায় সমূহের মালিকানা কোনো বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত হবে না। ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবিভাগও লুপ্ত হবে। এই বিপ্লবই, মার্ক্সের মতে, সার্থক এবং পরিপূর্ণ বিপ্লব।

মার্ক্স তাঁর বিপ্লব তত্ত্বে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রেণী-দ্বন্দ্ব অলঙ্ঘ্য এবং অবশ্যম্ভাবী। এই বক্তব্য থেকে একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হতে পারে যে, মার্ক্স ছিলেন সম্পুর্ণ অর্থে নিয়ন্ত্রণবাদী (deterministic)। বরং, তিনি বলেছেন যে পরিস্থিতি শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অনুকূল হলেও যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজবদ্ধ মানুষ শ্রেণী-সচেতন হয়ে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যোগদান করার মানসিকতা না অর্জন করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লব হবে না। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট্ পারসন্স্ (Talcott Parsons)-এর সামাজিক ক্রিয়াকলাপে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা সম্পর্কিত তত্ত্বের (voluntaristic theory of social action) মধ্য দিয়ে মার্ক্সের বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

যদিও মার্ক্স সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে সাম্যবাদ (Communism) প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, তবুও তিনি বলেছেন যে, মানব চরিত্রের ব্যাপক পরিবর্তন ব্যতীত সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। কেবলমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই এই ধরনের পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। কাজেই, শোষক শ্রেণীর অপসারণে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার মতই মানব চরিত্রের পরিবর্তন সাধনে বিপ্লব অপরিহার্য। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী শাসকগোষ্ঠী সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ উপেক্ষা করে সামগ্রিক স্বার্থ বজায় রাখার দিকে মনোনিবেশ করলে বিপ্লব সার্থক রূপ লাভ করবে। মানুষের মধ্যেও পরার্থপরতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। তবেই, মার্ক্সীয় সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে।

মার্ক্সের বিপ্লবতত্ত্ব সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। মার্ক্সের সামাজিক বিপ্লব কোনো রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি রাজনৈতিক বিপ্লব, যেটি কখনো 'সমাজতান্ত্রিক', আবার কখনো 'শ্রমজীবী' — এই দুটি শব্দ দ্বারা চিহ্নিত। এই

বিপ্লবের পন্থা হিংসাত্মক। র‍্যালফ্ মিলিব্যান্ড (Ralph Miliband) তাঁর 'Marxism and Politics' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, শান্তিপূর্ণ পন্থার কথা উল্লেখ করলেও বলপ্রয়োগ অথবা হিংসাত্মক পদ্ধতি ছাড়া সর্বহারা শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, এই ব্যাপারে মার্ক্স নিঃসংশয় ছিলেন। কে. আর. পপার (K. R. Popper) তাঁর 'The Open Society and its Enemies' — শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, সামাজিক বিপ্লব হ'ল একটি ব্যাপক, ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য হিংসাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন অবাঞ্ছিত কিছু নয়। অ্যালেক্স ইংকেলেস্ (Alex Inkeles) এবং এইচ স্মিথ্ (H. Smith) 'Becoming Modern' নামক বই-এ উল্লেখ করেছেন যে, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি থেকে সরে এসে কেবলমাত্র বিপ্লবের পরিকল্পনায় নিয়োজিত থাকার ফলে মার্ক্সের পাণ্ডিত্যের বেশীরভাগই সৃজনশীল গবেষণার ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে কিছু নিষ্ফলা ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিল। অনেকেই এই ধরনের মন্তব্য মেনে না নিলেও এটি অনস্বীকার্য যে, মার্ক্স উৎপাদন শক্তি, উৎপাদন সম্পর্ক, শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণী-সংগ্রাম, দলের নেতৃত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন ধারণার মাধ্যমে মানুষকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যুগান্তকারী বিপ্লবগুলির পিছনে মার্ক্স নির্দেশিত পন্থা বা রীতির নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন কি রুশ বিপ্লবও মার্ক্সীয় নীতি থেকে বহুলাংশেই পরিত্যক্ত। পিটার উরস্লি (Peter Worsely) তাঁর 'Introducing Sociology'-শীর্ষক গ্রন্থে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বিপ্লব সম্পর্কিত মার্ক্সীয় নির্দেশাবলীতেই অসঙ্গতি বর্তমান। মার্ক্সীয় ধারণায়, বিপ্লবের দুটি পূর্বশর্ত বর্তমান — উপযুক্ত বৈপ্লবিক পরিস্থিতি (appropriate revolutionary situation) এবং একটি উপযুক্ত বৈপ্লবিক এজেন্সি অথবা পার্টি। এই দুটি শর্তের যে কোনো একটির ওপর গুরুত্ব প্রদান সবসময়ই সম্ভব। 'নির্ধারণবাদী মার্ক্সবাদীগণ' (Deterministic Maxists) মনে করেন যে, বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সংঘর্ষ, পুঁজিবাদের পতন ইত্যাদি দেখা না দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত। অন্যদিকে, 'উদ্দেশ্যবাদী মার্ক্সবাদীগণ' (Voluntarist Marxists) বিপ্লব সৃষ্টিতে বিশ্বাসী। উরস্লির অভিমত হ'ল যে, মার্ক্সবাদ বিভিন্ন ধরনের কার্য- প্রক্রিয়ার নির্দেশবাহী হলেও তা কার্যপ্রক্রিয়ার কোনো দ্ব্যর্থহীন বৈজ্ঞানিক নির্দেশিকা নয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী বটোমোর (T. B. Bottomore) তাঁর 'Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সামগ্রিক বিচার- বিশ্লেষণে মার্ক্সীয় সামাজিক বিপ্লবের তত্ত্বটি সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে তেমন চিন্তা-উদ্দীপক কিছু নয়।

মার্ক্স-এর বিপ্লবতত্ত্ব সমালোচনার সম্মুখীন হলেও এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে, সমাজ প্রকৃতি বিশ্লেষণের একটি নতুন দিক তিনি উন্মোচিত করেছিলেন। সমাজের ওপর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে অর্থনৈতিক স্বার্থদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন এবং আলোড়ন হয়। কিন্তু তিনি অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণ বিবেচনা করেন নি। অথচ এই কথা অনস্বীকার্য যে, অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়া অন্যান্য নানা কারণে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে।

৪.৫.২. জেমস ডেভিস-এর বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্ব

বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক জেমস ডেভিস (James Davies) বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্সের বিপ্লব তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মানব সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে সাধারণ মানুষ অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করলেও ঐ পরিস্থিতির জন্য তারা প্রতিবাদ জানায় নি। মানুষ যদি ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র্য এবং বঞ্চনার শিকার হয়, তাহলে তা তাদের মধ্যে ত্যাগ এবং হতাশার জন্ম দেয়। তাদের বিপ্লবমুখী করে তোলে না। ডেভিস মনে করেন যে, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটলে জনসাধারণের প্রত্যাশা বাড়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, উন্নতি যদি যথাযথ না হয়, তাহলে ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রত্যাশার পূরণ হয় না এবং এর ফলশ্রুতি হিসাবে বিপ্লব সংঘটনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে ধরনের জীবনযাত্রায় মানুষ বাধ্য হয় এবং যে ধরনের জীবনযাত্রার সে প্রত্যাশী — এই দুইয়ের মধ্যে বৈষম্য তথা আপেক্ষিক বঞ্চনা (relative deprivation) মানুষকে প্রতিবাদ করতে

বাধ্য করে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নমুখী আদর্শ সম্মিলিতভাবে মানুষের প্রত্যাশা বৃদ্ধি করে এবং তার পরিপূরণ না ঘটলে প্রতিবাদের আকার ধারণ করে। সাম্যের ধারণা এবং রাজনৈতিক-গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের প্রবণতা যত বৃদ্ধি পায়, ততই এই ধরনের প্রতিবাদ শক্তিশালী হয়।

কিন্তু ডেভিসের তত্ত্বও সমালোচনামুক্ত নয়। চার্লস টিলি (Charles Tilly) মন্তব্য করেছেন যে, ডেভিস তাঁর তত্ত্বে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিপ্লব সংঘটনের জন্য সমবেত হওয়ার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন নি। প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেলে এর পটভূমিতে প্রতিবাদ ঘটতে পারে, কিন্তু তার বিপ্লবে রূপনান্তরণকে বুঝতে হলে সেই সব গোষ্ঠীর চিহ্নিতকরণ প্রয়োজন যারা যৌথভাবে কার্যকর পদ্ধতিতে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে।

৪.৫.৩. চার্লস টিলির প্রতিবাদ তত্ত্ব

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী অ্যান্থনি গিডেনস্ মন্তব্য করেন যে, চার্লস টিলি (Charles Tilly) তাঁর 'From Mobilization to Revolution' নামক গ্রন্থে ব্যাপক প্রতিবাদ এবং হিংসার পটভূমিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বিচার-বিশ্লেষণ করেছিলেন। টিলি যৌথ কার্যকলাপের (collective action) উল্লেখ করেন যা প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা এবং অবসানের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। তিনি এই ধরনের কার্যকলাপের চারটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, যৌথ কার্যকলাপের সঙ্গে গোষ্ঠী অথবা গোষ্ঠীসমূহের সংগঠন (organization) যুক্ত থাকে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত জনসাধারণ থেকে অতি শৃঙ্খলাপরায়ণ বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী আন্দোলনগুলি সংগঠিত হয়। উদাহরণ হিসাবে লেনিনের কথা বলা যায় যি নি রাশিয়ায় একটি ক্ষুদ্র কর্মী গোষ্ঠী নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। দ্বিতীয়ত, যৌথ কার্যকলাপ সচলতার (mobilization) মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা সম্ভব, কারণ এর মধ্য দিয়ে গোষ্ঠী দ্রব্যসামগ্রী, রাজনৈতিক সমর্থন, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন রসদ সংগ্রহ করে। লেনিনও বহু সহানুভূতিসম্পন্ন কৃষক এবং শহরবাসীর কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন এবং রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। তৃতীয়ত, জনসাধারণের অভিন্ন স্বার্থ (common interest) যৌথ কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত থাকে। লেনিন বৃহত্তর জনসমর্থন সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এই কারণে যে জনগণের অভিন্ন স্বার্থ অস্তিত্বশীল সরকারের অপসারণের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। চতুর্থত, বিপ্লবের মতো বিভিন্ন যৌথ কার্যকলাপে সুযোগ (opportunity) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। যুদ্ধজয়সহ কতকগুলি কারণ সুযোগ হিসাবে লেনিনের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

মূলত, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সংঘবদ্ধ কার্যকলাপকেই যৌথ কার্যকলাপ বলা যায়। বিক্ষোভের জন্য জনসমাবেশে অনেক মানুষ যেমন ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে, আবার অনেকেই অনিয়মিতভাবে সমর্থন জানায়। বিপ্লব সম্পর্কিত যৌথ কার্যকলাপ, টিলির মত অনুযায়ী, সংগঠন, অভিন্ন স্বার্থ এবং সুযোগ — এই চারটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে থাকে।

চার্লস টিলি মনে করেন যে, জনসাধারণ যখন দেখে যে তাদের দাবিগুলি প্রকাশ করার মতো কোনো সাংগঠনিক মাধ্যমে নেই অথবা তাদের দাবি-দাওয়া বা চাহিদাগুলি যখন সরকারি কর্তৃপক্ষ সরাসরি দমন করে, তখন সামাজিক আন্দোলন গোষ্ঠী শক্তিগুলিকে সচল রাখে। যদিও অনেক সময় যৌথ কার্যকলাপ কোনো একটি নির্দিষ্ট সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ তথা রাস্তার লড়াই-এ পর্যবসিত হয়, তবুও এই লড়াই-এ ব্যাপক গোষ্ঠী সমর্থন থাকলে প্রতিষ্ঠিত শক্তি-বিন্যাসের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়ে থাকে।

ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পটভূমিতে যৌথ ক্রিয়াকলাপ এবং প্রতিবাদের বিভিন্ন প্রতিরূপ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসাবে আমরা গণপদযাত্রা, বিশাল জমায়েত, রাস্তায় বিক্ষোভ, দাঙ্গা ইত্যাদির উল্লেখ করতে পারি।

আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামে গ্রামে লড়াই, যন্ত্রপাতি ভেঙে দেওয়া, বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যৌথ প্রতিবাদের ঘটনা কমে গেছে। প্রতিবাদীরা অন্য দেশকে অনুসরণ করেও প্রতিবাদ গড়ে তুলতে পারে। উদাহরণ হিসাবে গেরিলা আন্দোলনের (guerrilla movements) কথা বলা যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে, কারণ এটি উপলব্ধি করা গেছে যে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ অধিক কার্যকরী।

চার্লস টিলি ১৮০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন সংখ্যক ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন যে, বহু যৌথ কার্যকলাপ প্রাথমিক পর্বে হিংসাশ্রয়ী ছিল না। ঐ ঘটনায কর্তৃপক্ষ কীভাবে সাড়া দেয় তার ওপর হিংসাত্মক কার্যকলাপ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। রাস্তায় যে সমস্ত বিক্ষোভ হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাতে জনসাধারণ বা সম্পত্তির ক্ষতি হয় না। কিন্তু কোনো কোনো বিক্ষোভ হিংসাত্মক হয়ে দাঙ্গায় পর্যবসিত হয়। অনেকসময় লক্ষ্য করা যায় যে, হিংসা ঘটে যাওয়ার পর সরকার পক্ষ সেখানে উপস্থিত হয় অথবা ঐতিহাসিক নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, সরকার পক্ষই হিংসার মদতদাতা। টিলি লক্ষ্য করেছেন যে, হিংসাত্মক লড়াই-এর সময় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই বেশি মৃত্যু এবং আঘাত আসে। অন্যদিকে, যে সমস্ত গোষ্ঠীকে তারা নিয়ন্ত্রন করতে সচেষ্ট হয়, তারাই বেশি ক্ষতি বা সম্পত্তির বিনাশ সাধন করে।

টিলির অভিমত হ'ল বিপ্লবী আন্দোলনগুলি এমন একটি সময়ে ঘটে, যখন যে সময়ে সরকারের শাসন পরিচালনা করার কথা, তখন সেখানে সেই সময়ে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই সময়কে টিলি 'বহুধা সার্বভৌমত্ব' (multiple sovereignty) কাল বলে উল্লেখ করেছেন। আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘর্ষ বা বৈদেশিক যুদ্ধ বা উভয় কারণেই বহুধা সার্বভৌমত্ব দেখা যায়। বিপ্লবীরা ক্ষমতা দখল করতে পারবে কি না তা নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর। যেমন শাসকশক্তি সামরিক শক্তিকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কী ধরনের, ক্ষমতা দখলে ইচ্ছুক প্রতিবাদী আন্দোলনকারীদের সংগঠন কতটা মজবুত ইত্যাদি।

যৌথ হিংসা এবং বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্পর্কিত টিলির মতবাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে সামাজিক আন্দোলন কীভাবে সংঘটিত হয়, রসদসমূহের সচলতা কীরকম, কীভাবে ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে গোষ্ঠীগুলির সাধারণ স্বার্থ একত্রিত হয় প্রভৃতি তাঁর ধারণার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। তবে বহুধা সার্বভৌমত্ব কোন্ ধরনের পরিস্থিতিতে সৃষ্টি হয়, সেই বিষয়ে টিলি সামান্যই আলোকপাত করেছেন। বিপ্লবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এটির অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে। তাই, এর বিষয়ে আলোচনা আরো বিশদ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। থেডা শক্‌পোল (Theda Shockpol) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, চার্লস টিলি এটা মেনেই নিয়েছিলেন যে, সচেতন এবং আলোচিত স্বার্থের দ্বারা বৈপ্লবিক আন্দোলন পরিচালিত হয় এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সাফল্যের মুখ দেখে তখনই যখন জনসাধারণ ঐ স্বার্থগুলিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। শক্‌পোল মন্তব্য করেন যে, বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যায় যে বিপ্লবী আন্দোলনগুলি অনেক বেশি জটিল এবং তাদের উদ্দেশ্যগুলি অস্পষ্ট। বিপ্লব সাধারণত বিকশিত হয় তাদের ইচ্ছার আংশিক ফলশ্রুতি হিসাবে।

৪.৬. বিপ্লবের ভবিষ্যৎ

আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা করা সবিশেষ প্রয়োজন, সেটি হ'ল অতীতের মতো বর্তমান যুগেও বিপ্লব ঘটার কোনো সম্ভাবনা আছে কী না অথবা বিপ্লব অনিবার্য কি না। ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনের মতো সামাজিক আন্দোলনও প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। সুতরাং,

অধিকাংশ বিপ্লবের ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত ফলাফলের সঙ্গে অর্জিত ফলাফলের সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। ফরাসী বিপ্লব শেষপর্যন্ত তার উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছিল। ১৮৪৮ সালের অভ্যুত্থান, প্যারী কমিউন এবং তদানীন্তন অন্যান্য ঘটনাবলীর অবসরে পশ্চিমী সমাজ-এর সামাজিক রূপান্তরের এবং রাজনৈতিক প্রগতিবাদের ধাঁচ প্রকৃত বিপ্লবের সীমারেখা অতিক্রম করে গিয়েছিল। স্বাধীনতার বাণী নিয়ে যে বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছিল, তা শেষ পর্যন্ত দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকেই আদর্শ করে নিয়েছে — এমনটিও লক্ষ্য করা যায়। মূলত, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত প্রকৃতই যে বিপ্লবগুলি ঘটেছে, সেগুলির পুনরাবৃত্তি নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। কারণ, সামাজিক উত্তেজনা, অসাম্য, অন্যায়-অবিচার, সংঘর্ষ ইত্যাদি যে সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি আধুনিক যুগে আর পূর্বের গঠন-প্রকৃতি নিয়ে অবস্থিত নয়।

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠানগুলির আমলাতান্ত্রিকীকরণ, বিভিন্ন সামাজিক এবং স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর আবির্ভাব, প্রযুক্তিবিদ্যার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ইত্যাদি বর্তমান সমাজের বৈপরীত্য এবং উত্তেজনাকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐ ধরনের বৈপরীত্য এবং উত্তেজনা কোনো ধরনের বিপ্লবের জন্ম না দিয়ে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে স্থিতিশীল হয়েছে। এর পিছনে কয়েকটি কারণ বর্তমান বলে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন। প্রথমত, যে সমস্ত প্রতীক এবং আদর্শের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বিপ্লব আধুনিকতার আহ্বান জানায়, সেইগুলি বর্তমান সামাজিক কাঠামোয় বিধিবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলস্বরূপ, মানুষের কাছে প্রকৃত বিপ্লবের যথার্থতা অনেকটাই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক ব্যবস্থা যতই গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছে, ততই বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের বহিঃপ্রকাশের সুযোগ বৃদ্ধির ফলশ্রুতি হিসাবে মানুষ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে আর আগ্রহী নয়। তৃতীয়ত, আধুনিক কালে সংঘর্ষের ধরনও পরিবর্তিত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ নানা কারণে বর্তমানে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে গেছে যা 'শ্রেণী সচেতনতা'-কে দুর্বল করে তুলেছে। শ্রমজীবী এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যেও সহযোগিতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উপরোক্ত কারণগুলির ওপর ভিত্তি করে সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, অতীতের মতো আধুনিক যুগে বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনা খুবই কম। বিভিন্ন সমাজে নানা সময় যে সমস্ত ছাত্র-বিক্ষোভ, শিল্প-ধর্মঘট অথবা অন্যান্য সহিংস কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়, তা বিদ্রোহ মাত্র, বিপ্লব নয়। আবার, যে সকল সমাজে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটছে, সংজ্ঞা অনুসারে সেগুলোও বিপ্লব পদবাচ্য নয়। সুতরাং জ্যাকুই এলাল্ (Jacques Ellul), আইসেনস্টেড্ (Eisenstadt) প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে, আধুনিক সমাজের বৈপরীত্য এবং সংঘাত বিদ্রোহের জন্ম দিতে পারে, কিন্তু কখনই বিপ্লব নয়।

৪.৭. সারাংশ

বিপ্লব বলতে বোঝায় সমাজব্যবস্থার কোনো সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন যার ফলে জীবনযাপনের ধারা এবং ভাবাদর্শ অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিপ্লব এবং হিংসা পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত বলে মনে করা হতো। কিন্তু আধুনিক যুগে বিপ্লব মাত্রই সহিংস আন্দোলনকে বোঝানো হয় না। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্, টক্‌ভিল, স্টেনিন্, মার্ক্স, লেডারার, লড়ুয়ার, গাইগার, হিউসী প্রমুখ চিন্তাবিদ্ এবং বুদ্ধিজীবী বিপ্লব সম্পর্কে নিজেদের সুচিন্তিত মতামত উপস্থাপিত করেছিলেন। আদর্শ, সংগঠন এবং বাস্তবধর্মী নেতৃত্ব বিপ্লবের মূল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী আন্থনি গিডেনস্ এবং আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ইউজিন কামেন্‌কা বিপ্লবের সংজ্ঞাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁদের প্রবর্তিত সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

এবং উদ্দেশ্যসমূহ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। ইংল্যান্ডের 'মহান বিপ্লব', 'গৌরবময় বিপ্লব', আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় সংঘটিত বিপ্লব সমাজব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

বিপ্লব সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স নিজের সুচিন্তিত ধারণাকে উপস্থাপিত করেছেন। যদিও তাঁর বক্তব্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে, তদ্‌সত্ত্বেও বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাছাড়াও, জেমস ডেভিসের বিপ্লব এবং বর্ধিত অর্থনৈতিক আখাঙ্খার তত্ত্ব ও চার্লস টিলির যৌথ প্রতিবাদ তত্ত্ব যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে।

আধুনিক সমাজে বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনা বর্তমান কি না — সেই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত হ'ল যে, বিপ্লব সৃষ্টি হওয়ার অনুকূল পরিবেশের অভাব সমগ্র বিশ্বজুড়ে পরিলক্ষিত হয়। ফলে, বিদ্রোহ দেখা দিলেও বিপ্লব সংঘটনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

১.১০. অনুশীলনী

১। নীচের দেওয়া বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

	ঠিক	ভুল
(ক) লেনিনের অভিমত হ'ল, বিপ্লব পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী এবং ক্ষমতাহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে।	☐	☐
(খ) গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, সম্পদ বন্টনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বৈষম্য বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।	☐	☐
(গ) মার্ক্সবাদীরা বুর্জোয়া বিপ্লব এবং বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থকে সমর্থন করেন।	☐	☐
(ঘ) বিপ্লব সংঘটনে আদর্শ নিষ্প্রয়োজন।	☐	☐
(ঙ) বিপ্লবের জন্য সংগঠনের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।	☐	☐
(চ) সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে মার্ক্সের বিপ্লবতত্ত্ব বিশেষভাবে সম্বন্ধযুক্ত।	☐	☐
(ছ) ট্যালকট্ পারসনস্ সামাজিক কার্যকলাপে স্বাধীন ইচ্ছার ভূমিকা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন।	☐	☐
(জ) জেমস ডেভিস যৌথ প্রতিবাদ তত্ত্বের আলোচনা করেছেন।	☐	☐
(ঝ) চার্লস টিলির বিপ্লব এবং বর্ধিত অর্থনৈতিক আকাঙ্খার তত্ত্ব সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে।	☐	☐
(ঞ) আধুনিক যুগে সর্বাত্মক বিপ্লব সংগঠনের সম্ভাবনা খুবই কম।	☐	☐

২। নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

(ক) বিপ্লব বলতে কী বোঝেন?

(খ) বিপ্লব সংঘটনে আবশ্যকীয় শর্তগুলি উল্লেখ করুন।

(গ) বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপিত করুন।

(ঘ) বিপ্লবের উদ্দেশ্যগুলি কি কি?

(ঙ) বিশ্বের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের উল্লেখ করুন।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন :

(ক) বিপ্লবের সংজ্ঞা দিন। কার্ল মার্ক্স-এর বিপ্লব সম্পর্কিত মতবাদ সমালোচনাসহ আলোচনা করুন।

(খ) বিপ্লব সম্পর্কে জেমস ডেভিস এবং চার্লস টিলির মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(গ) বিপ্লব সম্পর্কিত তত্ত্বগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। আধুনিক সমাজে বিপ্লব ঘটা কি সম্ভব?

৪.৯ উত্তরমালা

১। (ক) ঠিক (চ) ঠিক

(খ) ঠিক (ছ) ঠিক

(গ) ভুল (জ) ভুল

(ঘ) ভুল (ঝ) ভুল

(ঙ) ঠিক (ঞ) ঠিক

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। কর পরিমল ভূষণ : সমাজতত্ত্বের রূপরেখা; নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী; কলকাতা; ১৯৮৯ (প্রথম সংস্করণ)

২। গিডেনস এন্থনি : সমাজতত্ত্ব (ভাষান্তর হিমাংশু ঘোষ); ভ্রাতৃ সংঘ, বাঁকুড়া এবং বিশ্বাস বুক স্টল; কলকাতা

৩। মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু : প্রসঙ্গ সমাজতত্ত্ব; সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স; কলকাতা; ১৯৮৭

৪। Rocher Guy : A General Introduction to Sociology — A theoretical perspective; Academy Publishers; Kolkata; 1990.

একক ১ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য
১.২ প্রস্তাবনা
১.৩ সমাজ পরিবর্তন ঃ অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব
১.৩.১ ভিত্তি উপরিকাঠামো সম্পর্ক ঃ সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষিত
১.৪ সমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যা ঃ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি
১.৫ শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ পরিবর্তন
১.৬ ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ঃ সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্ব
১.৬.১ আদিম সাম্যবাদী সমাজ
১.৬.২ দাস সমাজ
১.৬.৩ সমান্ত সমাজ
১.৬.৪ পুঁজিবাদী সমাজ
১.৬.৫ সমাজতান্ত্রিক সমাজ
১.৭ সমাজ পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখযোগ্য বিতর্ক
১.৮ সারাংশ
১.৯ অনুশীলনী
১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :—

- সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে মার্ক্স কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?
- সমাজ পরিবর্তনে অর্থনৈতিক মার্ক্স কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?
- সমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
- ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানবসমাজের বিবর্তণকে কী কী পর্বে বিভক্ত করা হয়?
- শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে মার্ক্স কিভাবে সমাজকে বিশ্লেষণ করেন এবং এর পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করেন?

১.১. উদ্দেশ্য

মানবসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তনশীলতা। সমাজ বলতেই সাধারণভাবে বোঝায় সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক সম্পর্কের প্রবাহকে। এই পরিবর্তনশীলতার প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে সবাই একমত নন। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। এর মধ্যে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাটি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজ পরিবর্তনের পেছনে ঠিক কী কী কারণ কাজ করে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কার্ল মার্ক্সস প্রচলিত ভাববাদী চিন্তাধারাকে বর্জন করেন। তার পরিবর্তে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর কারণ নির্ণয় করতে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে, সামাজিক পরিবর্তন কোনও আকস্মিক ব্যাপার নয়। এই পরিবর্তন কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলে। কেউ কেউ মনে করেন, কার্ল মার্ক্স হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। মার্ক্স হেগেলের দ্বন্দ্ববাদ দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও দুজনের চিন্তাধারার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। হেগেলের ভাববাদী চিন্তার পরিবর্তে মার্ক্স ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস বস্তুজগতের মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের কারণগুলি অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হন।

ধ্রুপদী সমাজতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক হিসাবে। সেই সময়কার সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে মূল প্রশ্ন ছিল — সমাজশৃঙ্খলা কেমনভাবে রক্ষিত হয়? কার্ল মার্ক্সও সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার কারণগুলি অনুধাবনে সচেষ্ট ছিলেন। তবে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল — সমাজ শৃঙ্খলার পরিবর্তন কী করে সম্ভব? — এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। বিদ্যমান সমাজশৃঙ্খলা যে অমানবিক শোষণের পরিচয় বহন করছে — সহযোগিতা ও সহমতের ধারণার ভিত্তিতে তার সুস্থিতি নয়, বরং দ্বন্দ্ব ও শ্রেণী সংগ্রামের ধারণার ভিত্তিতে তার আমূল পরিবর্তনের কথাই ভাবা উচিত বলে মার্ক্স মনে করতেন। সমাজ জীবনকে ব্যাখ্যা করাটাই যথেষ্ট নয় বরং সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুক্তি ও পথ নির্দেশ করাটাই তাঁর কাছে বেশি জরুরী কাজ বলে মনে হতো।

১.৩ সমাজ পরিবর্তন ঃ অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব

মার্ক্স সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, সমাজ পরিবর্তনের পেছনে অন্যান্য উপাদানের ভূমিকা থাকলেও, সব কিছুর মধ্যে অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকাই মুখ্য। সমাজের পরিবর্তন ঘটছে মূলতঃ কতকগুলো পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। তিনি মনে করেন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা উপাদান পদ্ধতিই সমাজ জীবনের প্রধান চালিকাশক্তি। এর মধ্যে পরিবর্তন এলে অন্যান্য সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। মানব সমাজের পরিবর্তন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আগে রাজনৈতিক কারণগুলির ওপরই সাধারণত জোর দেওয়া হতো। মার্ক্সই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভাবে একথা প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন যে উৎপাদন প্রভৃতির পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ। অর্থনৈতিক উপাদানের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করায় তাঁর তত্ত্বকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাদ (Economic determinism) বলা হয়। আসলে এটা সত্য নয়। মার্ক্স অ-অর্থনৈতিক উপাদানের (Non-Economic factors) গুরুত্বও অস্বীকার করেননি। তিনি যান্ত্রিক বস্তুবাদ বর্জন করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে বুঝতে চেয়েছেন সেকথাও এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে।

১.৩.১ ভিত্তি-উপরিকাঠামো সম্পর্ক ঃ সমাজ পরিবর্তনের প্রেক্ষিত

মার্ক্সের মতে, প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি (Mode of production) থাকে। এর আবার দুটি দিক রয়েছে। একটি উৎপাদন শক্তি (Production Forces) এবং অপরটি উৎপাদন সম্পর্ক (Production Relation)। উৎপাদন শক্তিকে সহজ কথায় উৎপাদনের হাতিয়ার (যন্ত্রপাতি) বলা যায়। আর, দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় সেটাই হলো উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্ক ব্যক্তির ইচ্ছা নিরপেক্ষ এবং অপরিহার্য। কার্ল মার্ক্সসের মতে, দুইয়ে মিলে যে অর্থনৈতিক কাঠামো তাই হলো সমাজের ভিত্তি (Base)। একটি সৌধের ভিত্তি অনুসারেই যেমন তার উপরিসৌধ বা উপরিকাঠামোর গঠনাকৃতি নির্ধারিত হয়, তেমনি এই অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন পদ্ধতি সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্ম, সংস্কৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ইত্যাদি উপরিকাঠামোর (Super structure) প্রকৃতি নির্ধারণ করে। সমাজের ভিত্তি বা অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন হলে উপরিকাঠামোকেও তা প্রভাবিত করে। তবে ভিত্তি উপরিকাঠামো সম্পর্ক একতরফা নয়। মার্ক্সের মতে, উপরিকাঠামোও অনেকসময় অপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে। কখনো কখনো ভিত্তিকেও তা প্রভাবিত করতে পারে। এরা এক দ্বান্দ্বিক সূত্রে প্রথিত। সমাজ হলো এসব কিছুরই অন্বয়ে গঠিত এক সামূহিকতা বা অখণ্ডতার (Totality) ধারণা। ভিত্তি-উপরিকাঠামোর সম্পর্ক যান্ত্রিক নয়। মার্ক্স মনে করেন, বস্তুগত উৎপাদন শক্তি উৎপাদন সম্পর্ক সমূহের সঙ্গে সংঘাতশীল থাকে বলেই সামাজিক পরিবর্তন দেখা যায়। তাঁর কথায়, সমাজের বস্তুগত উৎপাদন শক্তিগুলি কোনও একটা নির্দিষ্ট উন্নত স্তরে এসে পৌঁছলে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কসমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদনের শক্তির বিকাশে সহায়ক না হয়ে উৎপাদনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তখনই বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। সমাজের উপরিকাঠামো আকস্মিকভাবে জন্ম লাভ করে না। অর্থনৈতিক কাঠামো বা ভিত্তি যে শ্রেণী সম্পর্কের জন্ম দেয় তার সঙ্গে উপরিকাঠামোর সম্পর্ক এক ধরণের কার্যকারণ সূত্রে বাঁধা।

১.৪ সমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যা ঃ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি

ভাববাদী দৃষ্টিকোণ ও অধিবিদ্যার বিরোধিতা করে কার্ল মার্ক্স দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে ব্যাখ্যা করেছেন। দ্বান্দ্বিকতা (dialectics) বলতে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাত জনিত প্রক্রিয়াকে বোঝায়। তবে মার্ক্সের কাছে দ্বান্দ্বিকতা বা দ্বন্দ্ববাদ শুধুমাত্র বিরোধ বা সংঘাতের প্রক্রিয়া নয়। মার্ক্সীয় দ্বন্দ্ববাদ প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া জনিত (Reciprocal) এক বিরামহীন প্রবাহকেই নির্দেশ করে। দ্বন্দ্ব থেকেই গতির সৃষ্টি হয়, আর এই গতি থেকেই সূচনা হয় পরিবর্তনের। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে এই বস্তুজগত হলো গতিশীল এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল। বস্তুজগতের অভ্যন্তরে যে স্ববিরোধ বর্তমান তারই দ্বান্দ্বিকতায় বস্তুজগতের পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে। এই বিধান বিশ্বজনীন। সমাজ ও প্রকতির ক্ষেত্রে তা সমভাবে প্রযোজ্য। তবে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বিমূর্ত্ত নিয়মগুলির মাধ্যমে সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিকশিত হয় না — মানুষের সক্রিয় প্রায়গিক কর্মের মাধ্যমেই সমাজ পরিবর্তিত হয়।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি হলো ঃ

ক) পরিমানগত পরিবর্তনের ফলে গুনগত পরিবর্তন সাধন ঃ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অনুসারে বস্তুজগতে পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ক্রমবিকাশের ধারায় কোনও বস্তুর পরিমাণগত পরিবর্তন একটি বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছলে তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, জল। জলকে গরম করলে তার তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। জলের তাপমাত্রার এই যে পরিবর্তন তা হচ্ছে পরিমাণগত পরিবর্তন। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জল তরল পদার্থই থাকছে, তার মৌলিক কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। কিন্তু, জলের তাপ আরও বাড়তে থাকলে একসময় একটা সঙ্কট মূহুর্তের সৃষ্টি হয়। তখন উল্লম্ফনের মতো অতি দ্রুত রূপান্তর ঘটে। জল তখন আর জলীয় বা তরল পদার্থ থাকে না। উল্লম্ফনের মাধ্যমে বাস্পে রূপান্তরিত হয়ে যায় — এ সময় জলের স্ফুটনাঙ্ক হয় ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। জলের এই মৌলিক পরিবর্তনই হলো গুণগত পরিবর্তন। তখন তার 'ধর্ম' বা 'গুণ' পরিবর্তিত হয়ে গেছে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যা সত্য, মানবসমাজের পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও তা অনেকখানি সত্য। মানবসমাজ বস্তুজগতেরই অংশ, তাই সমাজেও এ ধরনের পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। তবে, এক্ষেত্রে মানুষের সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা থাকে। উদাহরণ হিসাবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের গর্ভে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের কথা উল্লেখ করা যায়। একটা পর্যায়ে উল্লম্ফনের মধ্য দিয়ে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে এবং সামন্ত্রতন্ত্র পুঁজিবাদে পরিণত হয়।

খ) বৈপরীত্যের মিলন ও সংগ্রাম ঃ প্রত্যেক বস্তু ও ঘটনার মধ্যে মিলন ও অর্ন্তদ্বন্দ্ব একই সাথে বিরাজ করে। যে কোনও বস্তু বা ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বিপরীত শক্তির মিলিত অবস্থা আর এই মিলিত অবস্থা বা ঐক্যই তাকে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব দেয়। কিন্তু বস্তুটির অভ্যন্তরস্থ বৈপরীত্যের দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে একসময় এর আপেক্ষিক স্থায়িত্ব লুপ্ত করে বস্তুটির রূপান্তর ঘটায়। বৈপরীত্যের মিলন বা ঐক্য শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক, আপেক্ষিক - দুই বিপরীতের দ্বন্দ্বই হলো চূড়ান্ত। প্রথমদিকে দ্বন্দ্বগুলি ধীর লয়ে চালিত হয়, যদিও তা বস্তুর পরিবর্তনের পূর্বাভাস দেয়। এই পর্যায়ে বিপরীত শক্তিগুলির মিলন বা ঐক্য অটুট থাকে। ক্রমশ দ্বান্দ্বিক বিরোধীতার গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই স্থিতাবস্থার পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে পুঁজিবাদের প্রথম পর্যায়ে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ঐক্য বহাল ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করায় ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এরই ফলে বস্তুজগতে ও সমাজ জগতে পরিবর্তন ঘটে।

গ) নেতির নেতিকরণ ঃ মার্ক্সের মতে, পুরাতনের অস্বীকৃতি ছাড়া নতুনের আবির্ভাব ঘটতে পারে না। বস্তুর পরিবর্তন হয় মূল অবস্থার নেতিকরণ ঘটিয়ে। বস্তুর স্বাভাবিক গতি হলো তার স্বসত্তার নেতিকরণ ঘটিয়ে বিপরীত এক অবস্থায় উত্তরণ। এই নেতিকৃত অবস্থা আবার নেতিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। একেই নেতির নেতিকরণ প্রক্রিয়া বলা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের এই সূত্রকে ইতি বা বাদ (thesis), নেতি বা প্রতিবাদ (antithesis) এবং নেতির নেতি বা সম্পদ (synthesis) হিসাবেও প্রকাশ করা যায়। বস্তুর প্রথমাবস্থা — ইতি, দ্বিতীয় অবস্থা — নেতি এবং তৃতীয় অবস্থা হলো — নেতির নেতি। এইভাবেই এক রৈখিকভাবে নয়, সর্পিল (spirally) ভাবে বস্তু ও সমাজের পরিবর্তন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বীজ থেকে যখন গাছ জন্মায় তখন বীজ হলো ইতি বা Thesis গাছটি হলো বীজের নেতি বা antithesis। আর এই গাছটি যখন একাধিক বীজ উৎপন্ন করে লয় প্রাপ্ত হয় তখন বীজগুলি গাছের (নেতির) নেতি। অনুরূপভাবে, সমাজ পরিবর্তনের অর্থই হলো তার প্রথমাবস্থার নেতিকরণ এবং নতুন অবস্থার উদ্ভব এবং ক্রমে দ্বিতীয় অবস্থার (নেতি) নেতিকরণ ঘটিয়ে গুণগতভাবে উন্নত অবস্থায় উত্তরণ।

১.৫ শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ পরিবর্তন

মানব ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি হলো শ্রেণী সংগ্রাম। সমাজ পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে মার্ক্স ও তাঁর বন্ধু এঙ্গেলস বলেছেন, এ যাবৎকাল পৃথিবীতে যতরকম সমাজের কথা জানা গেছে তাদের প্রত্যেকেরই ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো'তে (The Communist Manifesto) তাঁরা মন্তব্য করেছেন — আজ অবধি মানব সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে — মুক্তমানুষ ও ক্রীতদাস, অভিজাত ও সাধারণ মানুষ, প্রভু ও ভৃত্য, মালিক ও দিনমজুর, অত্যাচারী ও অত্যাচারিত — এই বিভিন্ন শ্রেণী বরাবরই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে — দণ্ডায়মান হয়েছে। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে গেছে কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা গুপ্তভাবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই সংগ্রাম গিয়ে শেষ হয়েছে হয় সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে না হয় বিবাদমান শ্রেণীগুলির পারস্পরিক ধ্বংসের মধ্যে। এক কথায়, সমাজ নিপীড়িত ও নিপীড়ক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হবার সাথে সাথেই শুরু হয় শ্রেণী সংগ্রাম। আদিম সাম্যবাদী সমাজ বাদ দিয়ে বাকি সব ধরনের সমাজে শ্রেণীভেদ পরিলক্ষিত হয়। একটি শ্রেণী উৎপাদন যন্ত্র তথা উৎপাদন উপায়ের মালিক এবং অন্য শ্রেণী উৎপাদন উপায়ের মালিকানা থেকে বঞ্চিত। মালিক বা শাসকশ্রেণী সক্রিয় থাকে তার আধিপত্য বজায় রাখতে আর নিপীড়িত শ্রেণী শ্রেণী সংগ্রামকে হাতিয়ার করে মুক্তির সন্ধানে। শ্রেণী সংগ্রাম না থাকলে, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না থাকলে সমাজ পরিবর্তনের পটভূমি তৈরি হয় না, সমাজ অগ্রসর হয় না। শ্রেণী সংগ্রাম সমাজকে এগিয়ে দেয় নতুন পর্বে, প্রগতির দোরগোড়ায়।

যতদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা মালিকশ্রেণীর সাথে নিজেদের বিরোধমূলক সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের বিশেষ অবস্থান অনুধাবন করতে না পারছে ততদিন প্রকৃত অর্থে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে উঠতে পারে না। পারস্পরিক একাত্মতা ও শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকরা 'স্বস্বার্থে একটি শ্রেণী' (class for itself) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রেণী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকরা রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তন রোধ করতে চায়। অন্যদিকে, শ্রমিকশ্রেণী প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করে সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করতে প্রয়াসী হয়। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী। ঐতিহাসিক নিয়মে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মাধ্যমে এইভাবে সমাজ পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আর্নস্টফিসার (Ernest Fisher) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শ্রেণী সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়েই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে' (A class of born in class struggles)।

সমালোচকগণ শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বটিকে ইতিহাসের অতিসরলীকরণ বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে, ইতিহাসের সকল পর্যায়ে মানবসমাজ শোষক-শোষিত বা বিত্তশালী-বিত্তহীন — এই দুটি সরলভাবে দ্বিখণ্ডিত থাকে এরূপ ধারণা বাস্তবসম্মত নয়। সমালোচকদের মতে, কোনও কালেই কোন দেশের মানুষকে কার্যত সুস্পষ্ট দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। বিভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত কার্ল মার্কসের বক্তব্য তাঁর সামগ্রিক রচনার প্রেক্ষাপটেই দেখতে হবে। সমাজে কেবলই দু'টি শ্রেণী বিরাজ করছে মার্ক্স এমন কথা বলেননি। দুই প্রধান বিরোধী শ্রেণীর বাইরেও নানাবিধ

সামাজিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। কমিউনিস্ট ইস্তাহারেও মধ্যবর্তী শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে সকল শ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়াদের বিরোধী হিসাবে সর্বহারা শ্রেণীই সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী। তাঁর মতে, দুই প্রধান বিরোধী শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব যত তীব্র থেকে তীব্রতর হবে তত ঐ মধ্যবর্তী গোষ্ঠীগুলি ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক সেই সংগ্রামে যুক্ত হয়ে পড়ে যেকোন দিকে ঝুঁকে পড়বে। কেবল এই দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেই কার্ল মার্ক্স শ্রেণী সংগ্রাম বলতে দুই মূল এবং বিপরীত স্বার্থের দ্বন্দ্বকে বুঝিয়েছেন।

১.৬ সমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যা ঃ সমাজবিকাশের বিভিন্ন ধাপ

ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তন প্রক্রিয়াটির বিশ্লেষণ করতে হবে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের নির্দিষ্ট বস্তুগত পরিবেশ অনুধাবন করার মাধ্যমে। এই কারণে মার্ক্স মানবসমাজের বিবর্তনকে কতকগুলো বিশেষ পর্যায়ে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারাটি উপলব্ধি করেছেন। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারাটি উপলব্ধি করার এক বিশেষ তাত্ত্বিক প্রয়াসকে বলা হয় 'ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা' বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সমাজ বিকাশের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগকেই এই তাত্ত্বিক প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে সৃষ্টিশীল শ্রমের দ্বারা সচেতনভাবে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। উৎপাদন প্রক্রিয়া মানুষের সৃষ্টিশীলতারই অভিব্যক্তি। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়টি উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। সেই কারণে এর নির্দ্ধারক উপাদান এবং তার চরিত্র বিশ্লেষণকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্স ও এঙ্গেলস মানবসমাজের বিবর্তনকে বিভিন্ন পর্বে শ্রেণীভুক্ত করেছেন। বিভিন্ন পর্বের সমাজব্যবস্থাগুলিকে তাঁরা আবার মূলত এই ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন — বৈর ও অবৈর। দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজ হলো বৈর উৎপাদন সম্পর্ক ভিত্তিক সমাজ। আর আদিম সাম্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ হলো অবৈর উৎপাদন সম্পর্ক বিশিষ্ট সমাজ

১.৬.১ আদিম সাম্যবাদী সমাজ

আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা একত্রে বনজ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত এবং একত্রেই তা ভোগ করত। শিকার, মাছ ধরা, পশুপালন, ফলমূল সংগ্রহের মধ্য দিয়েই তাঁরা জীবিকা নির্বাহ করত। মানুষের প্রধান সম্বল ছিল দৈহিক শক্তি। এই পর্বেরই একটু উন্নত স্তরে পাথর এবং কাঠের তৈরি সহজ সরল যন্ত্রপাতির প্রচলন দেখা যায়। এগুলি ব্যবহারের জন্য খুব সামান্য দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। কোনও অঞ্চলে ফলমূল ও শিকারের অভাব হলে তাঁরা দলবদ্ধভাবে অন্য জায়গায় চলে যেত। মার্ক্স ও এঙ্গেলস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে সেই সময় শোষন না থাকায় শাসিত মানুষদের দমন করার কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (রাষ্ট্র) উদ্ভব হয়নি। সহজ সরল উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তি মালিকানা স্থাপনের কোনরকম সুযোগ ছিল না। সব মানুষই তাই সমান ছিল। সমাজে কোনরকম শ্রেণীভেদ ছিল না। এই সমাজকে তাই আদিম সাম্যবাদী সমাজ হিসাবে

চিহ্নিত করা হয়। এ সময়ের শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ ভিত্তিক যে 'উৎপাদন সম্পর্ক', তা পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মার্ক্সের মতে, এই সমাজের পরিবর্তন হতে শুরু করে প্রধানত দুটি কারণে — ক) প্রথমদিকে উৎপাদনের উপকরণের মান অত্যন্ত নিচু থাকায় উদ্বৃত্ত উৎপাদন করার কোনও সম্ভাবনা ছিল না, তাই তা কোনও গোষ্ঠীর আত্মসাৎ করার সুযোগও ছিল না। একটি পর্যায়ে এসে উৎপাদন শক্তি ক্রমে বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে প্রকৃতির দমনমূলক প্রভাব থেকে আদিম মানুষ নিজেদের মুক্ত করতে সচেষ্ট হলো। এর ফলে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত উৎপাদন দেখা দিল। খ) উত্তরোত্তর জনসংখ্যাবৃদ্ধি, ভোগের চাহিদা বৃদ্ধি, ইত্যাদি কারণে চারণ ক্ষেত্র, চাষযোগ্য ভূমি, শিকার ভূমি নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংঘাত শুরু হয়। উৎপাদন সম্পর্কে এল মৌলিক পরিবর্তন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটল। সমাজে দেখা দিল পরস্পর স্বার্থবিরোধী শ্রেণী সমূহ- মনিব ও দাস।

১.৬.২ দাস সমাজ

মার্ক্সের মতে, দাস সমাজই ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী নির্ভর শোষণ মূলক সমাজ। উৎপাদনের উপকরণে আরও উন্নতি ঘটল। লোহা গলানোর কৌশল আয়ত্ব করায় এই সমাজের মানুষ কাঠের লাঙলের পরিবর্তে লৌহ ফলার লাঙল ও কুঠার ব্যবহার করতে শুরু করল। বেশি জমি চাষ করতে এবং পশুপালন অর্থনীতিকে সচল রাখতে বাড়তি শ্রম চাই। দাস এই শ্রম সরবরাহ করত। এর ফলে ব্যক্তি মালিকানাধীন উৎপাদন ব্যবস্থায় অন্যের শ্রমলব্ধ ফল আত্মসাৎ করার সম্ভাবনা তৈরি হলো। দাস মালিকরা দাসদের নির্মমভাবে শোষণ করতে শুরু করল। উৎপাদনের সজীব উপকরণ হয়ে দাসেরা মালিকের জন্য উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করতে বাধ্য হতো। কিন্তু, উৎপন্ন দ্রব্যের ওপর তাঁদের কোনওরকম অধিকার ছিল না। পণ্যের ন্যায় দাসদের কেনাবেচা করা যেত। মালিক তার দাসদের মেরে ফেললেও কারও কিছু বলার ছিল না। দাস মালিকরা শাসনের দণ্ড হাতে নিয়ে নিজেদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে শুরু করল। রাষ্ট্র নামক 'শোষনের যন্ত্রের' উদ্ভব হলো।

দাস বিদ্রোহ, অভিজাত শ্রেণীর সঙ্কট, বৃহৎ জমির মালিকদের দাসশ্রমে আশানুরূপ লাভ না হওয়া প্রভৃতি কারণে প্রচলিত দাস সমাজে ভাঙন দেখা দেয় এবং আসন্ন সামন্তসমাজের আগমনী শোনা যায়।

১.৬.৩ সামন্ত সমাজ

রোমান দাসপ্রথা যখন ধ্বংসোন্মুখ সেই সময়কাল পশ্চিম ইউরোপে সামন্তসমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই সমাজে উৎপাদন শক্তি আরও এক কদম এগিয়ে যায়। ভূমি কেন্দ্রিক অর্থনীতি হলো এই সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির মূল চরিত্র আর প্রধান দুটি শ্রেণী ছিল — সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস (Serf)। ভূমিদাস বা সার্ফদের অবস্থা দাসদের (Slave) চাইতে কিছুটা উন্নত ছিল। তারা ছিল তুলনায় স্বাধীন। দাসদের কোনওরকম স্বাধীনতা ছিল না। তাদের নিজেদের প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র্য কোনও অস্তিত্বই ছিল না বলে চলে। অন্যদিকে, ভূমিদাসরা ভূস্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক কাজ করবার পর নিজের জন্যও কাজ করতে পারত। সামন্তসমাজে ভূমিদাসদের চাষের অধিকার ছিল কিন্তু তারা জমির মালিক ছিল না। জমি থাকত সামন্তপ্রভুদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে। বেগার খাটা এবং খাজনার টাকা দেওয়া ছিল এই শোষণ ব্যবস্থার অঙ্গ। পেরি অ্যান্ডারসনের মতে, সামন্তপ্রভু এবং ভূমিদাস — এই দুই শ্রেণীতে সমাজ সম্পূর্ণরূপে বিভাজিত ছিল না। এর মধ্যবর্তী স্তরে সম্পত্তির মালিকানা অন্যান্য আরও কয়েকটি শ্রেণীর হাতেও ছিল। কৃষি জমিতে রূপান্তর সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করে। উৎপাদন কৌশল এবং

প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন হতে শুরু করল। উৎপাদিত দ্রব্য সম্ভার বিক্রির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হলো, দেখা দিল উপনিবেশের বিস্তার। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক সামন্তসমাজের গর্ভেই জন্ম লাভ করলো। শহরের সংগঠিত ব্যবসায়ীরা সামন্ততন্ত্রে বিরোধী হয়ে উঠল। অন্যদিকে সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে ভূমিদাসদের শ্রেণীদ্বন্দ্বও তীব্রতর হলো। উদ্ভুত পরিস্থিতি সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় অনিবার্য করে তুলল এবং বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের উন্মেষ ঘটলো।

১.৬.৪ পুঁজিবাদী সমাজ

মার্ক্সের মতে, পুঁজিবাদী সমাজ উৎপাদন উপায়ের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে মূলতঃ বুর্জোয়া এবং সর্বহারা এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। তিনি পুঁজিবাদী সমাজ ও তার দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি এবং প্রোলেতারিয়েট বা সর্বহারা শ্রমিক ছাড়াও এই সমাজে পেটি বুর্জোয়া (Petty bourgeois), কৃষক শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী, লুম্পেন প্রোলেতারিয়েট, প্রভৃতির অস্তিত্বের কথাও মার্ক্স উল্লেখ করেছেন। ক্রমশ তা মূল শ্রেণীতে লীন হয়ে যায়। এই সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজির মালিকরা অধিকতর মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রমিককে শ্রমের পূর্ণমূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। এই সমাজে উৎপাদনের চরিত্র অর্জন করে। শ্রমিক পণ্য উৎপাদন করলেও তার মালিক হয় পুঁজিপতি। পুঁজিপতি শ্রেণীর পুঁজিসঞ্চয় ঘটে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে। মার্ক্সের মতে, পুঁজি প্রকৃত অর্থে উদ্বৃত্ত শ্রমের ফল, কিন্তু সেই শ্রম থেকে উৎপন্ন উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশীদার হওয়া থেকে শ্রমিক বঞ্চিত করে। এটিই হলো পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশোষণের মূল কথা। এই সমাজ ব্যবস্থাই শ্রেণী শোষণের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ — এ কথা মার্ক্স বারংবার উল্লেখ করেছেন।

কার্ল মার্ক্সের মতে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। উৎপাদনের উপকরণগুলির ধারাবাহিক উন্নতির ওপরই পুঁজিবাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। সেই কারণে পুঁজিবাদী সভ্যতার অগ্রগতি বিস্ময়কর। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত সঙ্কট থেকে পুঁজিবাদের মুক্তি নেই। মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য। উৎপাদন শক্তিকে পুঁজিবাদীরা আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। এই সমাজের অবস্থা সেই যাদুকরের মতো যে যাদুবলে পাতালপুরীর দৈত্য দানবকে জাগিয়ে তুলে সেগুলোকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার-এ বলা হয়েছে— ''বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ও আধিপত্যের মূল শর্ত হলো পুঁজি সৃষ্টি ও বৃদ্ধি; পুঁজির শর্ত হলো মজুরি-শ্রম। মজুরি শ্রম সম্পূর্ণভাবে মজুরদের মধ্যেকার, প্রতিযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যন্ত্রশিল্পের যে অগ্রগতি বুর্জোয়াশ্রেণী না ভেবেই বাড়িয়ে চলে, তার ফলে শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা হেতু বিচ্ছিন্নতার জায়গায় আসে সম্মিলন-হেতু বিপ্লবী ঐক্য। সুতরাং যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদন করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য দখল করে, আধুনিক শিল্পের বিকাশ তার পায়ের তলা থেকে সেই ভিত্তিটাই কেড়ে নিচ্ছে। তাই বুর্জোয়া শ্রেণী তৈরি করছে সর্বোপরি তার সমাধি খনকদের। বুর্জোয়ার পতন এবং প্রলেতারিয়েতের জয়লাভ — দুই-ই সমান অনিবার্য।'' পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে, যা হয়ে ওঠে সমাজ পরিবর্তনের, সমাজ বিপ্লবের পূর্বশর্ত। পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক পরিপক্কতা লাভ করবে বলে কার্ল মার্ক্স বিশ্বাস করতেন। যেমন সামন্ত সমাজের গর্ভে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক পরিপক্কতা লাভ করেছিল। মার্ক্সের মতে, তখন বিপ্লব সংঘটিত হবে, তাঁর মতে, বিপ্লব কোনও রাজনৈতিক দুর্ঘটনা নয়, বরং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তারই অভিব্যক্তি।

১.৬.৫ সমাজতান্ত্রিক সমাজ

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতে, শ্রমশক্তির প্রতিভূ হিসাবে সংঘবদ্ধ সর্বহারার দল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করবে এবং পুঁজিবাদী সমাজের অবসান ঘটাবে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের পর ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ সাধন করা হবে। উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রেণী শোষণ বিলুপ্ত হবে। ক্রমশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্রগতির মধ্য দিয়ে মানুষ সাম্যবাদের পথে উপনীত হবে। এর ফলে শ্রেণী শোষনের হাতিয়ার হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীতা থাকবে না। রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শাসনের অবসান ঘটবে। তার পরিবর্তে বস্তুর উপর ব্যক্তির শাসনের প্রতিষ্ঠা হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার সাধ্যমত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবে এবং তার প্রয়োজনমত দ্রব্য সামগ্রী লাভ করবে।

১.৭ সমাজ পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা ঃ উল্লেখযোগ্য বিতর্ক

সমাজ পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা তত্ত্বগতভাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধ — এ কথা আজ অনেক সমাজবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন। তবে এই ব্যাখ্যা পশ্চিমী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বিষয়ে যথার্থ বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে পারেনি বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন। পুঁজিবাদের সংকটের প্রশ্নটি বারংবার মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় উল্লেখিত হয়েছে। এই সংকট যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইসব দেশগুলিতে পুঁজিবাদের পতনের কোনও রকম সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। এই বিতর্কে মার্ক্সবাদীরাও নিজস্ব যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তাঁদের মতে, পুঁজিবাদ তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে আপনা আপনি ভুলুণ্ঠিত হবে মার্ক্সীয় তত্ত্ব একথা মনে করে না। প্রযুক্তি, মতাদর্শ, রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, অর্থব্যবস্থা প্রভৃতিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন সাধন করে পুঁজিবাদ যে তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বহুকাল সামিল থাকবে — মার্ক্স এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, এই শোষণ ব্যবস্থার নাগপাশ থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্তি পেতে হলে তাদের শ্রেণী সচেতন হতে হবে, রাজনৈতিক ভাবে সংঘটিত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিজেদের যুক্ত করতে হবে। শ্রেণীভেদ থাকলেই যে আপনা থেকে শ্রেণী দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে মার্ক্স একথা বলেননি। শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগঠিত ভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবার মানসিকতা অর্জন না করা পর্যন্ত বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না। ফলে সমাজের মৌলিক পরিবর্তনও ততদিন পর্যন্ত সম্ভব নয়।

সমালোচকদের মতে, সমাজের যাবতীয় ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতিগত পরিবর্তনগুলি শুধুমাত্র আর্থসামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্বগত চালিকাশক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় — এ এক অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। উত্তর আধুনিকতাবাদীরাও (post modernists) মনে করেন যে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় শ্রেণীর ওপর অত্যধিক জোর পড়ায় মানব সমাজের অন্যমাত্রার বাচনগুলি (discourse) দমিত হয়। মানব ইতিহাসকে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস বলে দেখলে অন্যান্য বাচনের ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় শ্রেণী দ্বন্দ্বের বাচনটিকে একটি কর্তৃত্বকারী বাচনে (dominant discourse) পরিণত করার ফলে এটাই ঘটেছে। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদী সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যে সমাজজীবনের বহুবিধ শক্তি এবং উপাদানগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে সমালোচকগণ সেদিকটা বিবেচনা করে দেখেননি।

১.৮ সারাংশ

সমাজ পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় ভাববাদী চিন্তাধারাকে বর্জন করা হয়। মার্ক্স ও তাঁর সহযোগী এঙ্গেলস বস্তুজগতের মধ্যেই সমাজ পরিবর্তনের কারণগুলি অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হন। তাঁরা সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, সমাজ পরিবর্তন ঘটছে মূলতঃ কতকগুলি পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়ায়। অথনৈতিক শক্তির প্রাথমিক গুরুত্বকে চিহ্নিত করায় অনেক সমালোচক মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাকে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু, মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় অ-অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্বও অস্বীকার করা হয়নি। বস্তুত, এক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদ বর্জন করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজের ভিত্তি বা অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন হলে যাবতীয় উপরিকাঠামোগত আইন, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতিগত ব্যবস্থাগুলিতেও পরিবর্তন সূচিত হয় — সমালোচকদের মতে, এ ধরনের বক্তব্য একরৈখিক পরিবর্তনের ধারণাকেই উপস্থাপিত করে। কিন্তু, দ্বন্দ্ববাদ অনুসরণ করলে এই সমালোচনা গুরুত্ব পাবে না। এ প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা দরকার যে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় ভিত্তি ও উপরিকাঠামো দ্বান্দ্বিক সূত্রে গ্রথিত।

মার্ক্সসের মতে, মানব ইতিহাসের মূল চালিকা শক্তি হলো শ্রেণীসংগ্রাম। শ্রেণী সংগ্রাম বলতে দুই মূল এবং বিপরীত স্বার্থবাহী শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে বোঝান হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের কারণ হিসাবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করা যেতে পারে। সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হবার সাথে সাথেই শুরু হয় শ্রেণী সংগ্রাম। আদিম সাম্যবাদী সমাজ বাদ দিয়ে বাকী সব ধরনের সমাজে শ্রেণীভেদ পরিলক্ষিত হয়। বিরোধ মূলত দুটি শ্রেণীর — একটি শ্রেণী উৎপাদন উপায়ের মালিক এবং অন্য শ্রেণী মালিকানা থেকে বঞ্চিত। শ্রেণী সংগ্রাম না থাকলে, শোষন নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম না থাকলে সমাজ পরিবর্তনের পটভূমি সৃষ্টি হয় না। আবার শ্রেণী চেতনা সৃষ্টি না হলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হতে পারে না। মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুযায়ী, উৎপাদন প্রক্রিয়াজাত মৌলিক দ্বন্দ্বের পরিণতি হিসাবে প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্যায় তার পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হয়। উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মার্ক্স ও এঙ্গেলস মানব সমাজের বিবর্তনকে বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত করেছেন, এগুলি হলো আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

সমাজ পরিবর্তনের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা তত্ত্বগতভাবে যথেষ্ট সমৃদ্ধ একথা আজ অনেক সমাজবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন। সমালোচকরা আবার মনে করেন যে সমাজ পরিবর্তন শুধুমাত্র আর্থ সামাজিক শ্রেণী দ্বন্দ্বগত চালিকাশক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় — এ এক অতিসরলীকৃত ব্যাখ্যা। এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা যে সমাজ জীবনের বহুবিধ শক্তি ও উপাদানগুলিকে কতটা গুরুত্ব দেয় তা বিশ্লেষণ করে দেখলেই এই ধরণের সমালোচনার অসাড়তা প্রমাণ হবে।

১.৯ অনুশীলনী

১.৯.১ বিস্তারিত উত্তর দিন।

(ক) সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্ক্সীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

(খ) সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে মার্ক্স কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

(গ) ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে মার্ক্স মানব সমাজের বিবর্তনের যে রূপরেখা দিয়েছেন তা আলোচনা করুন।

(ঘ) সমাজ পরিবর্তনের কারণ হিসাবে মার্ক্স শ্রেণী দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমাজ পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করেছেন তা আলোচনা করুন।

১.৯.২ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

ক) সমাজ পরিবর্তনে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব কতটা?

খ) সমাজ পরিবর্তন ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

গ) শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী চেতনা বলতে কী বোঝায়?

ঘ) ভিত্তি ও উপরিকাঠামোর পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

ঙ) শ্রেণীদ্বন্দ্ব কাকে বলে?

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১) Bottomore, Tom et al (ed) : A Dictionary of Marxist Thought (Oxford), 1983).

২) Fischer, E : Marx in his own words (Harmondsworth, 1970).

৩) McLellan, D (ed.) : Marxism after Marx (London, 1979).

৪) Swingewood, A : Marx and Modern Social Theory (London, 1975).

৫) দত্তগুপ্ত শোভনলাল ও ঘোষ উৎপল ঃ মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব (কলকাতা, ২০০০)।

একক ২ ❑ থর্স্টেইন ভেবলেন (Thorstein Veblen) ঃ সামাজিক পরিবর্তনের প্রযুক্তিগত তত্ত্ব

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য
২.২ প্রস্তাবনা
২.৩ সমাজ পরিবর্তন ঃ প্রযুক্তির ভূমিকা
২.৩.১ উৎপাদন কলাকৌশল ও মানসিক বৃত্তির অভিযোজন
২.৪ সমাজ বিবর্তন ঃ অবকাশ ভোগী শ্রেণীর ভূমিকা
২.৫ সমাজ বিবর্তন ঃ বিভিন্ন ধাপ
২.৬ সমাজ-পরিবর্তন ঃ মার্ক্স ও ভেবলেন-এর মতবাদের তুলনা
২.৭ সারাংশ
২.৮ অনুশীলনী
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :—

- সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ভেবলেন কীভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,
- সমাজ পরিবর্তনে প্রযুক্তির ভূমিকা কতটা,
- ভেবলেন বর্ণিত সমাজ বিবর্তনের ধাপগুলি কী কী,
- সমাজ বিবর্তণে অবকাশভোগী শ্রেণীর (Leisure class) ভূমিকা কি,
- মার্ক্স ও ভেবলেন-এর সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদের মধ্যে মিল-অমিল কোথায়।

২.২. প্রস্তাবনা

প্রখ্যাত আমেরিকান সমাজতাত্ত্বিক থর্স্টেইন ভেবলেন ছিলেন বিবর্তনবাদী। ডারউইন এবং স্পেনসার-এর মতবাদের প্রভাব তাঁর চিন্তাভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভেবলেন বিশ্বাস করতেন, সমাজের পরিবর্তন 'কখনো শেষ না হওয়া' এক প্রক্রিয়া। এর কোনও অন্তিম স্তর নেই। এ হলো নিরন্তর ঘটে চলা এক প্রক্রিয়া। কোনও সংস্থাই এই প্রক্রিয়া থেকে কখনো মুক্ত হতে পারে না। তাঁর মতে, মানব সমাজের বিবর্তন হলো মানুষের অভ্যাস,

মানসিকতা ও কর্মপ্রক্রিয়ার সামগ্রিক পরিবর্তন। এ হলো ভৌত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান বা অভিযোজনের (adaptation) এক চিরস্থায়ী প্রক্রিয়া। ভেবলেন-এর মতে, বিবর্তনের কোনও চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে না, এ হলো ক্রমপুঞ্জিত মনোবলীর সমাহার। তিনি মনে করেন, উন্নততর প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার ব্যবহার মানব সমাজের পরিবর্তন সূচিত করে। তাঁর মতে, ভৌত পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অভিযোজনের প্রকৃতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকা অপরিসীম।

অনেকের মতে, সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় ভেবলেন এক ধরণের নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। একে বলা হয় প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদ (Technological determinism) তাঁর এই প্রযুক্তিগত নির্ধারণ তত্ত্ব সবার কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

২.৩ সমাজ পরিবর্তন ঃ প্রযুক্তির ভূমিকা

থর্স্টেইন ভেবলেন সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হলো, উৎপাদন কলা-কৌশল এবং প্রযুক্তির উন্নতি ও পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। এর মাধ্যম বা প্রণালী হিসাবে তিনি মানুষের অভ্যাস ও কর্মপদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহারের ফলে নিজে থেকেই সমাজ পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। নতুন প্রযুক্তি সমকালীন সমাজের প্রচলিত অভ্যাস, প্রথা, মনোবৃত্তি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়।

ভেবলেন তাঁর সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাতে মনে করেছেন যে মানুষ তার অভ্যাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি ভৌত পরিবেশ বিশেষ করে ঔদ্যোগিক পরিবর্তনের অনুসারী হয়। অন্য কথায়, মানুষের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি সেই সমস্ত কাজ তথা নিয়মের প্রত্যক্ষ ফল যার দ্বারা সে নিজের জীবিকা উপার্জন করে থাকে। মানুষ যেমন কাজ করে তাই তার জীবনের স্বরূপকে নিশ্চিত করে এবং তারই অনুসারে তার অভ্যাস গঠিত হয়ে থাকে। এই অভ্যাস গুলি তাঁর ভাবনাকে প্রভাবিত করে এবং তাদের নিশ্চিত স্বরূপ প্রদান করে। ভেবলেন মনে করতেন মানুষের চিন্তাকর্মে অভ্যস্তকরণ (habituation) প্রক্রিয়াটি সমাজবিকাশের প্রধান কারক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। অভ্যাস, চিন্তা কর্ম-এই সবই এক সূত্রে বাঁধা। যেমন অভ্যাস হয় তেমন চিন্তাভাবনাও হয়ে থাকে। অর্থাৎ চিন্তার ধারাটাই অভ্যাসের ধারা। ভেবলেন বলেন, 'The way of habit is the way of thought'। তিনি আরও বলেন, মানুষ যেভাবে কাজ করে সেভাবেই তার অনুভূতি ও চিন্তাধার বিকাশ লাভ করে। তাঁর কথায় - 'As the man acts, so he feels and thinks'। উৎপাদন কলাকৌশল মানুষের চিন্তা ও মনন প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে ক্রমশই মানুষের অভ্যাস, মানসিকতা, ও কর্মপ্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে তাই সাম্প্রতিকভাবে সামাজিক পরিবর্তনের পথ নির্দেশ করে। অভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমেই সামাজিক পরিবর্তনের ধারাটি বজায় থাকে। ভেবলেন মনে করেন যে ভৌত পরিবেশ অনুসারেই মানুষকে তাঁর মনোজগৎ গঠন করতে হয়। এই যুক্তির যথার্থ্যও তিনি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন —

পশুপালনযুগের মানুষের অভ্যাস, সংস্কৃতি এবং সংস্থাগুলি কৃষিযুগের মানুষের অভ্যাস থেকে ভিন্ন ছিল। আবার যান্ত্রিকযুগে এই পার্থক্য আরও বেশি হয়ে যায়। বিভিন্ন যুগের ভৌত পরিস্থিতির পার্থক্যকেই এসবের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তাঁর মতে, ভৌত পরিস্থিতি সেই কার্যকেই নিশ্চিত করে যা মানুষের করা উচিত। পশুপালনের যুগে মানুষের পক্ষে মেশিনে কাজ করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ ভৌত পরিস্থিতিই মানুষের কাজের ধরণকে নিশ্চিত রূপ দেয়। এই কাজ নতুন অভ্যাসের সৃষ্টি করে। আবার এই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে মানুষের বিচারধারা বিকশিত হতে থাকে; মানুষের এই বিচারধারা বা ভাবনার ওপরেই সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে। তাই যা কিছু মানুষ করে, যেমন সে কাজ করে তেমনি তার উপলব্ধি এবং ভাবনাও করে থাকে। ভেবলেন তাই মনে করেন ভৌত পরিবেশই সেই শক্তি যা মানবজীবন এবং সামাজিক রূপের বিকাশকে নিশ্চিত করে থাকে।

ভেবলেন বলেন, এটা সত্য যে মানুষের মূল প্রবৃত্তিগুলি অনেকাংশে স্থির। কিন্তু, এই মূল প্রবৃত্তিগুলির সাথে সম্বন্ধযুক্ত অভ্যাসগুলি ভৌত পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে পাল্টে যায়। এই অভ্যাসগুলির স্বরূপ, প্রকৃতি, কার্য করার সীমা, প্রভৃতি পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। ভৌত পরিবেশের দ্বারা গঠিত মানুষের এই অভ্যাসগুলি ধীরে ধীরে সামাজিক অন্তঃক্রিয়ার ফলস্বরূপ স্থির ও দৃঢ় রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন সমাজের ভৌত পরিস্থিতি বা পরিবেশ একরূপ হয় না, তাই সেখানকার লোকেদের অভ্যাস বা সামাজিক রূপও একরকম হয় না। অন্য কথায় আমরা বলতে পারি যে বিভিন্ন সমাজের সামাজিক রূপের মধ্যে যে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়, তার কারণ এই সমাজগুলির মধ্যে ব্যাপ্ত ভৌত পরিস্থিতির বিভিন্নতা। ভেবলেন তাঁর সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদকে স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন যে সমাজের বিকাশ আসলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের মানসিক সম্মেলনের একটি প্রক্রিয়া যা নতুন পরিস্থিতির চাপে উৎপন্ন হয়, যা পুরনো পরিস্থিতি দ্বারা উৎপন্ন এবং উক্ত পরিস্থিতির অনুকূল চিন্তাধারাকে সহ্য করতে পারে না।

ভেবলেন-এর সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে। কোনও বিশেষ সমাজের প্রযুক্তিগত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন হলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সঙ্গে মানিয়ে চলা সেই সমাজের সদস্যদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ সেই নতুন পরিস্থিতি পুরানো পরিস্থিতিতে গঠিত অভ্যাসগুলিকে আর সহ্য করতে পারে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, নতুন পরিস্থিতিতে পুরানো অভ্যাস অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়। এই কারণে ব্যক্তিকে নব নব অভ্যাস গঠন করতে হয়। নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনে উৎপন্ন এই নতুন অভ্যাসের ফলে সামাজিক সংস্থাগুলিতেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়, কারণ অভ্যাসগুলির স্থির স্বরূপই হলো সংস্থা। অভ্যাস ও সংস্থাগুলিতে পরিবর্তনের অর্থ হলো সামাজিক রূপের পরিবর্তন।

২.৩.১ উৎপাদন কলাকৌশল ও মানসিক বৃত্তির অভিযোজন

মনোজগতে উৎপাদন কলাকৌশলের গভীর প্রভাব ভেবলেনের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে, কোনও নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় মানুষ যে ধরনের কাজে ব্যাপৃত থাকে সেই অনুযায়ী তাঁর বিশেষ এক ধরনের মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়। তাঁদের চিন্তন, মনন প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলি সেই নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত হয়। উৎপাদনের কাজে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করা হয়। ফলে এক যুগে যে মানসিকতা উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, অন্য যুগে তাই অচল বলে পরিগণিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়,

সামন্তযুগে উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ হয়নি। তার ফলে সেই যুগের উৎপাদন ব্যবস্থা মূলতঃ লোকবলের উপরই নির্ভরশীল ছিল। সেই সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে স্বল্পসংখ্যক মানুষের অধীনে থেকে কায়িক পরিশ্রম করতে হতো। মানুষের মানসিকতাও সেই যুগের উপযোগী হয়েই গড়ে উঠেছিল। বহুসংখ্যক মানুষের ইচ্ছা অল্পকিছু মানুষের ইচ্ছার কাছে অবদমিত হতো। যেমন, কৃষকদের সামন্তপ্রভুদের জমিতে কাজ করতে হতো, জমির মালিকদের মর্জি অনুযায়ী তাঁদেরও চলতে হতো। পরবর্তী যুগে উৎপাদনের কাজে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ শুরু হয়। সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন পদ্ধতিতে লোকবলের গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন কলাকৌশলের এই পরিবর্তন মানুষের চিন্তন, মনন, প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিতেও পরিবর্তন আনে। যন্ত্রশিল্পের যুগে সামন্তযুগের মানসিকতা অচল হয়ে পড়ে। এই ধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্যই ভেবলেনকে প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদী বলা হয়। কারণ, তাঁর মতে মানুষ যে কাজে নিযুক্ত থাকে, উৎপাদন ক্ষেত্রে যে কলাকৌশল সে অনুসরণ করে, তার দ্বারা তার মানসিক বৃত্তি গুলি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। পূর্বে প্রচলিত কলাকৌশলের প্রভাবে যে ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছিল, পরিবর্তিত অবস্থায় তা অচল হয়ে পড়ে। এর ফলে, অবস্থার চাপে পড়ে মানুষকে নানারকম মানসিক অভিযোজন (mental adaptation) করে চলতে হয়। এইভাবে সমাজেও পরিবর্তন ঘটে।

২.৪ সমাজ বিবর্তন ঃ অবকাশভোগী শ্রেণীর ভূমিকা

প্রযুক্তির উন্নতি ও তার প্রয়োগকেই ভেবলেন সামাজিক পরিবর্তনের কারণ মনে করেন। তবে তিনি একথাও স্বীকার করেন যে উৎপাদনের কাজে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার শুরু হলেও সমাজের সকল লোক এর দ্বারা একইরকম ভাবে প্রভাবিত হয় না। উৎপাদন কাজের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তাঁরা যন্ত্রসভ্যতার দ্বারা যতটা গভীরভাবে প্রভাবিত হন, অন্যরা ততটা হন না। অবকাশ ভোগী বিত্তবান শ্রেণী (the wealthy leisure class) উৎপাদন কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে না। সুতরাং তারা একই ভাবে প্রভাবিত হয় না। এদের মধ্যে ভিন্ন জীবনধারা গড়ে ওঠে। এর ফলে সমাজে একটির পরিবর্তে দুটি ভিন্ন জীবনধারা গড়ে ওঠে (Hence there are two cultures instead of one within society)। এই প্রসঙ্গে ভেবলেন বলেন যে, সমাজে কোনও শ্রেণী উৎপাদন কলাকৌশলের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারলে সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক পরিবর্তনেও তাদের কোনও রকম উৎসাহ থাকে না। বরং তারা পরিবর্তনের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতেই সচেষ্ট থাকে। ভেবলেন অবকাশ ভোগী বিত্তবান শ্রেণীকে এই দলভুক্ত বলে মনে করেন। উৎপাদন কলাকৌশল পরিবর্তনের ফলে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের চিন্তাধারা, আদর্শ, মূল্যবোধ, প্রভৃতির পরিবর্তন হলেও অবকাশভোগী শ্রেণীর ক্ষেত্রে সেরকম হয় না। যেহেতু এই শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা উৎপাদন কার্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন না তাই তারা পুরনোপন্থীই থেকে যান। তাঁরা আগেকার দিনের চিন্তাধারা, মানসিকতা, আদর্শ প্রভৃতি অনুসরণ করে চলেন। সমাজে এঁরা রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করে চলেন। ভেবলেন শিল্প মালিকদের অবকাশভোগী শ্রেণী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এই শিল্প মালিকরা পরজীবী যেহেতু তাঁরা অপরের প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব ও আবিষ্কারের উপরে নির্ভর করেই অলসভাবে জীবন ধারণ করে থাকে। পুরনো সমাজের এই প্রতিনিধিরা স্বাভাবিকভাবেই স্থিতিশীল অবস্থার (status quo) সমর্থক।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল তারই পটভূমিতে ভেবলেন-এর অবকাশ ভোগী শ্রেণী সম্পর্কিত মতবাদটি গড়ে ওঠে। কৃষিভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কিছু মানুষ সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল — এই বিষয়টি ভেবলেন-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। এই মানুষেরা ছিল অবকাশ ভোগী শ্রেণীভুক্ত। নতুন শিল্প সমাজের মধ্যেও অনুরূপ একটি অলস গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল। এই অবকাশভোগী অলস মানুষেরা সমাজ পরিবর্তনের পথে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। শেষপর্যন্ত, উৎপাদন কলাকৌশল এবং প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে যুক্ত অধিকসংখ্যক মানুষের অভ্যাস প্রক্রিয়া (Habituation) সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। সুতরাং ভেবলেন এর মতবাদ অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তন ও বিকাশের মূল নির্ধারণকারী শক্তি হলো নব নব প্রযুক্তির সাথে যুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। এরই ফলে একই দেশে প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে দুই ধরনের সংস্কৃতি বা জীবনধারা পরিলক্ষিত হতে পারে। ভেবলেন-এর এই ধরনের তত্ত্বে একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় — উৎপাদন কর্মে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত অধিকাংশ মানুষের অভ্যস্তকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবকাশ ভোগী অলস মানুষদের পুরানো প্রচলিত অভ্যাস আঁকড়ে ধরে থাকার দ্বন্দ্ব।

২.৫ সমাজ বিবর্তন ঃ বিভিন্ন ধাপ

ভেবলেন মনে করেন, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার অবস্থানের সাহায্যেই নির্ধারিত হয়। উৎপাদন কার্যে মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে অভ্যাস, বিভিন্ন সামাজিক প্রথা এবং চিন্তাচেতনার ধারা। এইসব অভ্যাস ও প্রথাই ক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। ভেবলেনের মতে সমাজবিবর্তনকে শিল্প শৈলীর বিকাশজনিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের একটি ধরন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি সমাজের বিবর্তনের চারটি ধাপের কথা বলেছেন। প্রথমতঃ নতুন প্রস্তর যুগের শান্তিপূর্ণ আদিম অর্থনীতি, দ্বিতীয়ত, লুণ্ঠন ভিত্তিক বর্বর অর্থনীতি — যেখানে, যুদ্ধবিগ্রহ, সম্পত্তি, অবকাশ ভোগী শ্রেণী প্রভৃতির উদ্ভব হতে দেখা যায়। তৃতীয়ত, প্রাক্ আধুনিক হস্তশিল্প এবং চতুর্থত যন্ত্রনির্ভর আধুনিক অর্থনীতি। ভেবলেনের মতে, শান্তিপূর্ণ আদিম অর্থনীতিতে (state of peaceful savage economy) আধিপত্যকারী গোষ্ঠীর সাধারণভাবে কোনও অস্তিত্ব ছিল না। সেই কারণে সমাজে আধিপত্যবিস্তারের লক্ষ্যে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের কোনও রকম প্রয়োজন হতো না। সেই সময়কালে মানুষের সামাজিক উদ্যম উৎপাদন কার্যেই নিয়োজিত হতো এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে পূরণ করবার সবরকম প্রচেষ্টাই গ্রহণ করা হতো। লুণ্ঠনভিত্তিক বর্বর অর্থনীতিতে (state of predatory barbarous economy) ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণের জন্য অন্যের সম্পত্তি বলপূর্বক ছিনিয়ে নেবার প্রচেষ্টা শুরু হয়। বাহুবলে মানুষ অন্যের উপর প্রভূত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট হয়। এই সময় মহিলাদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পেছনে একই কারণ কাজ করে। দৈহিক ক্ষমতাই মানুষের সামাজিক মর্যাদার নির্ধারক হয়ে ওঠে। শক্তিশালী মানুষেরা দুর্বলদের দাস-এ পরিণত করে এবং উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

প্রাক আধুনিক যুগে হস্তশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিতে (State of handicraft economy of premodern period) ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। ক্ষমতাবান মানুষেরা চতুরতা ও চালাকির সাহায্যে সমাজে তাদের কতৃত্ব আরও দৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়।

যন্ত্রনির্ভর আধুনিক অর্থনীতিতে (State of machine technology) নতুন প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার উদ্ভব হয়। মানুষের প্রয়োজন এবং নিত্য নতুন চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এই যুগ বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে।

ভেবলেন-এর মতে, হস্তশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিতে উৎপাদন কলা কৌশল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে উৎপাদন কার্য মূলতঃ লোকবলের উপরই নির্ভরশীল। এই প্রথায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে স্বল্প সংখ্যক ক্ষমতাবান মানুষের অধীনে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। স্বাভাবিক কারণেই উৎপাদন পদ্ধতির অনুসারী সামাজিক কাঠামো ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাজনের নীতি অনুযায়ী গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো — (ক) ব্যক্তিগত দক্ষতার গুরুত্ব এবং (খ) মানুষ মানুষের অধীন হওয়া। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক গোষ্ঠী দ্বারা অন্য গোষ্ঠীর শোষণ হতো এবং দৈহিক শক্তি ও দক্ষতাই সাফল্যের প্রধান উপায় ছিল।

হস্তশিল্পভিত্তিক অর্থনীতির বদলে যেই যন্ত্রশিল্প ভিত্তিক অর্থনীতির প্রবর্তন হলো সাথে সাথেই সমাজ জীবনেও পরিবর্তন দেখা দিল। সামন্তযুগীয় চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে আধুনিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠল। উৎপাদন কার্যে দৈহিক শক্তির স্থান যান্ত্রিক শক্তি গ্রহণ করল। এখন শুধু দৈহিক শক্তিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হলো না, তার সাথে দক্ষতারও প্রয়োজন দেখা দিল। ভেবলেন বিশ্বাস করেন যে গণতান্ত্রিক নীতির উপর শিল্পভিত্তিক সমাজ (industrial democratic regime) গড়ে উঠলে যন্ত্র-সভ্যতার প্রভাব সমাজের মানুষের মধ্যে অধিকতর সম্প্রসারিত হবে। উৎপাদনের কলাকৌশলের পরিবর্তন যতদিন চলবে, মানুষের ভাবনার জগতে পরিবর্তনের ধারাও ততদিন অব্যাহত থাকবে। এর কোন চূড়ান্ত পরিণতি বা সমাপ্তির কথা তিনি উল্লেখ করেননি।

তবে ভেবলেন মনে করেন, শিল্পক্ষেত্রে যে দ্রুততার সাথে পরিবর্তন ঘটে সেরকম দ্রুততায় সামাজিক সংস্থাগুলিতে বা সামাজিক রূপে পরিবর্তন ঘটে না। সামাজিক রূপ ও সংস্থাগুলি অধিকতর স্থির প্রকৃতির হয়। সাথে সাথে বিত্তবান শ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে সমাজ পরিবর্তনের বিরোধীতা করে থাকে। কিন্তু, যান্ত্রিক বা ভৌত পরিবেশ সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের গতি কখনও থামে না। এই গতিশীলতার চাপে সমস্ত বস্তুকেই পরিবর্তিত হতে হয়। কোনও সংস্থাই এই প্রক্রিয়া থেকে মুক্ত হতে পারে না। নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তাই সমাজ সংস্থাগুলির মধ্যে নিশ্চিতভাবে পরিবর্তনের হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে। যার ফলে সমাজে পরিবর্তন দেখা যায়।

২.৬ সমাজ পরিবর্তন ঃ মার্ক্স ও ভেবলেন-এর মতবাদের তুলনা

মার্ক্স এবং ভেবলেন-এর সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বে কিছু ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আবার এই দুই সমাজবিজ্ঞানীর তত্ত্বে অমিল ও যথেষ্ট। মার্ক্সীয় তত্ত্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা ভিত্তির সঙ্গে উপরিকাঠামোগত চিন্তাদর্শের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কথা বলা হয়। তার পরিবর্তে ভেবলেন নতুন প্রযুক্তি ভিত্তিক জীবনযাত্রার সঙ্গে

পুরানো কায়েমী স্বার্থের রক্ষণশীল জীবনযাত্রার সংঘাতের কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে ধারণা করা যায় যে ভেবলেন-এর সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা মার্কসীয় তত্ত্বের দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত। প্রসঙ্গত, মার্ক্সের সঙ্গে ভেবলেন এর মতবাদের পার্থক্যও লক্ষণীয়। মার্ক্সের মত তিনি কখনোই মনে করতেন না যে, শ্রেণী সংগ্রামই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। তাঁর মতে, নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং পুরনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সঙ্গে তার সংঘাতই ইতিহাসকে গড়ে তোলে। মার্ক্সের বিপরীতে তিনি মনে করতেন যে সমাজ বিবর্তনের কোনও চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকে না, বরং ক্রমপুঞ্জিত ঘটনাবলীর সমাহারই বিবর্তন।

মার্ক্স-এর সিদ্ধান্ত অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁর মতবাদের মধ্যে নৈতিকতা ও আদর্শবাদের স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতবাদে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী পীড়িত ও শোষিত। তাদের প্রতি সামাজিক ন্যায় হওয়া উচিত এবং অবশ্যই হবে, হতে পারে তা সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করার মধ্য দিয়ে। এই ভাবেই শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে — সামাজিক পরিবর্তনের এটাই চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং চরম সার্থকতা বলে মার্ক্স মনে করেন। এর বিপরীতে, ভেবলেন-এর মতবাদের মধ্যে কোনও উদ্দেশ্য বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরিবর্তনের চরম কোনও স্তরেরও উল্লেখ করা হয়নি। ডারউইনের বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী ভেবলেন মনে করতেন সমাজের বিবর্তন কখনো শেষ না হওয়া এক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার কোনও শেষ স্তর নেই।

সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় ভেবলেন-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে তিনি সরাসরি প্রচলিত মতবাদের প্রয়োগ করেননি। তিনি যা বলেছেন নিজের মত করে এবং নতুন ভঙ্গিতে বলেছেন। তাঁর মতবাদ সামাজিক পরিবর্তন, ঘটনা ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করার প্রেরণা দিয়েছে। এইভাবে ভেবলেন-এর চিন্তাধারা অন্য নতুন চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে। থুচী যথার্থই বলেছেন যে ভেবলেন এক নতুন বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন। একথা সত্য যে ভেবলেন-এর চিন্তাধারায় কোথাও কোথাও পরস্পর বিরোধীতা ও দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর ভাবনায় যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভাসিত হয়েছে তা এককথায় অতুলনীয়। পেগার্ডাস-এর মতে, সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত ভেবলেনীয় চিন্তাধারা আরও নতুন নতুন চিন্তাধারার সৃষ্টি করবে। পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে ভেবলেন-এর সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য না হলেও মার্ক্সবাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলা তাঁর প্রযুক্তি নির্ধারণ তত্ত্ব আধুনিক যুগের সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

২.৭ সারাংশ

ভেবলেন ছিলেন বিবর্তনবাদী। ডারউইন এবং স্পেনসার-এর মতবাদের প্রভাব তাঁর চিন্তাভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে, তাঁর সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা মার্ক্সীয় তত্ত্বের দ্বারাও অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবিত। যদিও মার্ক্স ও ভেবলেন এর সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার মধ্যে অমিলও যথেষ্ট।

ভেবলেন সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ভূমিকার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হলো — উৎপাদন কলাকৌশল এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত

হয়। এর মাধ্যম বা প্রণালী হিসাবে তিনি মানুষের অভ্যাস ও কর্মপদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, নতুন নতুন প্রযুক্তির উৎপাদন ও ব্যবহারের ফলে নিজে থেকেই সমাজ পরিবর্তন সংঘটিত হয় না। নতুন প্রযুক্তি সমকালীন সমাজের প্রচলিত অভ্যাস, প্রথা, মনোবৃত্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। নতুন পরিস্থিতির প্রয়োজনে উৎপন্ন এই নতুন অভ্যাসের ফলে সামাজিক সংস্থাগুলিতেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

উৎপাদন কলা কৌশল পরিবর্তনের ফলে সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের চিন্তাধারা, আদর্শ, মূল্যবোধের পরিবর্তন হলেও বিত্তবান অবকাশভোগী শ্রেণীর ক্ষেত্রে সেরকম হয় না। কারণ এই শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা উৎপাদনকার্যে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকে না। তাঁরা পুরোনপন্থীই থেকে যায়। সমাজে এরা রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করে। সমাজে উৎপাদন কর্মে যুক্ত অধিকাংশ মানুষের অভ্যস্তকরণ প্রক্রিয়ার (Habituation) সঙ্গে অবকাশভোগী অলস মানুষদের রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত উৎপাদন কলা-কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অধিকাংশ মানুষের অভ্যস্তকরণ প্রক্রিয়া সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে।

একথা সত্য যে ভেবলেন-এর সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বে কোথাও কোথাও স্ববিরোধিতা এবং দুর্বলতা দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁর এ সম্পর্কিত মতবাদ বর্তমানে সর্বজন গ্রাহ্য না হলেও মার্কসবাদের সাথে মিলে মিশে চলা তাঁর প্রযুক্তি নির্ধারণ তত্ত্ব আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

২.৮ অনুশীলনী

২.৮.১ বিস্তারিত উত্তর দিন।

(ক) ভেবলেন কে অনুসরণ করে সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সমাজ পরিবর্তনে প্রযুক্তির ভূমিকাকে ভেবলেন কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন?

(গ) ভেবলেন বর্ণিত সমাজ বিবর্তনের ধাপগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(ঘ) মার্ক্স ও ভেবলেন-এর সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত তত্ত্বের মধ্যে মিল-অমিল কোথায়?

২.৮.২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

ক) 'প্রযুক্তি নির্ধারণ তত্ত্ব' বলতে কী বোঝায়?

খ) উৎপাদন কলাকৌশল এবং মানসিকবৃত্তির অভিযোজন কী?

গ) অবকাশ ভোগী শ্রেণী কী?

ঘ) ভেবলেন বর্ণিত বিবর্তনের চারটি ধাপ কী?

ঙ) প্রধানত কোন কোন মণীষীর চিন্তাধারা দ্বারা ভেবলেন প্রভাবিত হয়েছিলেন?

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) Thorstein Veblen — The Theory of Leisure class, The Viking press, New York.

২) R. M. MacIver and C. H. Page — Society — An Introductory Analysis, Macmillan, 1974.

৩) W. E. Moore — Social Change, Prentice-Hall, 1974.

৪) D. N. Jena and U. K. Mahapatra — Social Change : Themes and perspectives, Kalyani Publishers, 1993.

৫) Lewis A Coser — Masters of Sociological Thought, Rawat Publications, 1996.

একক ৩ ❑ সামাজিক পরিবর্তনের ভৌগলিক ব্যাখ্যা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ সমাজ পরিবর্তনে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব
৩.৩.১ জলবায়ু
৩.৩.২ প্রাকৃতিক সম্পদ
৩.৩.৩ ঋতুচক্র
৩.৪ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও সমাজ
৩.৫ সমাজজীবনে ভৌগোলিক প্রভাবের স্বরূপ
৩.৬ ভৌগলিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা
৩.৭ সারাংশ
৩.৮ অনুশীলনী
৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১. উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :—

- সামাজিক পরিবর্তনে ভৌগলিক ব্যাখ্যা বলতে কী বোঝায়।
- ভৌগলিক নির্ধারণবাদ কাকে বলে?
- সমাজ পরিবর্তনে ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব কতটা?
- ভৌগলিক পরিবেশ ও অবস্থানের পরিবর্তন অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তন কতটা ঘটে?
- বর্তমান যুগে ভৌগলিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা কোথায়?

৩.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক পরিবর্তন-এর সুসংহত ও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব উপস্থাপনের প্রচেষ্টা বহুকাল ধরেই চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ সম্পর্কিত অধিকাংশ তত্ত্বই নির্ধারণবাদী (deterministic) হিসাবে সমালোচিত হয়। নির্ধারণবাদ বলতে এমন এক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝায় যার সাহায্যে সমাজ সভ্যতা এবং মানব ইতিহাসের নির্দিষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ

ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা করা হয়। উদাহরণ হিসাবে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ, প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদ, ভৌগলিক নির্ধারণবাদ, প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। ভৌগলিক নির্ধারণবাদের (Geographical determinism) তত্ত্ব অনুসারে প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক পরিবেশ ও অবস্থানের প্রভাবে সমাজেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নদী, সমতলভূমি, অরণ্য, মরুভূমি, বন্যা, খরা, প্রভৃতি নানারকম প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক উপাদানের উপর নির্ভর করে বা তার প্রভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটে।

সমাজতাত্ত্বিক পিতিরিম সরোকিন (Sorokin) এর মতে কোনও নির্দিষ্ট একটি কারণের জন্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটে না। অনেক ধরনের কারণের সম্মিলনই সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়। কারণগুলি একটির সাথে অন্যটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত থাকে। এর ফলে কোনটি মুখ্য বা কোনটি গৌণ তা সহজে নির্ধারণ করা যায় না।

সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে মানব সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের সাথে সাথে ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব অনেকটাই কমে গেছে। আধুনিক মানব সভ্যতা উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমর্থ হচ্ছে। এর ফলে, ভৌগলিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার গুরুত্বও অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তবে, একথাও অস্বীকার করা যায় না যে বর্তমান প্রেক্ষাপটেও সমাজ পরিবর্তনে ভৌগলিক উপাদানের ভূমিকা খুব কম নয়।

৩.৩ সমাজ পরিবর্তনে ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব

মানব সমাজের অস্তিত্ব, জীবনযাপন পদ্ধতি এবং অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকাংশে ভৌগলিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সমাজ জীবনে ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক পরিবেশের উপাদানগুলি প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি করেছে। যেমন - জল, বায়ু, মাটি ইত্যাদি। আমরা এরই মধ্যে বসবাস করছি। আমাদের সমাজ অর্থনীতি গড়ে তুলছি। মানুষের গায়ের রং, দৈহিক গঠন, চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সমাজ-সংস্কৃতি - সব কিছুর ওপরই প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক পরিবেশ প্রভাব ফেলে। তাই দেখা যায়, নদী-নালা, উপকূল অঞ্চলের মানুষ মৎস শিকারে পারদর্শী হয়, মরুভূমির মানুষজন সাধারণত পশুপালন করে, বনাঞ্চলে কাষ্ঠশিল্প গড়ে ওঠে, সমতলের মানুষেরা চাষবাস করে এবং শিল্প বাণিজ্যে উন্নত হয়।

সমাজতাত্ত্বিক পিতিরিম সরোকিন (Sorokin)-এর মতে, ভৌগলিক পরিবেশ বলতে সেই মহাজাগতিক অবস্থা এবং ঘটনাকে নির্দেশ করে যা প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিবর্তিত হয় এবং মানুষের সৃষ্ট নয়। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা চেষ্টার তেমন কোনও ভূমিকা থাকে না। ভৌগলিক উপাদান এমনই প্রভাবশালী যে সমাজ সভ্যতার উদ্ভব, পরিবর্তন ও লয়ের ভৌগলিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা হয়েছে। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিককালের অনেক সমাজবিজ্ঞানীই তাঁদের রচনায় ভৌগলিক পরিবেশকে সমাজজীবন রূপায়নের জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। এঁদের মধ্যে মন্টেস্কু ও হানটিংটনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৩.৩.১ জলবায়ু

মানুষের সামাজিক সংগঠনের উপর ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায় চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর দেশে। এইসব দেশে মানুষের জীবনধারা জলবায়ুর ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হয়। এই কারণে মেরু অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা কর্কটক্রান্তি অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারা থেকে ভিন্ন দেখা যায়। এথনি গিডেন্স উদাহরণ হিসাবে বেশ কয়েকটি দেশের উল্লেখ করেছেন। আলাস্কা এমনই একটি দেশ। যেখানে দীর্ঘসময় শীতকাল এবং ঠান্ডা অত্যন্ত বেশি। আবার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীষ্ম বেশি। আলাস্কা এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারায় প্রচুর পার্থক্য। আলাস্কার মানুষেরা ঘরের ভেতর বেশি সময় কাটায় এবং স্বল্প সময়ের গ্রীষ্মকালের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে - পরিকল্পনা করে ঐ সময় বাইরের কী কী কাজ করবে।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে উপযোগী পরিবেশ হচ্ছে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। খাদ্যের প্রাচুর্য্য এবং বসবাসের পক্ষে আদর্শ হওয়ার কারনেই এটা ঘটে থাকে। নদী মাতৃক সভ্যতাগুলির ছিল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু। এই অঞ্চল কৃষিকাজের জন্যও ছিল উপযোগী। পৃথিবীর অধিকাংশ সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলি উর্বর কৃষিজমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। অতিশয় হিমেল জলবায়ুতে যে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব নয় তা এস্কিমোদের সমাজ দেখেই বোঝা যায়।

তবে একথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে জলবায়ু আমাদের জীবনযাত্রাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে মানুষ প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সর্বদাই সচেষ্ট। গ্রীষ্ম, শীত, বর্ষা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-এর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য সে নানাধরনের উপায় করায়ত্ব করেছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এসব ক্ষেত্রে সহজ পরিবহন, সমুদ্রপথের সুযোগ, প্রভৃতিরও সহায়ক ভূমিকা আছে। দেখা যাচ্ছে, যেসব সমাজ পাহাড়-পর্বত, গভীর অরণ্য, মরুভূমির জন্য অন্যসমাজগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন, সে সব সমাজ দীর্ঘদিন ধরে তুলনামূলকভাবে অপরিবর্তিত থেকে যায়।

অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভৌগলিক পরিবেশের সরাসরি প্রভাব তত বেশী নয়। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে বিচ্ছিন্ন এবং নির্জন অঞ্চলের অধিবাসীরাও ব্যাপক পরিমানে সম্পদ বিকাশে সমর্থ হয়েছে। আবার আলাস্কা বাসীদের উদাহরণ দেওয়া যায়। প্রকৃতি রুক্ষ হলেও তেল এবং খনিজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে তারা সমৃদ্ধ হয়েছে। অন্য দিকে শিকারী ও সংগ্রাহক সংস্কৃতির মানুষেরা অত্যন্ত উর্বর কৃষি-এলাকায় বসবাস করা সত্ত্বেও পশুপালন এবং নিম্নমানের কৃষি উৎপাদনে তাদের নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। এন্থনি গিডেন্স ভ্যানকুভার দ্বীপপুঞ্জের কোয়াকিউট ইন্ডিয়ানদের (Kwakiut Indians) উদাহরণ দিয়েছেন। ঐ অঞ্চল মাছ, ফল, ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। সেখানকার অধিবাসীরা তাদের শিকারী ও সংগ্রাহক জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকায় কখনোই কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেনি।

৩.৩.২ প্রাকৃতিক সম্পদ

সমাজ পরিবর্তন — তার উন্নতি অবনতি অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের মানবসভ্যতার ক্রম-পরিবর্তন পর্যালোচনা করলে একথাই প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি দেশের অগ্রগতির হার অনেকটাই নির্ভর করে

তার কয়লা, লোহা, তেল, প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর। এর অভাবে শিল্প ভিত্তিক সমাজ জীবন সম্ভব হতো না। মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্বে কয়লা, লোহা, খনিজ তেল, ইত্যাদি মানুষের কাজে সম্পদ হিসাবে পরিচিত হয়নি। কিন্তু, আধুনিক পৃথিবী এগুলি ছাড়া অচল। যে সব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যথেষ্ট পরিমানে মজুত থাকে সেখানকার অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এই ঐশ্বর্যের প্রভাব সুস্পষ্ট।

অন্যদিকে, পৃথিবীতে এমন অনেক দেশও দেখা যায় যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব থাকলেও দেশ দরিদ্র হয়নি। জাপানে লোহা, কয়লা, তেল-কোনও সম্পদই নেই। আবাদযোগ্য জমির পরিমানও এদেশে খুব কম। এসব সত্ত্বেও জাপান পৃথিবীর অন্যতম উন্নত শিল্পপ্রধান দেশ। এদেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানও বিশ্বের বহু দেশের তুলনায় অনেক উন্নত। ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের জীবনযাত্রার মান জাপানের সঙ্গে তুলনীয় নয়। ভারতবর্ষ জাপানের মতো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও লাভ করতে পারেনি। এসব থেকে বোঝা যায় যে শুধু প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হলেই দেশ সমৃদ্ধ হয়ে যায় না। আবার এর অভাব হলে যে দেশ দরিদ্র হবেই এমন কোনও কথা নেই। আরও অনেক শর্তের উপর একটি দেশের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। একটি দেশের উন্নতির অন্যতম ভিত্তি দেশের মানুষের 'আমরা-বোধ', সৃজনী শক্তি, জাতীয় উদ্যম ও সততা। সুতরাং, সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে দেশ ও সমাজের অগ্রগতির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য্য অন্যতম শর্ত হলেও একমাত্র শর্ত নয়। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি এই সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করতে সক্ষম।

৩.৩.৩ ঋতুচক্র

ঋতু পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে মানবসমাজে বিভিন্ন প্রথা, লোকাচার, ইত্যাদি গড়ে উঠতে দেখা যায়। ঋতু পরিবর্তন মানবজীবনকে নিঃসন্দেহে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন-সব কিছুতেই ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব সুস্পষ্ট। আমাদের এখানে ছয়টি ঋতুর সময়বিভাগ অনেকটাই স্পষ্ট। অনুকূল ঋতুর আগমনে মানুষ সুখী হয়; বিভিন্ন ঋতু উৎসব সেই আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ। ঋতুচক্রের দোলায় আবর্তিত হয়ে মানুষ প্রকৃতির সাথে একাত্ম হতে শেখে। এইসব পরিবর্তন সমাজস্থ মানুষের আচার-আচরণকে প্রভাবিত করলেও নির্ধারণ করে বলা যায় না।

৩.৪ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও সমাজ

আঞ্চলিক ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য মানব সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। পার্বত্য অঞ্চল, উপকূল অঞ্চল এবং সমতলভূমির অধিবাসীরা নিজ নিজ অঞ্চলের উপযোগী বৃত্তি গ্রহণ করে। আঞ্চলিক ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী, বৃত্তির এই পার্থক্য তাদের কলা, সাহিত্য, ধর্ম অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন ধারায় প্রতিফলিত হয়। বৃত্তি ছাড়াও বেশভূষা এবং উৎসাহ-অনুষ্ঠানেও এর প্রভাব দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা পর্বতকেই নানারূপে পূজা করে। সুন্দরবনের অধিবাসীদের মধ্যে এখনও বনবিবির পূজার প্রচলন দেখা যায়।

তবে সব পার্বত্য অঞ্চল, উপকূলবর্তী অঞ্চল বা সমতলভূমির লোকেরা একই রকম আচরণ করে না। তাদের জীবন ধারার মধ্যেও নানা পার্থক্য চোখে পড়ে।

৩.৫ সমাজ জীবনে ভৌগলিক প্রভাবের স্বরূপ

সমাজজীবনে ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ — দুই রকমই হতে পারে। বাস গৃহ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির উপর এর প্রভাব প্রত্যক্ষ কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস, ইত্যাদির ক্ষেত্রে এর প্রভাব পরোক্ষ। সমাজজীবনের কতিপয় ক্ষেত্রে ভৌগলিক প্রভাবের স্বরূপ নীচে আলোচিত হলো ঃ

১) **বাসগৃহের ধরন** ঃ বাড়ি তৈরির ধরন অনেকটাই নির্ভর করে আঞ্চলিক ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের উপর। যেমন, জাপানে প্রায়শই ভূমিকম্প হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে গৃহ নির্মাণে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ভারতবর্ষে গুজরাটেও ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বাড়ি নির্মাণে বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে। বন্যা দুর্গত অঞ্চলের বন্যার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বাড়ি তৈরি করা হচ্ছে। বরফের দেশে এস্কিমোরা বরফ দিয়েই ঘরবাড়ি তৈরি করতে পারে। যে অঞ্চলে বাড়ি তৈরির যে উপাদান সহজলভ্য সেখানে বাড়ি তৈরিতে তা বেশি করে কাজে লাগান হয়। তবে এখন ভৌগলিক প্রভাবকে প্রযুক্তিগত কৌশলের সাহায্যে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যেতে পারে।

২) **পোষাক-পরিচ্ছদ** ঃ পোষাক পরিচ্ছদও ভৌগলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে হালকা সূতীর জামা কাপড় এবং শীত প্রধান অঞ্চলে মোটা পশমী কাপড়ের ব্যবহার ভৌগলিক উপাদানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। একই দেশে শীত ও গ্রীষ্মকালেও জামা-কাপড়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

৩) **যানবাহন** ঃ যানবাহনের ধরণ মূলতঃ ভৌগলিক পরিবেশের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। নদীমাতৃক দেশে স্টিমার, লঞ্চ, নৌকা ইত্যাদি জলযানের প্রচলন বেশি দেখা যায়। তবে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাস্তা-ঘাট, সেতু নির্মাণ বিশ্বের সর্বত্র স্থলযানের প্রচলন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে বাস-মোটর গাড়ির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও দূর দেশে অল্প সময়ে যাতায়াতের জন্য উড়োজাহাজের ব্যবহারও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪) **অপরাধ** ঃ লমব্রোসো (Lombroso) কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলের অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির পেছনে ভৌগলিক কারণকে দায়ী করেন। তাঁর মতে, ফ্রান্সের সমতল অঞ্চলের চেয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতা তুলনামূলক ভাবে বেশি। আবার পাহাড়ী অঞ্চলের তুলনায় পার্বত্য অঞ্চলে এর মাত্রা আরও বেশি। কেননা, তাঁর মতে, সমতলের তুলনায় পাহাড়ী অঞ্চলে অপরাধ করে লুকিয়ে থাকা তুলনায় সহজ।

৫) **রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রশাসন** ঃ মন্তেস্কুর মতে উষ্ণ জলবায়ু স্বৈরাচারী শাসনের অনুকূল। অন্যদিকে, শীতল জলবায়ু স্বাধীনতার অনুকূল। উদাহরণ হিসাবে তিনি বলেন যে, ইউরোপের শীত প্রধান দেশে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারই প্রাধান্য দেখা যায়। অন্যদিকে, এশীয় সমাজে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থারই আধিক্য দেখা যায়। কার্ল উইটফোগল তাঁর ওরিয়েন্টাল ডেসপটোজিম (Oriental Despotism) গ্রন্থে প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের পেছনে ভৌগলিক পরিবেশকে অনেকাংশে দায়ী করেন। তবে অধিকাংশ আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী মন্তেস্কু কিংবা উইটফোগলের এই ধরনের ব্যাখ্যা মেনে নেন না।

৬) **অর্থনৈতিক কার্যকলাপ** ঃ বিভিন্ন ধরনের ভৌগলিক পরিবেশ বিভিন্ন ধরনের কৃষি-উৎপাদনের পক্ষে উপযুক্ত। মাটি এবং জলবায়ুর উপর বিভিন্ন ফসল উপাদান এবং তার পরিমান ও গুণগত মান নির্ভর করে। কোনও অঞ্চলে ধান ভাল জন্মায়, কোথাও গম, কোনও জমি পাট চাষের উপযুক্ত। বিশেষ বিশেষ ফসলের উপর নির্ভর করে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে। মানুষের খাদ্যাভাসও মূলত আঞ্চলিক প্রধান প্রধান ফসলকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। শিল্প কারখানাও ভৌগলিক উপাদানের ওপর অনেকটাই নির্ভর করে। শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সহজলভ্যতার উপর তা নির্ভর করে। অঞ্চলের অধিবাসীদের পেশা ও ব্যবসার সঙ্গে ভৌগলিক উপাদানের যোগ আছে। যেমন নদ-নদীর কাছাকাছি অঞ্চলে জেলে সম্প্রদায়কে বসবাস করতে দেখা যায়।

৩.৬ ভৌগলিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা

সমাজজীবন এবং তার পরিবর্তনে ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে কোনওরকম সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু, কোনও কিছুর প্রভাব থাকা আর নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করা এক কথা নয়। আদিম বা অনুন্নত সমাজে ভৌগলিক পরিবেশের ভূমিকা যাই থাকুক না কেন আধুনিক যুগে মানুষ অভৌগলিক কৌশলের সাহায্যে ভৌগলিক প্রভাবকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে সক্ষম হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এখন মানুষ প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সমর্থ হচ্ছে। বিজ্ঞানের কলা কৌশল ব্যবহার করে আজকের মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে সচেষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সামাজিক পরিবর্তনের ভৌগলিক নিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যা আর তেমন গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। ভৌগলিক উপাদান যেমন সামাজিক জীবন ধারাকে প্রভাবিত করে, একইভাবে জীবনধারাও ভৌগলিক উপাদানকে প্রভাবিত করতে পারে। ভৌগলিক উপাদান এবং সমাজ উভয়ের পারস্পরিক প্রভাব বিবেচনা না করলে আলোচনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়বে।

সমাজবিজ্ঞানী টয়েনবীর মতে কোনও বিশেষ সমাজে নানা ধরনের ভৌগলিক উপাদানগত প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা থেকেই সভ্যতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটে। তাঁর মতে, সভ্যতা বিকাশের প্রথম পর্যায়ে ভৌগলিক উপাদানগত চ্যালেঞ্জ অনেক কঠিন ছিল। প্রতিকূল ভৌগলিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়েই মিশরীয়, সুমেরু, মায়া, মিনোয়া, ইত্যাদি সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। তিনি অবশ্য একথাও বলেছেন যে সবসময় প্রতিকূল ভৌগলিক পরিবেশের সাথে সংগ্রামের ভিত্তিতে সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এন্থনি গিডেন্সের মতে, বিবর্তনবাদীদের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর তত্ত্ব অপেক্ষা সমাজপরিবর্তন সংক্রান্ত মার্কসীয় তত্ত্ব অনেক বেশি উজ্জ্বল। মার্কস জোর দিয়ে বলেন যে মানুষ পশুদের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। সে সবসময়ই তার চারদিকের পরিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, যা রয়েছে প্রশ্নহীন ভাবে তা মেনে নিতে চায় না।

৩.৭ সারাংশ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে সাধারণভাবে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে ভৌগলিক উপাদানগুলির সহায়ক ভূমিকা আছে। ভৌগলিক নির্ধারণবাদের তত্ত্ব অনুসারে প্রাকৃতিক এবং ভৌগলিক পরিবেশ ও অবস্থানের প্রভাবে সমাজেও পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, নদী, সমতলভূমি, অরণ্য, মরুভূমি, বন্যা, খরা, প্রভৃতি নানারকম ভৌগলিক উপাদানের প্রভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটে। এ প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক সরোকিন মনে করেন, কোনও নির্দিষ্ট একটি কারনের জন্য সামাজিক পরিবর্তন ঘটে না। অনেকগুলি কারনের সম্মিলনই সামাজিক পরিবর্তন ঘটায়। সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, মানব সমাজের প্রাথমিক পর্বে সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে ভৌগলিক উপাদান অনেক বেশি ক্রিয়াশীল ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে সমাজে এর প্রভাব অনেকটাই কমে গেছে। ভৌগলিক উপাদান আমাদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করলেও নির্ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে মানুষ সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক প্রবিন্ধকতা দূর করতে সর্বদাই সচেষ্ট এবং বহুক্ষেত্রে সাফল্য লাভও করেছে। এসবের ফলে সামাজিক পরিবর্তনে ভৌগলিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার গুরুত্ব বর্তমানে অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে।

৩.৮ অনুশীলনী

৩.৮.১ বিস্তারিত উত্তর দিন।

(ক) সামাজিক পরিবর্তনের ভৌগলিক ব্যাখ্যা বলতে কী বোঝায়?

(খ) সমাজ পরিবর্তনে ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব কতটা?

(গ) ভৌগলিক পরিবেশ ও অবস্থানের পরিবর্তন অনুযায়ী সমাজের পরিবর্তন কতটা ঘটে?

(ঘ) সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভৌগলিক প্রভাবের স্বরূপ আলোচনা করুন।

৩.৮.২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

ক) ভৌগলিক নির্ধারণবাদ কাকে বলে?

খ) সামাজিক সংগঠনের উপর জলবায়ুর প্রভাবের উদাহরণ দিন।

গ) সমাজের উন্নতি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কতটা নির্ভরশীল?

ঘ) ভৌগলিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা কোথায়?

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১) R. M. MacIver and C. H. Page — Society : An Introductory Analysis, Macmillan, 1974.

২) Anthony Giddens — Sociology.

৩) P. Sorokin — Contemporary Sociological Theories.

৪) KIngsley Davis — Human Society.

৫) D. N. Jena and U. K. Mahapatra — Social Change : Themes and perspectives.

৬) হাবিবুর রহমান — 'ভৌগলিক নিয়ন্ত্রণবাদ ও বাংলাদেশের সমাজ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন, ১৯৮৩।

একক ৪ ❑ সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়ন ঃ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ প্রস্তাবনা
৪.৩ সমাজ পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকৃতি
৪.৩.১ অবাঞ্ছিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন
৪.৩.২ অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তন
৪.৪ বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়ন
৪.৪.১ বিবর্তন
৪.৪.২ প্রগতি
৪.৪.৩ উন্নয়ন
৪.৫ উন্নয়ন ধারণা ও বিকাশ ধারণা
৪.৬ আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তন
৪.৭ শিল্পায়নের মাধ্যমে পরিবর্তন
৪.৭.১ শিল্পায়ন
৪.৮ বিশ্বায়ন
৪.৯ তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক পরিবর্তন
৪.১০ সামাজিক আন্দোলন ও পরিবর্তন
৪.১১ সমাজ পরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঃ কিছু বিতর্ক
৪.১২ সারাংশ
৪.১৩ অনুশীলনী
৪.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন :—

- সামাজিক পরিবর্তনের 'আধুনিক ব্যাখ্যা সমূহ' বলতে আমরা কী বুঝবো?
- সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকৃতিগুলি কী কী?
- আধুনিকযুগে পরিবর্তন ব্যাখ্যায় উন্নয়ন ধারণা এবং বিকাশ ধারনার মধ্যে কী পার্থক্য করা হয়?

- বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়ন বলতে কী ধারণা তৈরি হয়?
- সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজে কীভাবে কাঙ্খিত পরিবর্তন ঘটানোর প্রচেষ্টা করা হয়?
- সামাজিক পরিবর্তনের ভবিষৎ গতিধারা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পূর্বানুমান এবং বিতর্কগুলি কী?

৪.২ প্রস্তাবনা

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ইউরোপীয় সমাজের দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ব্যাখ্যা সমাজতত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। জন্মলগ্ন থেকেই সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। স্কটল্যান্ডের ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ফার্গুসন (Ferguson), মিলার (Miller) এবং রবার্টসন (Robertson), ফরাসী দার্শনিক ভলতেয়ার (Voltaire), তুর্গো (Turgot) ও কনডরসেট (Condorcet), জার্মান ঐতিহাসিক দার্শনিক হার্ডার (Herder) ও হেগেল (Hegel) ইতিহাসের সাধারণত্ত্বের আলোকে তাঁদের সমসাময়িক সমাজের ব্যাপক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টায় এইসব ঐতিহাসিক দার্শনিকদের রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উল্লিখিত দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রভাবে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সাঁ সিমো (Saint Simon), (কোঁত) (Comte), মার্কস (Marx), স্পেনসার (Spencer), ওয়েবার (Weber), দুর্খাইম (Durkheim), প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেও সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়নে ঐতিহাসিক ও বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গীটিই ছিল প্রধান।

একেবারে গোড়ার দিকে বিভিন্ন লেখকের রচনায় 'পরিবর্তন', 'বিবর্তন', 'প্রগতি' এবং 'উন্নয়ন'-প্রত্যয়গুলি প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এইসব প্রত্যয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যায় বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন প্রভৃতি প্রত্যয়সমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমানে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

সাম্প্রতিককালে সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়নে অনেকক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোনও কোনও সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন, সনাতন কৃষিভিত্তিক সমাজ, মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল সমাজ ও আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজ — এই তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক মডেলের সাহায্যে সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা উপস্থাপন করা সম্ভব। গ্রামীন ও কৃষিভিত্তিক সনাতনী সমাজ থেকে আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজে উত্তরণের মডেলটির সমস্যাও রয়েছে। এখানে আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজই উন্নয়নের চরম পর্যায় — এ রকম একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এতে ধরে নেয়া হচ্ছে যে অনগ্রসর দেশগুলির উন্নয়ন শিল্পোন্নত দেশগুলির সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখাকে অবিকল অনুসরণ করবে। এর থেকে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, সমাজতাত্ত্বিকদের মতে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য থাকে। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় বিভিন্ন সমাজের মৌলিক পার্থক্যগুলি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

সমাজ পরিবর্তনের আধুনিক ব্যাখ্যায় একথা মনে করা হয় যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনকে চিহ্নিত করতে হলে দেখতে হবে তা সময়ের ব্যবধানে বস্তুর বা অবস্থার অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে (underlying structure) কতটা

পরিবর্তন এনেছে। মানবসমাজের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন বুঝতে হলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (basic institutions) কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখতে হবে। এন্থনি গিডেন্স-এর মতে, বর্তমানে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বেও সুদূর অতীতের ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। আবার আধুনিক সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে দ্রুতগতিতে পরিবর্তিতও হচ্ছে। আধুনিক যুগের সমাজ কেন এবং কীভাবে এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, যে পরিবর্তনের প্রভাব অনেকক্ষেত্রেই বিশ্বব্যাপী — সমাজ পরিবর্তনের আধুনিক ব্যাখ্যা সমূহ এই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট।

৪.৩ সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকৃতি

সমাজ পরিবর্তনশীল। তবে পরিবর্তনের প্রকৃতি সবসময় একরকম হয় না। পরিবর্তন কখনো বাঞ্ছিত কখনো বা অবাঞ্ছিত হতে পারে। সমাজ পরিবর্তন কখনো প্রাকৃতিক বা অপরিকল্পিত, অন্যদিকে পরিকল্পিতও হতে পারে। সমাজস্থ মানুষের অবস্থান, মর্যাদা, ভূমিকা, আচার-আচরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক উপাদান বা অবস্থা সমাজে অবাঞ্ছিত ও বাঞ্ছিত, অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তনের উদ্ভব ঘটায়।

৪.৩.১ অবাঞ্ছিত ও বাঞ্ছিত পরিবর্তন

যে পরিবর্তন সমাজস্থ মানুষের মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা-প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা হলো অবাঞ্ছিত পরিবর্তন। এই ধরনের পরিবর্তন নানারকম সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়। সমাজবাসীর কাছে এই ধরনের পরিবর্তন এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে এবং তারা এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। অন্যদিকে, যে সামাজিক পরিবর্তন সমাজের মানুষের মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্খা ও চাহিদা-প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তা হলো বাঞ্ছিত বা কাঙ্খিত পরিবর্তন।

৪.৩.২ অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত পরিবর্তন

বাঞ্ছিত ও অবাঞ্ছিত পরিবর্তন ছাড়াও ফলিত সমাজতত্ত্বে অপরিকল্পিত ও পরিকল্পিত — এই দুই ধরনের সামাজিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়। অপরিকল্পিত পরিবর্তনকে অনেকে প্রাকৃতিক পরিবর্তনও (natural change) বলে থাকে। এই ধরনের পরিবর্তন অনির্দিষ্ট। এ সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। এর পূর্বনির্ধারিত কোনও লক্ষ্যও থাকে না। অপরিকল্পিত পরিবর্তনে সমাজের সুশৃঙ্খল কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই পরিবর্তন সমাজের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে অনেকসময়ই সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে ওঠে না। এর ফলে উদ্ভব ঘটে সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতার এবং আচরণগত বিচ্যুতির। অন্যদিকে, সমাজজীবনে যে পরিবর্তন সচেতন ও পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয় তাকে পরিকল্পিত পরিবর্তন বলা যায়। সুচিন্তিতভাবে সমাজের উপর সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে পরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটানো হয়। এই ধরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঞ্ছিত ফল আশা করা হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনে পুরনো থেকে নতুন কিছু আমরা আশা করি। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন বাহকদের (change-agent) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। জনগণকে সচেতন করার প্রয়াস একই সাথে চলতে থাকে। বিভিন্ন সমাজে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেও পরিকল্পিত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

৪.৪ বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়ন

সমাজতাত্ত্বিক টম বটমোর-এর মতে, একেবারে শুরুর দিকের সমাজ পরিবর্তন সংক্রান্ত তত্ত্বালোচনায় 'পরিবর্তন', 'বিবর্তন', 'প্রগতি', 'উন্নয়ন', শব্দগুলি প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হতো, কোনও কোনও ক্ষেত্রে অর্থের পার্থক্য করা হলেও তা করা হয়েছে যুক্তি শৃঙ্খলার দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত পরিভাষা হিসাবে। পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যায় বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন প্রভৃতি প্রত্যয় সমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

৪.৪.১ বিবর্তন

বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার শান্তিপূর্ণ রূপান্তরকে বোঝাবার জন্য সমাজতাত্ত্বিকরা 'বিবর্তণ' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তা আকস্মিকভাবে বর্তমান পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়ে যায়নি। বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করেই তা বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ বোঝাবার জন্য সমাজতাত্ত্বিকরা 'বিবর্তন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করে থাকেন। আর. এম. ম্যাকাইভার বিবর্তন বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনও জিনিষের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের বিকাশ বা বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এর থেকে বোঝা যায় যে বিবর্তন হলো স্বয়ংক্রিয় (Automatic), অচেতন (Unconscious) এবং অপরিকল্পিত (Unplanned) পরিবর্তন প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে একথা বলা হয় যে, প্রতিকূল পরিবেশ-এর সৃষ্টি না হলে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান সম্ভাবনার বিকাশ বা প্রকাশ ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবেই ঘটবে। সমাজ বিবর্তন প্রত্যয়টি জৈবিক বিবর্তন-এর তত্ত্বাবলী থেকে সমাজতত্ত্বে গৃহীত হয়। এই তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতত্ত্বের ওপর ইতিহাসের দর্শনের প্রভাবকে বাড়িয়ে দেয়।

৪.৪.২ প্রগতি

প্রগতি (Progress) শব্দটি বিবর্তন (Evolution) থেকে ভিন্নতর। ল্যাটিন Pro-gredio শব্দ থেকে ইংরেজী Progress শব্দটি এসেছে। ঐ মূল শব্দটির অর্থ 'সামনে চলা' (to step forward)। প্রগতি শব্দটির মৌলিক অর্থ হচ্ছে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সামনে অগ্রসর হওয়া। সেই অর্থে বাঞ্ছিত পরিবর্তনই হলো প্রগতি। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষের অধিত জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা থেকে আরেকটি বিশেষ সামাজিক অবস্থায় উত্তরণকে 'প্রগতি' বলা যায়। যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে যদি পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যায় তবে তাকে 'প্রগতি' বলা যায়। তবে 'বাঞ্ছিত' শব্দটি নিয়েও মতভেদ আছে। একজনের কাছে কোনও একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা 'বাঞ্ছিত' হতে পারে কিন্তু তা আবার অন্যের কাছে 'অবাঞ্ছিত' ও হতে পারে। এর ফলে প্রশ্ন ওঠে 'বাঞ্ছিত' কথাটির পরিমাপ কিভাবে করা যাবে?' তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে এর একটি 'নৈতিক' বা নীতিগত অর্থ রয়েছে। মানবসমাজ যখন নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে ছোটে — এর দ্বারা সেই অগ্রগতিকে বোঝাতে পারে। বিবর্তনের মাধ্যমে একটি নতুন সমাজব্যবস্থায় পৌঁছনকে কিন্তু সবসময়ে প্রগতি বলে চিহ্নিত করা যাবে না। কেননা, এ ধরনের পরিবর্তনের জন্য আগে থেকে কোনও লক্ষ্য থাকে না এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোনও পরিকল্পনাও থাকে না। বলা যেতে পারে যে সমস্ত প্রগতিই বিবর্তন কিন্তু সমস্ত বিবর্তনই প্রগতি নয়।

বটমোর-এর মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই প্রগতির ধারণা সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে অপছন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওয়েবার, ডুর্খাইম-এর মতো সমাজ তাত্ত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, সমাজতত্ত্বকে যদি একটি বিজ্ঞান হতে হয় তবে সমাজতাত্ত্বিকদের 'মূল্যবোধ নিরপেক্ষ' হতে হবে। সামাজিক ঘটনার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে কাঙ্খিত অনাকাঙ্খিত, ভাল-খারাপ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি মূল্যবোধ আরোপ করার কোনও সুযোগ নেই। তবে বটমোর-এর মতে, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে 'প্রগতি'র ধারণাটি আধুনিক সমাজচিন্তার জগত থেকে এখনও পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়নি।

৪.৪.৩ উন্নয়ন

বটমোর-এর মতে, সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া বর্ণনায় 'উন্নয়ন' শব্দটি 'বিবর্তন' এর থেকে বেশি সুনির্দিষ্ট নয়। তিনি অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধান থেকে উন্নয়ন এর এমন সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন যাতে মনে হতে পারে যে, বিবর্তণ ও উন্নয়ন-এর মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। ইংরেজী development শব্দের অর্থ উন্নয়ন। ঐ অভিধানের উন্নয়ন-এর সাধারণ অর্থ করা হয়েছে 'ক্রম-উন্মোচন' বা ক্রমবিকাশ (a gradual unfolding) - কোনও জিনিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি। বস্তুত, বিবর্তন ও উন্নয়ন এর আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে ঐ দুটি শব্দের পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না।

আমরা অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন সমাজকে 'উন্নত' বা 'অনুন্নত' বলে থাকি। এক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রত্যয়টি অবস্থা ও প্রণালী দুই-ই নির্দেশ করে। উন্নয়নমূলক সমাজতত্ত্বে (Sociology of Development) বর্তমানে প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে উন্নয়নের নির্ঘন্ট বা কোন কোন বৈশিষ্ট্য দেখে একটি দেশ বা সমাজ উন্নত না অনুন্নত তা নির্ধারণ করা হবে। তবে উন্নয়ন ধারণা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে মতভেদ রয়েছে।

৪.৫ উন্নয়ন ধারণা ও বিকাশ ধারণা

'ডেভেলপমেন্ট' শব্দটির বাংলা হিসাবে কখনো 'উন্নয়ন' আবার কখনো বা 'বিকাশ' কথাটি ব্যবহার করা হয়। এই দুটি কথার অর্থ পুরোপুরি এক নয়। 'উন্নয়ন' শব্দটির অর্থ উত্তোলন করা, টেনে তোলা, তুলে ধরা। এর মধ্যে 'পর নির্ভরতার' দ্যোতনা রয়েছে। অন্যদিকে, 'বিকাশ' শব্দটির মধ্যে স্বনির্ভরতার ছোঁয়া আছে — উন্মোচিত হওয়া, প্রস্ফুটিত হওয়া ইত্যাদি। এই কারণে বলা যায় 'উন্নয়ন' নয় 'বিকাশ' কথাটিই সুপ্রযুক্ত। ডঃ টি আদিয়া লাম্বোর মতে, আমাদের প্রথম কাজটাই হওয়া উচিত বিকাশের সামগ্রিক লক্ষ্যটাকেই নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করা, এর অর্থ শুধু পরিকাঠামোগত উন্নতি নয়, লক্ষ্য মানব সমাজের সামগ্রিক বিকাশপূর্ণ বিকশিত মানুষ। বিকাশ মূলতঃ একটি মানবিক প্রক্রিয়া। ল্যাম্বো মনে করেন, শুধুমাত্র 'বৃদ্ধির' (Growth) যে কোনও প্রক্রিয়া বা চূড়ান্ত লক্ষ্যে মানবসমাজের বিকাশের সহায়ক হয় না তা 'বিকাশ ধারনার' হাস্যকর অনুকরণ। শিল্পায়ন, আধুনিকীকরণের মত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিজে নিজেই কোনও লক্ষ্য হতে পারে না। এসবই মানবসমাজের সামগ্রিক বিকাশকে তরান্বিত করবার জন্য। সেই কারণে শিল্পায়ন আধুনিকীকরণ এবং বিকাশ সমার্থক নয়। একথা মনে করার কোনও ভিত্তি নেই যে শিল্পোন্নত সমাজই একমাত্র বিকশিত মানুষের সূতিকাগৃহ। অনেকের মতে, বাণিজ্যিক পণ্যপ্রধান ভোগবাদী সমাজ মানুষের স্বাভাবিক গুণগুলিকেই নষ্ট করে দিচ্ছে। পরিবার-এর মতো প্রাথমিক সামাজিক গোষ্ঠীর

ভিত অনেক শিল্পোন্নত সমাজে দুর্বল হয়ে পড়ছে, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতার মত মানবিক গুনগুলি সংকটের মুখোমুখি। পশ্চিমের শিল্পোন্নত সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ, পরিবার-এর ভাঙ্গন, হিংসা, কিশোর অপরাধ, একাকীত্ব, প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাগুলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও একটি দেশের জীবনযাত্রার মানকে (Quality of life) শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি দিয়ে পরিমাপ করা হতো। একটা দেশের জাতীয় আয় কিংবা মাথাপিছু আয়ের হিসাব করেই উন্নত কিংবা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তকমা লাগিয়ে দেওয়া হতো। রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন এর প্রথম দশক থেকেই আমরা একটা শিক্ষা পেয়েছি। তা হলো, একটা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামগ্রিক বিকাশ কখনোই এক নয়। আর্থিক সমৃদ্ধির সূচক কখনোই সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনমান বিকাশের একমাত্র সূচক হতে পারে না। এই কারনেই ইউ. এন. ডি। পি (ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বদলে চালু করেছে আর্থ-সামাজিক সূচক। তাতে শিক্ষা, গড় আয়ু, ক্রয়ক্ষমতা, ইত্যাদিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে, মাথা পিছু আয়ের বিচারে অনেক দেশ এগিয়ে থাকলেও জীবনমান বিকাশের নিরিখে অনেক সময়ই তাদের অবস্থান অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ নীচের দিকে। আবার অনেক সময় অন্যরকমও দেখা যায়। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা অনেক দেশ জীবনমান বিকাশের নিরিখে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ওপরে স্থান করে নিয়েছে।

ইউনিসেফ এর মতে, একটি দেশের সংখ্যালঘু বিত্তশালীদের আয় জাতীয় আয়ের গড়কে অনেকটাই প্রভাবিত করতে পারে। তার ফলে এর দ্বারা দেশের অধিকাংশ গরীব মানুষের অবস্থা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু কতিপয় বিত্তশালী একটি দেশের গড় আয়ু কিংবা শিশু মৃত্যুর হারকে খুব সামান্যই প্রভাবিত করতে পারে। তাই দেশের মানুষের জীবনমানের প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণে শিশু মৃত্যুর হার, গড় আয়ু, সাক্ষরতা, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার, পুষ্টির মান, ইত্যাদি সামাজিক সূচকগুলি (social indicators) অনেক বেশি কার্যকরী বলে মনে করা হয়।

উন্নয়ন ও বিকাশ ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রোথ মডেল ও লিবারেশন মডেল-এর তাত্ত্বিক আলোচনা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কেউ কেউ মনে করেন গ্রোথ মডেল-এ মানুষের পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। এ পথ প্রকৃত অর্থে মানব সমাজের বিকাশের লক্ষ্যে পৌঁছান যায় না। লিবারেশন মডেল-এর পথ পরনির্ভরশীলতার নয়। এই 'মুক্তির পথে' মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ হয়। আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানুষ নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হয়। যুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে পশ্চিমের শিল্পে অগ্রসর দেশগুলিতে 'গ্রোথ মডেল' কে অবলম্বন করেই জোর কদমে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। মূলধনকেই মনে করা হয় 'বিকাশের' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। মানব সম্পদ বিকাশের চাইতে মূলধন নির্ভরতাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই মডেলে মূলধনের নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে থাকে দেশ ও সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়াও নিয়ন্ত্রণ করে তারাই। এর ফলে, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে অসাম্য বেড়ে যায়। পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। সেই কারণে একে সম্পূর্ণ অর্থে বিকাশ প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করা যায় না।

টম বটমোরের মতে, মানুষ এখন তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও বেশি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ। মানববিকাশের চূড়ান্ত লক্ষ্যে সমাজকে কাঙ্খিত পথে চালিত করা এখন সহজতর। কিন্তু এর কুৎসিৎ মুখাবয়বটাই বেশি করে প্রতিভাত। মানবজাতি যেন অনিবার্যভাবেই প্রযুক্তির অগ্রগতির দ্বারা তাড়িত হচ্ছে। তা সে সৃষ্টির কিংবা ধ্বংসের প্রযুক্তি — যাই হোকনা কেন! এমার্সনের ভাষায়, বস্তুই এখন মানবজাতির ওপর সওয়ার হয়ে তাকে ছোটাচ্ছে। তা অনেকসময়ই অনভিপ্রেত — অবাঞ্ছিত লক্ষ্যের দিকে ছোটা। কিছু বিত্তশালী মানুষ সম্পদের পাহাড় তৈরির আকাঙ্খায় বিশ্বজুড়ে মানুষকে অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে সমাজের যত ক্ষতিই হোক না কেন সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই।

৪.৬ আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পরিবর্তন

কার্ল ডয়েসের মতে, আধুনিকীকরণ হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে গতানুগতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধসমূহ ছিন্ন ও লুপ্ত হয়ে পড়ে এবং মানুষ নতুন সামাজিক বিন্যাস এবং সামাজিক আচরণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়। ডেনিয়েল লার্নার-এর মতে, অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের আদলে অনুন্নত সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে আধুনিকীকরণ বলা হয়। জ্যারি ও জ্যারির মতে, আধুনিকীকরণ হলো পুরনো কৃষিভিত্তিক সমাজের শিল্পায়নের মাধ্যমে সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন।

বেশ কিছু পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন শুধুমাত্র আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। এইসব সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ (Westernization) সমার্থক। সাম্প্রতিককালে আধুনিকীকরণ বলতে 'আমেরিকানাইজেশন' কেও বোঝায়। আধুনিকীকরণের সহজ অর্থ হলো অনুন্নত দেশকে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য রূপান্তর করা। ট্যালকট পারসন্স এই ধরনের তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। যেমন অনুন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আবেগ প্রবণতা (affectivity) থেকে উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য আবেগ-নিরপেক্ষতাতে (affective neutrality) পরিবর্তন করতে হবে। বংশ পরিচয়, লিঙ্গ, বয়স, বর্ণ ইত্যাদি আরোপিত গুণের (ascription) থেকে শিক্ষা, বুদ্ধি, দক্ষতার মত উন্নতদেশের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন করতে হবে ইত্যাদি। অধ্যাপক ন্যাশ (M. Nash) এর মতে, সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশে অনুপ্রবেশ করে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমাজতাত্ত্বিকদের ধারণা হলো, অনুন্নত দেশগুলি এই কারণে অনুন্নত যে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, সংস্থা, মূল্যবোধ, প্রযুক্তি এবং পুঁজির অভাব রয়েছে। তাঁদের মতে, উন্নত দেশগুলি থেকে সাংস্কৃতিক উপাদানের অনুপ্রবেশ ছাড়া অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। ম্যাকলেল্যাণ্ড (Maclelland) এর মতে, অনুন্নত দেশের মানুষের আচরণগত পরিবর্তন করতে পারলেই কেবলমাত্র এইসব দেশগুলিকে উন্নত করা যাবে। দেশের মানুষ পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী না হওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা আবার আধুনিকীকরণের প্রশ্নটিকে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের নিজ নিজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে থাকে।

মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিভিন্ন দেশের অনুন্নয়নের সমস্যা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অনুন্নত দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করলেও অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বশ্যতা স্বীকার করছে এবং নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তাঁদের মতে, উন্নয়নের প্রচেষ্টা, সাহায্য দান এবং আধুনিকীকরণ — এই সবই শোষণ করার কায়দা মাত্র। বার্ণস্টেইন (H. Bernstein), আমিন

(S. Amin) রা যুক্তি দেখান যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অনুন্নয়নের জন্য সেইসব দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে দায়ী করা যায় না বরং বিশ্ব পুঁজিবাদের সাথে তাদের যুক্ত হওয়াই মূল কারণ। বিশ্ব পুঁজিবাদের তত্ত্বে এমন কথা বলা হয় যে উন্নতদেশগুলি অনুন্নত দেশে সনাতনী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের স্বার্থেই টিকিয়ে রাখতে চায়। সেই সব দেশের পুঁজিবাদের সমর্থনকারী এক স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাদের পক্ষে কাজ করে অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক (Andre Gunder Frank) মনে করেন, অনুন্নত দেশগুলির আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো এমন যে তাদের পক্ষে পশ্চিমী মডেল অনুসরণ করে বস্তুগতভাবে উন্নত হওয়া সম্ভব নয়। পল ব্যারণও (Paul Baran) মার্কসীয় তত্ত্বের আলোকে অর্থনীতির অনগ্রসতার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, উন্নত এবং অনুন্নত — উভয় দেশগুলিতেই অর্থনৈতিক স্থবিরতার মূল কারণ হলো পুঁজিবাদ। তবে অনুন্নত দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়ম উন্নত দেশের তুলনায় ভিন্ন।

এইভাবে আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নানা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়। এই সব ব্যাখ্যাগুলির দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য আধুনিককালের সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪.৭ শিল্পায়নের মাধ্যমে পরিবর্তন

আধুনিক সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতির উন্মেষ ও বিকাশের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো শিল্পায়ন। গিডেন্সের মতে, আধুনিক শিল্প, কারখানা যন্ত্রপাতি ও বৃহদায়তন উৎপাদন প্রক্রিয়া সমূহের বিকাশই হলো শিল্পায়ন। শিল্পায়ন কৃষি থেকে শিল্পে শ্রম স্থানান্তর করে নগরায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। ব্যাপক শিল্পায়নে সামাজিক স্তরবিন্যাসও প্রভাবিত করে। এছাড়াও তা বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তনের সূচনা করে। ধীরগতি, সীমিত প্রয়াস এবং সঙ্কীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ শিল্পায়নও সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়। শিল্পায়ন অর্থনীতিকে আরো সুসংবদ্ধ করে তোলে। শিল্পায়নের ফলে আধুনিক শহর গড়ে ওঠে যা আধুনিক সংস্কৃতি ও ক্রমবর্ধমান গনতান্ত্রিক সামাজিক জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

টম বটমোর-এর মতে, শিল্পায়িত সমাজ প্রযুক্তি নির্ভর। ঐ সব সমাজের ইতিহাস পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে সামাজিক পরিবর্তন সাধনে শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা আছে। বৃটেনে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব শুরু হয়। তা ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে জড়িয়ে পড়ে। এর তাৎক্ষণিক কিছু ফলাফল দেখা যায়। যেমন, শ্রমবিভাজন, বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন, ইত্যাদি। শিল্পায়িত এবং অশিল্পায়িত সমাজের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। শিল্পায়ন কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যেমন নগরায়নের হার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ এবং রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ। এন্থনি গিডেন্সের মতে, শিল্পসমাজকে 'আধুনিক সমাজ' হিসাবে অভিহিত করা যায়। এই সমাজ পূর্বের যে কোনও সমাজব্যবস্থা থেকে পুরোপুরি আলাদা। সনাতনী সভ্যতার সব থেকে অগ্রসর সমাজেও অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে যুক্ত ছিল। আজকের যুগে শিল্পসমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো কৃষি অপেক্ষা অনেক বেশি সংখ্যার মানুষ কলকারখানা, অফিস বা দোকানে নিযুক্ত। অধিকাংশ মানুষ শহরে নগরে বসবাস করে। এখানকার সমাজজীবন নৈর্ব্যক্তিক এবং বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। বৃহৎ সংগঠন সমূহ এবং সরকারী বেসরকারী মাধ্যমগুলি প্রত্যেকের জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। শিল্পায়নের সাথে সাথে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটার ফলে 'জাতীয় জনসমাজের' মধ্যে সংহতি দেখা যায়।

শিল্প সমাজেই প্রথম 'জাতীয় রাষ্ট্রের (nation-state) উদ্ভব ঘটে গিডেন্স বলেন, শিল্পায়নের শুরু থেকেই আধুনিক উৎপাদনপ্রক্রিয়া সামরিক ক্ষেত্রেও কাজে লাগান হয়েছে। এর ফলে, প্রাক-শিল্প সমাজের চেয়ে অনেক উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করে তা আধুনিক সমাজের যুদ্ধ ব্যবস্থাতে এবং সামরিক সংগঠনের পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। গিডেন্স-এর মতে, শিল্পায়নের সাথে সাথে গত দু'শতক ধরে উন্নত অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামরিক প্রাধান্য মিলিতভাবে পশ্চিমী সংস্কৃতির অপ্রতিহত বিস্তৃতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে।

৪.৭.১ শিল্পায়ন ও পরিবেশ

প্যাট্রিক ম্যাককুলি আধুনিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও পরিবেশের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে পরিবেশ রক্ষা করা বা নষ্ট করার সিদ্ধান্ত মূলতঃ নির্ভর করে আধিপত্যকারী শাসকশ্রেণী ও শিল্পমালিকগোষ্ঠী এবং অন্যদিকে শাসিত জনগণ-এই দুই সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর ওপর। ভোগবাদী সমাজে ভোগমূল্য ছাড়া প্রকৃতি বা মানুষ — কারও কোনও মূল্য নেই। মুনাফা কেন্দ্রিক বাজারের গতি অবাধ। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাকে সমীহ করা ভোগবাদী সমাজ ও মানসিকতার ধাতে সয় না। অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন এই ধরনের সমালোচনা করে অভিযোগ করেন যে বহুজাতিক শিল্প সংস্থাগুলি বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হয় একদিকে যেমন শ্রমের মূল্য সস্তা বলে, অন্যদিকে, পরিবেশ সংক্রান্ত আইনের কড়াকড়ি নেই বলে।

আর এক ধরনের ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হয়। এই ব্যাখ্যা অনুসারে, অধিকাংশ অনগ্রসর এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির শাসকেরা দেশের উন্নতির জন্য শিল্প-প্রযুক্তির বিস্তারকে বিকল্পহীন মনে করে। তাঁদের মতে শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নকে অস্বীকার করার অর্থ আধুনিকতা ও উন্নতিকে অস্বীকার করা। শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নের বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দেওয়াই আধুনিক উত্তর ধনতান্ত্রিক (পোস্ট ক্যাপিটালিস্ট) সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরিবেশ রক্ষার নামে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নতিতে বাধা দেওয়ার ষড়যন্ত্রে শিল্পোন্নত দেশগুলি লিপ্ত বলে কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন। তাঁদের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করেই উন্নত দেশগুলিতে শিল্পায়ন হয়েছে। এখন এই দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নতির বিনিময়ে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের এবং পাশাপাশি বিশ্ব-পরিবেশের উন্নতি ঘটাতে চায়। পরিবেশ রক্ষার অজুহাতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে শুধুমাত্র তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে পরিণত করার দারুণ সুযোগ এখন শিল্পোন্নত দেশগুলির সামনে।

পরিবেশ ও উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে উন্নয়নের সমাজতত্ত্বে (Sociology of Development) বর্তমানে 'স্থিতিশীল উন্নয়নের' (sustainable development) কথা বলা হয়। বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন কমিশন বা ব্রুটল্যান্ড কমিশনের মতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থের কোনওরকম ক্ষতি না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর জন্য গৃহীত পরিকল্পনাকে স্থিতিশীল উন্নয়ন বা সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট বলে। অর্থাৎ এই উন্নয়ন পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের ভাণ্ডারকে অটুট রেখে বর্তমান সমাজের চাহিদা মেটায়।

৪.৮ বিশ্বায়ন

এন্থনি গিডেন্সের মতে, পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে সারা বিশ্ব বর্তমানে এক অখণ্ড সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের যে কোনও দেশের ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব অন্যান্য দেশের উপরও পড়তে দেখা যায়। এখন কোনও দেশই তার নিজের দেশের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে উন্নতি বা পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে না। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকরণের প্রবণতার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্বসমাজের এই ক্রমবর্ধিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকেই বিশ্বায়ন বলা হয়। কেউ কেউ একে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বলে অভিহিত করে থাকেন। তাঁদের মতে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরনের সম্পর্ক নতুন কিছু নয়। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ করেন যে পুঁজি মুনাফার খোঁজে বিশ্বের সর্বত্র বাসা বাঁধার চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে পুঁজিবাদের বিশ্বায়নের যে প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে তাঁর চরিত্র একেবারেই অন্যরকম। সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় পাঁচটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় — (১) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক লেনদেন প্রক্রিয়ার দ্রুত বিকাশ, (২) বিশেষ করে বহুজাতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে বাণিজ্যের দ্রুত অগ্রগতি (৩) সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপকতা (৪) বিশ্বব্যাপী যাতায়াত, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি এবং সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে অভাবণীয় উন্নতি ও দ্রুততার সৃষ্টি এবং (৫) উৎপাদনের বিশ্বায়ন ও লগ্নী পুঁজির জয়যাত্রা। অন্যদিকে, বিশ্বায়ন দ্রুত নিয়ে আসছে সাংস্কৃতিক একীভবনের তরঙ্গ আর 'বিশ্বগ্রামের' (Global village) ধারণা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের সংজ্ঞায় বিশ্বায়ন হলো মালপত্র, প্রযুক্তি, শ্রম আর পুঁজির আন্তর্জাতিক সমন্বয়।

কারও কারও মতে, এমন একটা ধারণা তৈরি করা হচ্ছে যে বিশ্বায়ন অপ্রতিরোধ্য, অপরিবর্তনীয়, পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিকীকরণকে যেভাবে এক ও অভিন্ন করে দেখা হয়, বিশ্বায়নের ধারণার মধ্যেও একইভাবে পুঁজিবাদী ও পশ্চিমী সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের কথাই বলা হয়। এঁদের মতে, বিশ্বায়ন প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী বৃহৎ পুঁজির উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি ও বাজার সৃষ্টি করার হাতিয়ার।

৪.৯ তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক পরিবর্তন

টম বটমোর মনে করেন যে অধিকাংশ সাম্প্রতিক রচনায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সনাতনী সমাজ থেকে আধুনিক শিল্পসমাজকে রূপান্তর প্রক্রিয়ার উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করা হয়ে থাকে। তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীই সবচেয়ে প্রচলিত। কিন্তু, তাঁর মতে, এইসব দেশের সমাজ পরিবর্তন অধ্যয়নে এই ধারণাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেও দুই ধরনের সমাজে বহু মৌলিক পার্থক্য আছে যা নিরূপণ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কিত বিকল্প ব্যাখ্যা গুলিও বিবেচনায় রাখতে হবে। বটমোর-এর মতে কোনও একটি নির্দিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ওপর সনাতনী কাঠামোও সংস্কৃতির প্রভাব অবশ্যই থাকবে। এই কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে এশিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকা — এই চারটি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত করে নেওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত সমাজ বিপ্লব থেকে হয়েছে অথবা তা ধীর গতিতে ক্রমোন্নতির পথ ধরেছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত

আলোচনায় নির্দিষ্ট উন্নয়নশীল দেশটির সাথে এক বা একাধিক শিল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের প্রকৃতিও বিবেচনায় রাখা দরকার। কারণ এসবই সমাজ পরিবর্তনের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে। বটমোর মনে করেন যে এইসব বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়া অথবা উপেক্ষা করার উপরেই নির্ভর করে সমাজ পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যাখ্যার চরিত্র। তাঁর মতে, বিগত সময়ে তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনায় ঔপনিবেশিক অতীত, শিল্পোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব, বৈপ্লবিক অথবা অবৈপ্লবিক পন্থা — এইসব বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যার ফলে এ ধরনের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ এবং দুর্বল থেকে গেছে। বটমোর-এর অভিমত হলো যে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ উপাদানের উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। এছাড়াও সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়াও গুরুত্বপূর্ণ।

৪.১০ সামাজিক আন্দোলন ও পরিবর্তন

সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষাভিমুখী পরিবর্তন প্রয়াসের প্রকৃতি ও প্রভাব সমাজতত্ত্বের এক বিশেষ অলোচ্য বিষয়। এন্থনি গিডেন্স-এর মতে, প্রতিষ্ঠিত সমাজসংস্থা গুলির বাইরে অভিন্ন লক্ষ্যপূরণের যৌথ প্রয়াসকে সামাজিক আন্দোলন বলা যায়। কিছু সামাজিক আন্দোলন সমাজের প্রচলিত আইনী কাঠামোর মধ্য থেকেই সংগঠিত হতে পারে। আবার কিছু আন্দোলন বে-আইনীভাবে এবং গোপনে সংঘটিত হতে পারে। সামাজিক আন্দোলনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে আইনের পরিবর্তন ঘটতেও দেখা যায়। সামাজিক আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হলে ক্রমে তার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। সেইসব ক্ষেত্রে সামাজিক আন্দোলন ও বিধিবদ্ধ সংগঠনের মধ্যে বিভাজন রেখা প্রায়শই অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে স্যালভেশন আর্মি (Salvation Army) এর কথা বলা যায়। সামাজিক অন্দোলন হিসাবে এর সূত্রপাত হলেও এখন তা স্থায়ী সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অন্যদিকে আবার কিছু সংগঠন সামাজিক আন্দোলনেও রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। যেমন, যখন কোনও রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তখন তা গোপনে কাজকর্ম চালাতে বাধ্য হয় এবং ধীরে ধীরে গেরিলা আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে থাকে। সামাজিক আন্দোলনের প্রকারভেদ দেখা যায়। ডেভিড এবেরলে (David Averle) চার ধরনের সামাজিক আন্দোলনের কথা বলেছেন — আমূল সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বৈপ্লবিক আন্দোলন সমূহ এবং কিছু কিছু ধর্মীয় আন্দোলনকে রূপান্তরমূলক আন্দোলন (Transformative Movements) বলেছেন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য বা অসাম্যের প্রতিকার চেয়ে প্রচলিত সামাজিক বিধি ব্যবহার পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন সমূহকে সংস্কারমূলক আন্দোলন (Reformative Movements) বলে অভিহিত করা হয়। অন্য দু'প্রকার আন্দোলন মূলত মানুষের অভ্যাস ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত — পুনরুদ্ধারমূলক আন্দোলন (Redemptive Movements) এবং পরিবর্তনসাধক আন্দোলন (Alterative Movements)।

এমন অনেক সমাজতাত্ত্বিক আছেন যাঁরা সমাজ প্রগতিকে কেবল যে সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট বলেই মনে করেন তা নয় বরং নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী পরিকল্পনা এবং অন্যদিকে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তা অর্জনযোগ্য বলে মনে করেন। লেষ্টার এফ. ওয়ার্ড (Lester F. Ward) এর মতে, প্রাকৃতিক বা জৈবিক বিবর্তন হচ্ছে মন্থর এবং

অনিশ্চিত প্রক্রিয়া। অপরপক্ষে, যুক্তিভিত্তিক পরিকল্পনা এবং সচেতন সামাজিক আন্দোলন বাঞ্ছিত সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

৪.১১ সমাজপরিবর্তন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঃ কিছু বিতর্ক

এখনকার সামাজিক পরিবর্তনের গতিমুখ কোন দিকে? একুশ শতকের সমাজজীবনে তার প্রভাব কেমন হবে? এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। সব প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা একমত নন। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তরগুলি অনুমান নির্ভর। কারও কারও মতে, এখানকার নতুন সমাজ আর মূলতঃ শিল্পায়নের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে নেই। যে যুগে প্রবেশ করা হয়েছে তা পুরোপুরি শিল্পযুগের বৈশিষ্ট্যগুলির বাইরে। এই নতুন সমাজ বিন্যাস নানা নামে বর্ণিত হয়েছে — তথ্য সমাজ, পরিষেবা সমাজ, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ইত্যাদি। তবে, সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শিল্পোত্তর সমাজ (Post Industrial Society)। এর অর্থ হলো যে, আমরা সাবেকী শিল্প বিকাশ ধারার বাইরে এগিয়ে চলেছি। 'শিল্পোত্তর সমাজ' পরিভাষাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ডানিয়েল বেল (Daniel Bell)। মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক ডানিয়েল বেল তাঁর 'দ্য কামিং অব দ্য পোস্ট ইনডাসট্রিয়াল সোসাইটি' গ্রন্থে শিল্পোত্তর সমাজের বিশদ ধারণা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই সমাজে পরিষেবা পেশা উৎপাদন শ্রমিকের স্থান দখল করবে। পেশাদার ও প্রযুক্তিবিদদের সংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবে। এন্থনি গিডেন্সের মতে, শিল্পোত্তর সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্ব সামাজিক পরিবর্তনে অর্থনৈতিক উপাদানের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। বলা হয় যে এই ধরনের সমাজ অর্থনৈতিক বিকাশের ফলশ্রুতি এবং অর্থনীতিই অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন ঘটাবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শক্তির সাথে সাথে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক শক্তিও সমাজ পরিবর্তনের পেছনে ক্রিয়াশীল বলে সমালোচকরা মনে করেন। তাঁরা একথাও মনে করেন যে শিল্পোত্তর সমাজই সব থেকে শ্রেষ্ঠ তা আদৌ প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি।

অনেকে আবার বলেন যে, সমাজ 'আধুনিকতার' চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ আধুনিকোত্তর (Postmodernity) যুগের আগমন ঘটেছে। তাঁদের মতে উন্নতি যেভাবে দ্রুত হারে ঘটে চলেছে তা শিল্পবাদ অবসানের ইঙ্গিত দেয়। আধুনিকোত্তর যুগের ধারনার সমর্থকদের মতে, এখন আর প্রগতির কোনও সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই সুতরাং সামগ্রিক ইতিহাস বর্ণনা দান এখন আর কোনও অর্থ বহন করে না। আধুনিকোত্তর বিশ্ব হলো বহুত্ববাদি ও বৈচিত্র্যময়। এঁদের মতে, আধুনিকোত্তর সমাজের সাথে সাথে ইতিহাসের অবসান ঘটেছে কারণ যে বহুত্ববাদি বিশ্বর আগমন ঘটছে তা আর কোনও সাধারণ অর্থে বর্ণনা করা যাবে না। ফ্রান্সিস ফুকোয়ামা (Francis Fukuyama) এর মতে, বিকল্পের অবসানই হলো ইতিহাসের অবসান (end of history)। তবে সমালোচকদের মতে, ইতিহাসের অবসান ঘটেছে কারণ আমাদের কাছে সমস্ত বিকল্প শেষ হয়ে গেছে — এই ধরনের বক্তব্যের তেমন কোনও ভিত্তি নেই। ভবিষ্যতে নতুন কি ধরনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলা বিকাশ লাভ করবে তা শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে বলা যায় না। এন্থনি গিডেন্সের মতে, এই মূহূর্তে আমরা পূর্বানুমান করতে পারি না ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটবে।

৪.১২ সারাংশ

সাম্প্রতিক কালে সামাজিক পরিবর্তন অধ্যয়নে অনেকক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কারও কারও মতে, সনাতন কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে 'আধুনিক' শিল্পোন্নত সমাজে উত্তরণের মডেলটির সাহায্যে সমাজ পরিবর্তনের রূপরেখা উপস্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু, এক্ষেত্রে সমস্যাও রয়েছে। 'আধুনিক' শিল্পোন্নত সমাজই উন্নয়নের চরম পর্যায় — এখানে এমন একটা ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে অনগ্রসর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উন্নয়ন শিল্পোন্নত দেশগুলির সমাজ পরিবর্তনের রূপারেখাকে অবিকল অনুকরণ করবে। কিন্তু এর থেকে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সামাজিক পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় বিভিন্ন সমাজের মৌলিক পার্থক্যগুলি অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। শিল্পায়ন, আধুনিকীকরণের মতো পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিজে নিজেই কোনও লক্ষ্য হতে পারে না। এসবই মানব সমাজের সামগ্রিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবার জন্য। রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত উন্নয়নের প্রথম দশক থেকে এই শিক্ষা পাওয়া গেছে যে একটা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মানবসমাজের সামগ্রিক বিকাশ এক কথা নয়। বেশ কিছু পশ্চিমী সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন যে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন শুধুমাত্র আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই সম্ভব। এঁদের কাছে আধুনিকীকরণ ও পাশ্চাত্যকরণ সমার্থক। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থকরা আবার আধুনিকীকরণের প্রশ্নটিকে উন্নত এবং অনুন্নত সমাজের নিজ নিজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে থাকেন। মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন বিভিন্ন দেশের অনুন্নয়নের সমস্যা বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অনুন্নয়নের জন্য সেই সব দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে দায়ী করা যায় না বরং শিল্প পুঁজিবাদের সাথে তাদের যুক্ত হয়ে পড়াটাই মূল কারণ। অন্য আর এক ব্যাখ্যা অনুসারে, অধিকাংশ অনগ্রসর এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির শাসকেরা উন্নতির লক্ষ্যে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শিল্প-প্রযুক্তির বিকাশকে বিকল্পহীন মনে করে। তাঁদের মতে, শিল্পায়ন ও বিশ্বায়নকে অস্বীকার করার অর্থ আধুনিকতা ও উন্নতিকে অস্বীকার করা। এখন কোনও দেশই তার নিজের দেশের চৌহদ্দির মধ্যে আটকে থেকে উন্নতি বা পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারে না। বিশ্বায়নের সমর্থকদের মতে, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকরণের প্রবণতার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাগ্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। বিশ্বসমাজের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। সমালোচকরা একে পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বলে অভিহিত করেন। এঁদের মতে, বিশ্বায়ন আসলে পশ্চিমী বৃহৎ পুঁজির উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি ও বাজার সৃষ্টি করার হাতিয়ার।

আধুনিকীকরণ, শিল্পায়ন, বিশ্বায়ন, সামাজিক আন্দোলন ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার নানা আধুনিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়। এইসব ব্যাখ্যাগুলির দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য আধুনিককালের সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৪.১৩ অনুশীলনী

৪.১৩.১ বিস্তারিত উত্তর দিন।

(ক) সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রকৃতি গুলি কী?

(খ) আধুনিকযুগে পরিবর্তন ব্যাখ্যায় উন্নয়ন ধারণা এবং বিকাশ ধারনার মধ্যে পার্থক্য কী?

(গ) আধুনিকীকরণ ও শিল্পায়নের মাধ্যমে কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা হয়?

(ঘ) সামাজিক পরিবর্তনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলতে আমরা কী বুঝবো?

৪.১৩.২. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

ক) বিবর্তন বলতে কী বোঝায়?

খ) প্রগতি কাকে বলে?

গ) উন্নয়ন কাকে বলে?

ঘ) বিশ্বায়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

ঙ) সামাজিক আন্দোলন কাকে বলে?

চ) স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?

৪.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) Tom Bottomore — Sociology

২) Anthony Giddens — Sociology.

৩) W. E. Moore — Social Change.

৪) Kingsley Davis — Human Society.

৫) Jena and Mohapatra — Social Change.

৬) Guy Rocher — A General Introduction to Sociology.

একক ১ ❑ জনবিজ্ঞান-প্রকৃতি ও বিস্তার

গঠন

১ : ০ উদ্দেশ্য
১ : ১ প্রস্তাবনা
১ : ২ জনবিজ্ঞান—প্রকৃতি ও বিস্তার
১ : ২ : ১ সমাজ ও রাষ্ট্র
১ : ২ : ২ সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব
১ : ৩ সামাজিক জনবিজ্ঞান
১ : ৩ : ১ জনবিজ্ঞান এবং জনসংখ্যা সমীক্ষা
১ : ৩ : ২ জনবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি
১ : ৩ : ৩ দেশ ও জাতির ওপর জনসংখ্যা ঘনত্বের প্রভাব
১ : ৪ জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্দ্ধারনের সহায়ক সমূহ
১ : ৫ জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ
১ : ৫ : ১ জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ
১ : ৬ জন্মহার ও মৃত্যুহারে সামাজিক প্রভাব
১ : ৬ : ১ বর্দ্ধিত জনসংখ্যা ও মানবসমাজ
১ : ৭ জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান
১ : ৮ জনসংখ্যা ও সামাজিক বিন্যাস
১ : ৮ : ১ জন্মনিয়ন্ত্রণ
১ : ৮ : ২ জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ
১ : ৯ জনবিজ্ঞান ও মানবসমাজ
১ : ১০ বৃহৎ জনবিজ্ঞান ও অণুজনবিজ্ঞান
১ : ১১ সামাজিক জনবিজ্ঞান
১ : ১২ সারাংশ
১ : ১৩ অনুশীলনী
১ : ১৪ উত্তর সংকেত
১ : ১৫ গ্রন্থপঞ্জী

একক ১ ❑ জনবিজ্ঞান-প্রকৃতি ও বিস্তার

১.০ উদ্দেশ্য

মানুষ নিয়েই সমাজ এবং এই সমাজে কতধরনের মানুষ যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যে কোন একটি সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা কত বিচিত্র লক্ষণাবলী বিশিষ্ট মানুষের সন্ধান পাই। এদের মধ্যে শিক্ষা, পেশা, ধর্ম, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদিতে পার্থক্য রয়েছে। কোন সামাজিক গোষ্ঠীকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। সেই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের উন্নয়ণ প্রয়োজন। যে কোন ধরনের উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক উন্নয়ন প্রকল্প এবং এই কাজটিকে সম্পন্ন করতে হলে সামাজিক মানুষের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি আলোক সম্পাত করতে হবে। সর্বাগ্রেই জানতে হবে সামগ্রিকভাবে জনগণের প্রকৃতি অর্থাৎ জনবিন্যাস। কোন দেশে জনসংখ্যা খুব বেশি — আবার কোথাও খুব কম। এই কম-বেশি হওয়ার কারণ কী? আদর্শ জনসংখ্যাই বা কাকে বলে? জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিতে সমাজে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে? এই সকল প্রশ্নের উত্তরদানের উদ্দেশ্যেই এই এককটি রচিত হয়েছে। জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে দুটি প্রধান বিষয় — জন্মহার এবং মৃত্যুহার। লক্ষ্য রাখতে হবে যে জন্ম ও মৃত্যু মানুষের জীবনে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এই দুটিই জৈবিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ীই এই দুটি ঘটনার উপস্থাপন হয়। জীবজগতে এই বিষয়টিরই নিয়ন্ত্রক হল প্রকৃতি। কিন্তু জীবজগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ তার নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রকৃতির এই নিয়মটিকে বহুলাংশে আপন আয়ত্তাধীনে এনেছে। এর ফলেই মানব জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। সেই সকল পরিবর্তনধারা জনবিন্যাসের পশ্টাৎপটটিকে প্রভাবিত করেছে। এই সকল বিষয়গুলিকে প্রকৃতভাবে জানার জন্য জনসংখ্যার বিভিন্ন দিকের আলোচনা প্রয়োজন। এই অধ্যয়ন ধারাটির নাম জনবিজ্ঞান বা ডেমোগ্রাফি। মানব সমাজের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস ও সংস্কার কিভাবে এই জনসংখ্যাকে পরিচালিত করেছে সে সম্পর্কে জানতে হবে সমাজ ধারার পশ্টাৎপটে জনসংখ্যার প্রকৃতির বিচার করতে হবে। তখনই আমরা তাকে বলি সামাজিক জনবিজ্ঞান। এই ঘটনা প্রবাহের উপর অলোক সম্পাতের উদ্দেশ্যেই এই প্রথম এককটি রূপায়িত হয়েছে।

১.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে জনসংখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। সারা পৃথিবীর সকল দেশেই জনগণনা আবশ্যিকভাবে সংঘটিত হয়। কারণ রাষ্ট্রকে সকল সময়েই মানব সমাজের বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। এই কাজটি সম্পাদনার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র জনবিন্যাসকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে জনগণনার ব্যবস্থা করে। এখানে অর্থাৎ এই এককের মধ্যে জনগণনার প্রয়োজনীয়তা, জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ, জনসংখ্যার ঘনত্বের জন্য কি কি ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন সেই বিষয় সমূহ উদাহরণসহ উল্লেখিত হয়েছে। মানুষের জীবনযাত্রার মান কি কারণে উর্ধ্বগামী অথবা নিম্নগামী হয় তার বিশ্লেষণও এখানে করা হয়েছে। জন্মহার বৃদ্ধি-জনসংখ্যার উর্ধ্বগামীতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। কিভাবে কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণে

মানুষ বাধ্য হয়েছে। এই বিষয়টি প্রয়োজনীয় হলেও বিভিন্ন সংস্কারাবদ্ধ চেতনা একে প্রতিহত করেছে এবং আজও করে চলেছে। জনগোষ্ঠীর ক্রমিক আয়তন বৃদ্ধি সাধারণ জীবনযাত্রাকে কিভাবে ব্যাহত করছে সেই সব বিষয় এখানে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে। জনসংখ্যা কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রণের জন্য আজ সারা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থাই জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। তবে পশ্চাদবর্তী দেশগুলির এই এগিয়ে চলার পথে রয়েছে নানা বাধা-বিপত্তি। সেই সকল বিষয় এখানে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

১.২ জনবিজ্ঞান ঃ প্রকৃতি এবং বিস্তার

আমাদের এই পৃথিবীজুড়ে অসংখ্য মানুষের বসবাস। পৃথিবীর যে বহু বিস্তৃত পরিধি তার মধ্যে মোটামুটিভাবে তিনভাগ জল আর একভাগ স্থল। এই স্থলভাগেই গড়ে উঠেছে নানা দেশ। এখানেই বসবাস করে কত ধরনের যে মানুষ তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীরাও বসবাস করে। তবে মানুষ সম্পূর্ণভাবে সমাজে বসবাস করে থাকে। পৃথিবীর সকল অংশে মানুষের বসতি একরূপ নয় — কোথাও বেশি কোথাও কম। এই কারণে বলা হয় কোন দেশ জনবহুল আবার কোন দেশ জনবিরল। কোন স্থানের মানুষের হ্রাস বা বৃদ্ধি নানা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যে দেশে জীবনধারণ এবং জীবন পরিচালনার জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি বিশেষভাবে অনুকূল সেই দেশে মানব বসতি বিশেষভাবে গড়ে ওঠে। এই পরিবেশ পরিস্থিতি প্রাকৃতিক এবং সামাজিক দুই'ই হতে পারে।

প্রাচীনকালে মানুষ ইচ্ছামত বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। যেখানেই জীবনধারনের উপযোগী পরিবেশ এবং সুবিধা-সুযোগের সম্মুখীন হয়েছে সেখানেই বসতিস্থাপন করেছে। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল মানুষের সেই আদিম জীবনধারা পরিবর্তিত হতে থাকল। দেশ এবং জাতির ধারনার সৃষ্টি হল বিভিন্ন দেশ তাদের নিজস্ব সীমারেখাকে কেবল চিহ্নিতই করল না একদেশ থেকে অন্যদেশে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রিত হল। কালক্রমে এক একটি ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে এক একটি জাতির সৃষ্টি হল। আবার দেখা গেল যে একই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে একাধিক জাতগোষ্ঠী নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। এমনভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে।

১.২.১ সমাজ ও রাষ্ট্র

রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে একটি মানব ভিত্তিক সংস্থা। মানুষের একত্রে বসবাসের জন্য এবং তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের সূচনা। একথা মনে রাখতে হবে যে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এবং গুণমান উভয়েরই উপর রাষ্ট্রের কার্যকারিতা নির্ভরশীল। সুতরাং এই দুটি বিষয়েরই উপর রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে মানব সমাজের বিকাশ ঘটেছে এবং রাষ্ট্র নানাভাবে সেই সামাজিক মানুষের কর্মধারা ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু তাহলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রাষ্ট্রের উন্মেষের বহুপূর্বে সমাজের আবির্ভাব ঘটেছিল। আদিম সমাজ সুসংগঠিত ছিল না। রাষ্ট্র একটি বিশেষভাবে সংগঠিত সংস্থা। সমাজধারা যেখানে আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক বিধি-নিষেধ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচালিত হয় রাষ্ট্র সেখানে

আইন কানুনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। রাষ্ট্রের কাজকর্ম সকলসময়েই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু সমাজের কাজকর্ম বিশেষ সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নাও থাকতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক না কেন প্রাচীন সমাজব্যবস্থার মধ্যেই রাষ্ট্র গড়ে উঠল এবং সেই রাষ্ট্র মানব সমাজের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করল।

১.২.২ সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব

রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনে তার মধ্যস্থিত মানবগোষ্ঠীর পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ণ করবে। এই মূল্যায়ণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হল তার অধীনস্থ সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সংখ্যা নির্ণয় করা এবং তার সঙ্গে তাদের জীবনধারার মূল বিষয়গুলির পর্যালোচনা। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে কত সংখ্যক মানুষ বসবাস করছে এবং তার মধ্যে মহিলা-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুর সংখ্যা কত না জানলে রাষ্ট্র পরিচালনা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক, আর্থিক এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পরিমণ্ডলের চিত্র পরিস্ফুট করে তোলা প্রয়োজন হয়ে উঠে। অন্যথায় রাষ্ট্র তার জনস্বার্থ রক্ষার প্রাথমিক কাজটিই করে উঠতে পারবে না। কাজেই রাষ্ট্র মধ্যস্থিত মানুষদের সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ অপরিহার্য হয়ে উঠে।

১.৩ সামাজিক জনবিজ্ঞান

জনগোষ্ঠীর বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য আহরণ বিভিন্ন সময়ে এবং নানা প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। তবে কোন ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা, তাদের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি এবং তার মূলগত কারণ সমূহের বিচার এবং বিশ্লেষণ যখন প্রত্যক্ষ সমীক্ষার মাধ্যমে এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োজনের মাধ্যমে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তখনই তাকে বলা হয় জনবিজ্ঞান বা ডেমোগ্রাফি (Demography)। এই জনবিজ্ঞান যেমন সমাজবিজ্ঞানের একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় ঠিক তেমনি বিভিন্ন জীব বিজ্ঞানের শাখায় এমনকি অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনসংখ্যার উপর তথ্য সংগৃহিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া রয়েছে ইতিহাসভিত্তিক জনসংখ্যা বিষয়ক আলোচনা। ইতিহাসের আলোচনা বিভিন্ন কাল ভিত্তিক এবং ঘটনা ভিত্তিক। নানা সমাজ এই ঘটনারাজি কোন বিশেষ দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত মানবগোষ্ঠীর জীবনে কি কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তার জন্য জনসংখ্যার প্রকৃতি কিরূপ ঘটেছিল এসব বিষয় ইতিহাসের পঠন-পাঠনের মধ্যেই পড়ে। তবে সমাজবিজ্ঞানেই জনসংখ্যা বিষয়ে আলোচনা অতীব জরুরী এবং এই বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখা ও উপশাখার সঙ্গে জনবিজ্ঞান বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কারণ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষ বনে জঙ্গলে থাকুক বা শহরের পরিবেশে আকাশ চুম্বী অট্টালিকাতেই থাকুক প্রত্যেকেরই জীবন সমাজের বিভিন্ন ধ্যান ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সংস্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। জন্ম, মৃত্যু এবং সংখ্যাবৃদ্ধি বা হ্রাস এগুলি জৈবিক বিষয় একথা অনস্বীকার্য তবে এগুলি সামাজিক রীতি-পদ্ধতি দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে এই বিষয়গুলিও অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, সংখ্যা সমাজধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে। যে জনবিজ্ঞান

মানব সমাজের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি এবং নানা ধরনের সামাজিত ধ্যান ধারনাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাকেই বলা হয় সামাজিক জনবিজ্ঞান (Social Demography)।

১.৩.১ জনবিজ্ঞান এবং জনসংখ্যা সমীক্ষা

সমাজের সঙ্গে জনসংখ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানবগোষ্ঠীর বিজ্ঞান সম্মত সমীক্ষা সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত যে কোন বিষয় আলোচনায় বিশেষভাবে কার্যকরী। এই সমীক্ষার মধ্যেই মানবগোষ্ঠীর সংখ্যা, গঠন এবং বিকাশ প্রতিফলিত হয় এবং সেই প্রতিফলন সমাজ বিজ্ঞানের বহু কঠিন আলোচনাকে বোধগম্য করে তোলে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে সমাজবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে জনবিজ্ঞান আলোচনার মূলতঃ চারটি বিশিষ্ট পর্যায় বিদ্যমান — যেমন, ১. কোন একটি বা একাধিক ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারী অধিবাসীদের সংখ্যা নির্ণয় করা, ২. এই জনসংখ্যার তুলনামূলক হ্রাস-বৃদ্ধি স্থিরীকরণ পূর্ব সমীক্ষাধারার সঙ্গে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই করণীয়, ৩. জনসংখ্যার বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের মূলগত কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়, এবং ৪. সমস্ত বিষয়গুলির বিশ্লেষণ কার্যের মাধ্যমে বর্তমান জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারণ।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে জনবিজ্ঞান হল কোন জনসংখ্যার মধ্যে আরও মানুষের সংযুক্তি এবং আরও মানুষের বিযুক্তি; এরই উপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস একটি প্রাথমিক সূত্র নিরূপণ করেছেন। ঘটনাটিকে খুব সহজভাবেই মনে রাখা যেতে পারে। এটি হল নিম্নরূপ ঃ

$$P_2=P_1+(B-D) + (IM-OM)$$

এখানে P_2 হল কোন এক বিশেষ সময়ের জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা; P_1 এর অর্থ কিছুদিন পূর্বেকার ঐ একই গোষ্ঠীর জনসংখ্যা; B বলতে ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার এবং D হল ঐ জনগোষ্ঠীর মৃত্যুহার; IM বলতে বোঝায় প্রব্রজনের মাধ্যমে ঐ জনগোষ্ঠীতে সংখ্যাবৃদ্ধি এবং OM হল অভিবাসনের ফলে উক্ত জনগোষ্ঠীতে সংখ্যা হ্রাস। অতএব এবিষয়টি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে মানব গোষ্ঠীর জনসংখ্যার বিচার করতে হলে জন্ম, মৃত্যু এবং প্রব্রজন, অভিবাসনের বিষয় সমূহ সঠিকভাবে উদ্ঘাটন করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি আমরা পরবর্তী পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১.৩.২ জনবিজ্ঞানের প্রকৃতি ও পরিধি

এখন জনবিজ্ঞান বা ডেমোগ্রাফির প্রকৃতি ও পরিধি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। জনগোষ্ঠী এবং জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলেই আমরা লক্ষ্য করব যে বর্তমান জনগোষ্ঠী জাতি এবং রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ন্ত্রিত। অনেক শক্তিশালী দেশে বিরাট জনগোষ্ঠী রয়েছে — আবার কোন কোন আধিপত্যশীল দেশে জনসংখ্যা বেশ কম। এর অর্থ হল যে জনসংখ্যা কোন দেশকে মহান করে তোলে না। এর সঙ্গে দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তিতে উন্নত হতে হবে। তবে এই সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য অবশ্যই জনবল থাকা দরকার। তবে সেই জনসংখ্যা যেন সীমা ছাড়িয়ে চলে না যায়।

এই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে জাতীয়তাবাদ মানুষের এক দেশ থেকে অপর দেশে গমনাগমনের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কোন কোন রাষ্ট্র তার মধ্যস্থিত জনগণকে দেশের মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখতে চায়। আবার কোন দেশ জনগণের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত নিষিদ্ধ না করলেও এতে যথেষ্ট বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। মূলতঃ বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রতুলতা হেতু এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়ে থাকে। আবার কোন দেশ তার জনগণের বুদ্ধিমত্তাকে বাইরে চালান করতে চায় না। কখনও বা স্বাদেশিকতা রূপী মনোভাবও এবিষয়ে কার্যকর। এমনি নানা কারণের জন্য দেশ-বিদেশে গমনাগমণকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহের মধ্যে অবাধ যাতায়াতের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা প্রয়োজন। কোন একটি দেশ তার বিভিন্ন সুবিধা সুযোগ এবং ক্ষমতা থাকলেও অপর দেশের মানুষের প্রব্রজনকে সমর্থন করে না। আন্তর্জাতিক বিদ্বেষ এবং জাতিগত দ্বন্দ্ব বর্তমানে প্রকট আকার ধারণ করেছে। এমতাবস্থায় সব দেশই অবাধ প্রব্রজনের বিরোধী।

১.৩.৩ দেশ ও জাতির ওপর জনসংখ্যা ঘনত্বের প্রভাব

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব কিন্তু কখনই একরূপ নয়। উদাহরণের স্বরূপ বলা যেতে পারে যে তুলনামূলকভাবে ঘন লোকসংখ্যা বিশিষ্ট দেশ হল দক্ষিণ চিন, ভারত, ইউরোপ এবং পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র। অপরদিকে সাইবেরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিমযুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেরু অঞ্চলে জনবসতি কম। পৃথিবীর জনসংখ্যার হার অত্যন্ত তীব্র গতিতে বেড়ে চলেছে — কোন কোন দেশে জনসংখ্যার মাত্রাধিক্য ঘটেছে। একটি ভূখণ্ডের সীমিত এলাকার মধ্যে এবং সপ্রতিবদ্ধ অর্থব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার চাপ বেশি হলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই দেশের পক্ষে জনহিতকর প্রকল্প প্রণয়ন কষ্টদায়ক হয়ে উঠে। কেবল তাই-ই নয় সাধারণ মানুষের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মেটানো সম্ভব হয় না। কাজেই এই রকম একটি পরিস্থিতি দেশ এবং জাতির পক্ষে অমঙ্গলজনক।

সামাজিক জনবিজ্ঞানের আলোচনায় মানব সমাজে কি কি কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিদান প্রয়োজন। কোন একটি ভূখণ্ডে জনসংখ্যার পরিমান কম-বেশি হওয়ার জন্য কতকগুলি বাস্তব কারণ রয়েছে। আমরা যদি পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতা সমূহের বিকাশ ধারা এবং তাদের কার্য-কারণ বিষয়ে আলোকপাত করতে সচেষ্ট হই তাহলে তাহলে দেখা যাবে যে জীবন পরিচালনার জন্য কতকগুলি অনুকূল পরিস্থিতি এখানে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে কোন সভ্যতার অনুকূল পরিবেশের সাহচর্যে উন্মেষ হলেও কালের প্রবাহে বিভিন্ন কারণের জন্য সেই অনুকূলতা অন্তর্হিত হওয়ার ফলে সুবিকশিত সভ্যতার ধ্বংস হয়েছে।

১.৪ জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ধারণের সহায়ক সমূহ

এখন আমরা জনসংখ্যার ঘনত্ব কি কি বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল সে বিষয়গুলিই তুলে ধরব। সর্বপ্রথমেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কেন পৃথিবীর কোন কোন অংশ জনাকীর্ণ এবং কোন কোন এলাকা জনহীন। জনবিন্যাসের এই অসমতার জন্য ভৌগোলিক পরিস্থিতিই মূলতঃ দায়ী। মানুষ পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতার উপরই নির্ভরশীল। কেবলমাত্র মৃত্তিকার উর্বরতার উপরই নয় — তাকে খনিজ সম্পদের প্রাপ্যতার উপরও নির্ভর করতে হয়। এই উভয়বিধ বিষয়টিই তাকে কেবল বেঁচে থাকার সুযোগদানই করে না — তার বাঁচার মধ্যে একটা মাত্রা এনে দেয়। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিই জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারণে বিশেষভাবে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

(ক) **জলবায়ু ঃ** মানব জনসংখ্যার সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জলবায়ুর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের সুষ্ঠ জীবনযাত্রার জন্য বিশেষ তাপমাত্রা এবং জলীয়বাষ্প বিশিষ্ট আবহাওয়ার প্রয়োজন। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতা জনসংখ্যার আকারকে নির্ধারণ করে। উচ্চ উষ্ণতা এবং অধিক আর্দ্রতা জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। যখন কোন জনগোষ্ঠী গ্রীষ্মমণ্ডলে প্রব্রজিত হয় তখন তাদের সামগ্রিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আধা গ্রীষ্মমণ্ডল যদি মানব বিকাশের শৈশবাবস্থা হয় তাহলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলকে মানব সভ্যতার আদিভূমি বলেই অভিহিত করা যেতে পারে।

যে সকল অঞ্চলে বিশেষভাবে কম সেখানে জনসংখ্যার বিস্তার হবে না। মরুময় অঞ্চল জনসংখ্যার বৃদ্ধির পরিপন্থী। বৃষ্টিপাতের অভাবহেতু এখানে ভূমিভাগ খুবই অনুর্বর এবং খুব সঙ্গত কারণেই মনুষ্য বসবাস এখানে খুবই সীমিত। পৃথিবীর যে সকল অংশে খাদ্য সহজলভ্য ছিল সেখানেই আদিম মানুষ বসতিস্থাপন করেছিল।

(খ) **ভূমির উর্বরতা ঃ** যেখানেই ভূমিভাগ বিশেষভাবে উর্বর এবং খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য সেখানেই জনসংখ্যা বিকাশ লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর ভূমিভাগের একটি বিরাট অংশই খুব বেশি শুকনো অথবা খুব বেশি ঠাণ্ডা এবং খুব স্বাভাবিক কারণে এগুলিতে জনসংখ্যার বিরলতা দেখা যায়। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে পৃথিবীর ভূমিভাগের ৮০ শতাংশ শস্য উৎপাদন এবং গোচারণের অনুপযোগী অবশিষ্ট ২০ শতাংশ ভূমিভাগের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যশস্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার বিকাশভূমি নদ-নদীর তীরে উর্বর ভূমিভাগে গড়ে উঠেছিল এবং প্রাচীনকালে এই সব অঞ্চলেই জনসংখ্যার বিকাশ খুব বেশি রকম দেখা গিয়েছিল। সিন্ধু, গঙ্গা, নীলনদ, ইউফ্রেটস, ইয়াংসিকিয়াং নদ-নদীর তীরে প্রথম বৃহৎ জনগোষ্ঠী সমূহ গড়ে উঠেছিল।

(গ) **ধরাপৃষ্ঠ ঃ** পৃথিবী পৃষ্ঠের উচ্চতা অনুযায়ী জনগোষ্ঠীর বিকাশ নির্ভর করে। সাধারণভাবে পাবর্ত্যভুমিতে জনসংখ্যা কম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ হতে ১০০০ ফুট উচ্চতায় অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বসবাস দেখা যায়। এর বেশি উচ্চতায় জনবসতি ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

(ঘ) **অর্থনৈতিক বিকাশের বিভিন্ন দিক ঃ** পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিকাশ বিশেষ একটি উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে সেই এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উপর সমীক্ষা পরিচালনের মধ্যে দেখা গিয়েছে যে কৃষি এবং শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এলাকায় জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি শিল্পপ্রধান এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে একেবারে পরিপৃক্ত অবস্থায় পৌঁছেছে।

কাজেই আমরা দেখলাম যে জনসংখ্যার আকৃতি এবং অবয়ব প্রকৃতিদত্ত সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে যেমন জড়িত ঠিক তেমনিভাবে মানুষের নানা কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গেও প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে।

১.৫ জন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ

পৃথিবীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রেরণা কোন কোন উৎস থেকে এসেছে এবং কোন কোন ঘটনাবলী তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সে বিষয় উদ্ঘাটনও জনবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পরিধির অন্তর্ভূক্ত। কাজেই এই সকল ঘটনাবলীর সুসমঞ্জস উপস্থাপন এই প্রসঙ্গে জরুরী বলেই বিবেচিত হয়। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে গত তিনশত বছর ধরে পৃথিবীতে জনসংখ্যা ত্বরিত গতিতে বেড়ে চলেছে। শিল্প বিপ্লবই সর্বপ্রথম পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রথম প্রকাশ ঘটিয়েছিল। কেবলমাত্র ইউরোপেই এই ঘটনাটি জনসংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধির প্রেরণাকে প্রবল গতিবেগ দান করেছিল, তাই-ই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও এর বিস্তৃত প্রভাব পড়েছিল। এই সময়ই বিশাল ও বিস্তৃত মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অঞ্চলে গমানাগমনের কাজটি সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন জনগণনার তথ্যাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গত একশতবছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মহাবৃদ্ধির কারণ কি?

প্রথমেই কারণ হিসেবে শিল্পযোজনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ইউরোপীয় মানুষদের অবদানই বেশি। আধুনিক শিল্পভিত্তিক সভ্যতার বিকাশ সর্বপ্রথম ইউরোপের মাটিতেই সংঘটিত হয়েছিল। শিল্পবিপ্লব উৎপাদন প্রকটভাবে বৃদ্ধি করেছিল এবং এর ফলে অতি অল্পমাত্রার মধ্যেই প্রচুর খাদ্যবস্তু, অধিক পরিমান ভোগ্যবস্তু, এবং অধিক ধন সম্পদ বিকাশ লাভ করল যেগুলি ইতোপূর্বে কখনই দেখা যায় নি।

শিল্পযোজনের মাধ্যমে নতুন বস্তুগত পরিসম্পৎ বৃদ্ধির ফলে মৃত্যুহার বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। নানা ধরনের কর্ম এবং বিভিন্ন দ্রব্যের বিস্তার আরও বেশি কর্মী নিয়োগের প্রয়োজন সৃষ্টি করেছিল। অধিক খাদ্য উৎপাদন আরও অধিক সংখ্যক মানুষের খাদ্য যোগানে স্বাচ্ছন্দ্য এনেছিল এবং তার ফলস্বরূপ জন্মহার বেড়ে

গেল। কৃষি ও শিল্পের যৌথ অগ্রগমন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি দুর্ভিক্ষ, অপুষ্টি রোগের শিকার হওয়ার মত প্রাচীন শত্রুগুলি অবদমিত হল। অপরদিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি, কার্যকরী ঔষুধ প্রস্তুত প্রচেষ্টা এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষার নানারকম পদ্ধতি মানবজীবনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এসবের ফলে মৃত্যুহার ভীষণভাবে কমে গেল। তর্কের খাতিরে একথা এসেই যেতে পারে যে, যেহেতু জন্মহার কমে গেছে সেই হেতু এই ঘটনাটি জনসংখ্যার অসাধারণ বৃদ্ধি ঘটাবে না। কিন্তু এই অনুমানটি যথার্থ নয়। জন্মহার হ্রাস পাওয়ায় ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর প্রভাব পড়েছে একথা ঠিক, কিন্তু জনসংখ্যার সামগ্রিক চিত্রটি অবিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে চলেছে; কারণ একটি বিশাল জনগোষ্ঠী নিম্ন জন্মহার বজায় রেখেছে ঠিকই তবে মৃত্যুহারও খুব নিম্ন।

১.৫.১ জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণ

জনসংখ্যার পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে? আসুন সেই বিষয়গুলি একটু দেখে নিই। সাধারণতঃ এর পেছনে দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে — একটি হল জন্মহারের বৃদ্ধি এবং অপরটি হল মৃত্যুহারের হ্রাসপ্রাপ্তি। অর্থাৎ জনসংখ্যা পরিবর্তন উর্বরতা এবং মরণশীলতার উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বজনসংখ্যা বৃদ্ধির পশ্চাৎপটটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য মরণশীলতার হ্রাস প্রাপ্তি যতটা দায়ী উর্বরতাবৃদ্ধি ততটা নয়। জন্মহার কমে যাওয়ার মূলগত কারণ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিম্ন উর্বরতা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন সমাজের জনগোষ্ঠীর জন্মহার সেই সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন সামাজিক নিয়ম-কানুনের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। সামাজিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জন্মহারের উপর ক্রীয়াশীল। যদিও সন্তান জন্মদান একটি জীববিজ্ঞানীয় ঘটনা এবং জৈবিক প্রেরণাই স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনকে কার্যকরী করে তোলে। বিষয়টি অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এই জৈবিক প্রেরণাটি নানা ধরনের সামাজিক বিধি নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানব সমাজে পুরুষ ও নারীর অবাধ মেলামেশার কোন সুযোগ নেই। কারণ পুরুষ ও নারীর যৌন সংযোগ স্থাপনের সামাজিক অনুমোদন প্রয়োজন এবং সেই অনুমোদন বিবাহ নামক একটি প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় বিবাহকে একটি সার্বজনিক সামাজিক সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পৃথিবীতে অগ্রসর-অনগ্রসর, আধুনিক ও আদিম এমন কোন মানব গোষ্ঠী নেই যাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত নয়। বিবাহ প্রথা এত প্রকট সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যে এই সামাজিক প্রথাটি মানবগোষ্ঠীর জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক দুটি পরিমণ্ডলকেই নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। অর্থাৎ কার সঙ্গে কার যৌনমিলন ঘটবে তা বিবাহই স্থির করবে। আমরা সমাজধারা অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তো নয়ই নিকট আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ এখানে যৌন মিলন সম্ভব নয়। পৃথিবীর বিচিত্র সমাজব্যবস্থায় একে বলা হয় অনাচার। ভারতীয় সমাজে আমরা প্রত্যক্ষ করি

যে একই গোত্রভুক্ত নরনারীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই প্রসঙ্গে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় লক্ষ্যণীয়। মানব সমাজে যৌন মিলন এবং সন্তান উৎপাদন জৈবিক সক্ষমতা অর্জন করার উপর নির্ভর করে না—এখানে সামাজিক যোগ্যতা অর্জন জরুরী হয়ে উঠে। প্রতিটি সমাজে বিবাহদানের একটি নির্দিষ্ট বয়স থাকে। বর্তমানে ভারতীয় বিবাহের ন্যূনতম বয়স আইন মারফৎ নির্দেশিত রয়েছে। এর ফলে জননগত সময়টি সীমিত হয়ে পড়ে। এই সকল কারণে জন্মহার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহিত নর-নারীর যৌন মিলন নানা সামাজিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আদিবাসীদের মধ্যে বহুপতি মূলক বিবাহ জন্মহার নিয়ন্ত্রণের একটি বিশিষ্ট পন্থা হিসেবে স্বীকৃত। উত্তরাঞ্চলের খাসা আদিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘকাল থেকেই বহুপতিমূলক বিবাহ চলে আসছে। উদ্দেশ্য জন্মহার নিয়ন্ত্রণ। এই জন্মহার নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে কার্যকরী। আবার বহু সমাজ ব্যবস্থায় গর্ভপাত সমাজ স্বীকৃত। বর্তমানে বহু ক্ষেত্রে এটি আইনসিদ্ধ হিসাবেও পরিচালিত হয়েছে। সমাজধারার মধ্যে আবার এর বিপরীত চিত্রটিও দেখা যায়। প্রাচীনকালে কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় বহুপত্নী বিবাহিত্ত একটি বিশেষ রীতি ছিল। কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে অধিক সন্তান থাকাটা কাজকর্মের দিক দিয়ে খুবই সুবিধাজনক বলে দেখা গিয়েছিল। সেই কারণে একাধিক নারীকে বিবাহ একটি সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়েছিল। এর ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই জন্মহার বৃদ্ধি পেত। তবে বর্তমানে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বহুপত্নী বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থাৎ পরিবারে সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণের মাধ্যমে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই প্রচেষ্টা প্রয়োগই জন্ম নিয়ন্ত্রণের নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃ ফ্রান্সেই সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। প্রথমে ধনী ও স্বচ্ছল শ্রেণীভুক্ত মানুষদের মধ্যে প্রচার ঘটে তারপর সেগুলি খুব ধীরে ধীরে গ্রামীন জীবনে প্রবিষ্ট হয়। ধনী শ্রেণীদের মধ্যে জন্মহার কম এবং দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে এই হার অপেক্ষাকৃত বেশি।

১.৬ জন্মহার ও মৃত্যুহারে সামাজিক প্রভাব

সাম্প্রতিককালে একদিকে যেমন জন্মহার হ্রাস পেয়েছে অপরদিকে তেমনি মৃত্যুহারও নিম্নমুখী। মানবসমাজে নানাধরনের রোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির মত ঘটনা দীর্ঘকাল ধরেই মানুষের মৃত্যুহারে বৃদ্ধি করে এসেছে। রোগ ব্যধিকে প্রতিহত করার জন্য মানুষ নানা প্রচেষ্টা গ্রহণ করে এসেছে। ব্যাধির উপশম ও ব্যাধি বিতারণকে কেন্দ্র করে নানা বিশ্বাস ও সংস্কার গড়ে উঠেছিল যেগুলির অধিকাংশই ছিল জাদু-ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে ছিল নানা রকমের হাতুড়ে চিকিৎসা। ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের আলোক চিকিৎসা জগতের পরিমণ্ডলকে আলোকিত করল। বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মানুষকে ব্যাধি প্রতিহত করতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করল। বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহার অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে উন্নত করল। দুর্ভিক্ষ, মহামারীর মত অভিশাপকে মানুষ দুর করতে সচেষ্ট হল এবং কালক্রমে এবিষয়ে সে বহুল পরিমানে কৃতকার্য হল। বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং সমাজজীবনে এর প্রয়োগ, জনস্বাস্থ্যের প্রতি সরকারী উদ্যোগ ইত্যাদি ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ার ফলে

মানব সমাজে মৃত্যুহার কমতে থাকল। কাজেই মৃত্যু একটি জৈবিক ঘটনা হলেও বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক রীতি-পদ্ধতির দ্বারা এটি বিশেষভাবে প্রভাবিত। ভারতে এই মৃত্যুহার যদিও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বেশি তাহলেও এখানে বর্তমান মৃত্যুহার নিম্নগামী। ভারতে শিশুমৃত্যু এবং জননগত সময়ে নারীমৃত্যুর ঊর্ধ্বহার এখানে সামগ্রিক মৃত্যুহারকে বৃদ্ধি করেছে। সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে এখানে ২০ শতাংশ শিশু একবছর বয়স পূর্তির পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জননগত সময়ে নারীমৃত্যুর হার হল প্রতি হাজারে ২৫.০৫ জন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে শিশু মৃত্যু সমেত অন্যান্য বয়সে মৃত্যুহার বেশ কমেছে। এর কারণ অবশ্যই জনস্বাস্থ্যে আধুনিক বিজ্ঞান জাত নানা পদ্ধতি ও কৌশলের প্রকাশ। ইংলণ্ডে বহুকাল পূর্বেই শিশুমৃত্যুর ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবেই কমে গিয়েছে। আমেরিকাতেও শিশুমৃত্যুর ঘটনা প্রায় নেই বললেই হয়। মৃত্যুহার নিম্নগামী হওয়ার ফলে জীবনের প্রত্যাশা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে জীবনের এই প্রত্যাশা বিশেষভাবে বেড়েছে। ইংল্যান্ডে জীবনের প্রত্যাশা গড়ে ৬৬.৩৯ বছর; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৬৮.৪ বছর। ভারতে এই জীবন প্রত্যাশা হল গড়ে ৪১ বছর। ভারতে জীবন প্রত্যাশা নিম্ন হওয়ার কারণ এখানে শিশুমৃত্যুর হার খুব বেশি।

১.৬.১ বর্ধিত জনসংখ্যা ও মানব সমাজ

পৃথিবীতে জন্মহার নিম্নগামী তবুও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে। বহু দেশে জন্মহার ভীষণভাবে কমেছে ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে মৃত্যুহারও ভয়ানক হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভারতে জন্মহার প্রতি হাজারে ২ জন কমেছে (১৯৪৮-৫১ সালের হিসাবে) তবে মৃত্যুহার তার থেকেও কমেছে এবং তার হিসাব হল হাজার প্রতি ৪ জন। কাজেই এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থাৎ জন্মহার ও মৃত্যুহারের মধ্যে পার্থক্য হল হাজার প্রতি ২ জন। যদি মৃত্যুহার অপেক্ষা জন্মহার কম না হয় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে যাবে। কোন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মানুষের জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যা প্রভাব বিস্তার করে। এবিষয়ে প্রখ্যাত এবং প্রবাদ প্রতীম অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথুস (Malthus) সর্বপ্রথম মূল্যবান ইঙ্গিত দান করেন। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জনসংখ্যার উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজজীবনে প্রচণ্ড দুর্ভোগের সৃষ্টি করে। তাঁর মতে জনসংখ্যা গুনোত্তর হারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু খাদ্য সামগ্রীর বৃদ্ধি ঘটে সমান্তর হারে। এইভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য সামগ্রীর অভাব ঘটবে। ঘটনাটি অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হতে থাকলে দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুর্ভিক্ষের সূচনা হবে, অপুষ্টি আর ব্যধিতে পরিপূর্ণ হবে মানব সমাজ এবং সেই সঙ্গে ঘটবে অকাল মৃত্যু। ম্যালথুস এই বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানব সমাজের একটি অত্যন্ত বেদনাময় অবস্থার বিষয় উপলব্ধি করেছিলেন। এই সঙ্কটময় অবস্থাটিকে যদি জনসংখ্যা সীমিতকরণের মাধ্যমে বাধা দেওয়া না হয় তাহলে মানব সমাজস্থিত মানুষ খাদ্যাভাবে ধ্বংস হবে। ম্যাসথুস তাঁর বিভিন্ন তথ্য ও উদাহরণের মাধ্যমে যে সকল বিষয় উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর মধ্যে যুক্তির অভাব নেই এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধ করা ছাড়া মানব সমাজের যে উদ্ধারের পথ নেই একথা অস্বীকার করা যায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির

জন্য পৃথিবীতে যে চরম দারিদ্র এবং দুর্দশার কুপ্রভাব পড়বে বলে তিনি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দেখা গিয়েছে। তাহলেও ম্যালথুস তাঁর বক্তব্যের জন্য নানা দিক দিয়ে সমালোচিত হয়েছেন। ম্যালথুসের সমালোচকেরা বলেছেন যে মানুষের উদ্ভাবনী দক্ষতা নানা সমস্যার মোকাবিলায় ভীষণভাবে সাহায্য করেছে এবং এরই মাধ্যমে মানুষ অবলীলাক্রমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং হ্রস্বীকৃত সম্পদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অবস্থার পরিবর্তনে পারঙ্গম। ম্যালথুসের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যে সার্বিক উন্নতি ঘটেছে তার ফলে সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে। এই সঙ্গে জন্মনিরোধক পদ্ধতি সমূহের বহুলপ্রচার জন্মহার অবলীলাক্রমে গুনোত্তর হারে বৃদ্ধি না পেয়ে উল্লেখযোগ্য না হলেও কিছু হ্রাস পেয়েছে। নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে যে উন্নতি প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটেছে তার সাহায্যে পৃথিবীর বহুস্থানে কৃষিকাজের চরম উন্নতি হয়েছে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন সমান্তর হারের মধ্যে সীমিত থাকেনি — কোন কোন ক্ষেত্রে গুনোত্তর হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহৎ শিল্পযোজন পৃথিবীর উন্নত দেশ সমূহে তা নিশ্চয়ই বহু অনুন্নত দেশেও সম্পদ সৃষ্টির ধারাকে বহুগুণ উদ্দীপিত করেছে। একথা অনস্বীকার্য যে উনবিংশ শতাব্দীতে ম্যালথুসের পক্ষে বিংশশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং তার কার্যকরী প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদবৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষ ধারণা লাভ করা সম্ভব ছিল না। তবে একথাও বোধ হয় অস্বীকার করার নয় যে পৃথিবীর কিছু পশ্চাৎবর্তী ও অনুন্নত দেশের জনগোষ্ঠী ম্যালথুস প্রদর্শিত কারণেই আজ বিপর্যয়গ্রস্ত। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ম্যালথুসই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে জনসংখ্যাবৃদ্ধি জনিত সমস্যাটি সকলের সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন এবং তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন যে, সাধারণের উন্নয়নে যে কোন কার্যকরী প্রকল্প প্রণয়ন করা হোক না কেন জনসংখ্যা যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তাহলে সমস্ত প্রয়াসই নিষ্ফল হবে।

১.৭ জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান

এই আলোচনা সূত্র ধরেই আরও একটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত হবে। বিষয়টি হল জীবনযাত্রার মান এবং জনসংখ্যা। ম্যালথুসের মতে বিরাট জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার মানকে নিম্নগামী করে অপরদিকে জনসংখ্যা কম থাকলে মানবজীবন উন্নত পর্যায়ের হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে জনসংখ্যার সম্পর্ক এভাবে স্থাপন করা বেশ কঠিন কাজ। জীবনযাত্রার মানকে কোনভাবেই জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্যসরবরাহের পশ্চাৎপটে মূল্যায়ন করা যায় না। এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে জীবনযাত্রার মান মোটামুটিভাবে চারটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

১) **প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ** যে সকল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ খুব বেশি সেই সব দেশের মানুষদের জীবনযাত্রার মান উন্নত। অপরদিকে প্রাকৃতিক যারা দুর্বল তাদের জীবনযাত্রার মান বেশ অনুন্নত। পৃথিবীর

যে সকল দেশ অফুরন্ত কয়লা, লৌহ আকরিক, এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থে বলীয়ান সে দেশগুলি পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে।

২) **উদ্ভাবন ঃ** একথা স্বীকার করতেই হবে কেবলমাত্র খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য কোন দেশের জনজীবনকে উন্নত করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সকল খনিজ সম্পদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আরোপের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় ততক্ষণ সেগুলি জনজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে না। পৃথিবীতে এমন দেশ রয়েছে যেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই কিন্তু সেগুলি জনজীবন থেকে দূরেই থেকে গিয়েছে কারণ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনী পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলি জনজীবনে আরোপিত হয়নি। আমাদের দেশেও এই রকম বহু প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে কাজে লাগাতে পারা যায়নি। উদ্ভাবনকে সঠিক পদ্ধতিতে কাজে লাগাতে না পারলে দেশের জীবনযাত্রার মান নিম্নই থেকে যাবে।

৩) **সামাজিক সংগঠন ঃ** সমাজ-সংগঠিত না হলে প্রভূত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে না। সমাজব্যবস্থার মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি থাকলে সেই সমাজস্থিত মানুষের জীবনযাত্রার বিকাশ ঘটবে, অন্যথায় জীবনে নানা সঙ্কট দেখা দেবে। সমাজের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্পর্ক, সুসম্বন্ধ আর্থিক লেনদেন, সুষ্ঠু শ্রম বিভাজন, উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে সমতা ইত্যাদির উপস্থিতি এক সুষ্ঠু সমাজ সংগঠনের জন্মদান করে। এই ধরনের এক সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে উন্নত হয়।

৪) **জনসংখ্যা ঃ** সর্বশেষে এই বিষয়টি এসে যায় যে জনসংখ্যার বিচলন জীবনযাত্রার মানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ম্যালথুস যদিও অভিমত দান করেছিলেন যে ছোট জনগোষ্ঠীর অর্থ উন্নত জীবনধারা তাহলেও বর্তমানে এই মতামতকে সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় না। পৃথিবীতে অনেক বিক্ষিপ্ত ও ছোট জনগোষ্ঠীর জীবন অত্যন্ত নিম্নমানের হতে দেখা যায়। কোন দেশে বিশাল ও বিস্তৃত কৃষিজমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য প্রকৃত জনবল প্রয়োজন। একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে নানা পদ্ধতি প্রয়োগে ছোট করে দিলেই যে তার জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এরকম কোন কথা নেই। তবে জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে এই জনসংখ্যা ছাড়াও অন্যান্য বিষয় রয়েছে যেগুলির পাশাপাশি আলোচনা প্রয়োজন। কোন দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর চাপ সত্ত্বেও তার সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে পারে। যেমন সমাজবিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে যুদ্ধপূর্ববর্তী ইতালির কথা বলেছেন। ভারতের ক্ষেত্রে তার বিশাল জনগোষ্ঠীই যে নিম্নমানের জীবনযাত্রার জন্য সর্বাংশে দায়ী একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের উন্নয়ন ঘটেছে। কোন ধরনের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যাবৃদ্ধি অনধিক্রম্য বাধা হিসেবে কাজ করে না। ভারতের জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেনি। প্রকৃত পক্ষে ভারতের জনগণের উপার্জন জীবন নির্বাহ স্তরেই রয়েছে। এখানে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য কোন উদ্বৃত্ত আর্থিক সঙ্গতি নেই। গ্রামীন স্তরে সঞ্চয় এবং পুঁজি বিনিয়োগের অবস্থা অতীব করুণ। তবে যদি নতুন ও উন্নতধরনের প্রযুক্তি কৌশল আরোপ করে প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগান হয়, জনসাধারনের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের চেতনা

জাগ্রত করা যায়, দায়িত্ব বোধ এবং পারস্পরিক সহমর্মিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতের জীবনধারণের মান উন্নত হবে। এমতাবস্থায় স্মরণীয় যে জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যার প্রভাবকে মূল্যায়নের প্রাক্কালে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি ও কর্মক্ষমতার বিষয়টিকেও পর্যালোচনা করতে হবে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি শূন্যস্থানের সমস্যা নয়। এটি এমন একটি সমস্যা যা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য সম্পদের গতি-প্রকৃতিতে জড়িত। অন্যভাবে বলতে গেলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি তখনই একটি মহাসমস্যা যখন পৃথিবীর সম্পদ পৃথিবীর সকল মানুষের প্রয়োজনে লাগে না। সুতরাং এই প্রসঙ্গে অভিমত দান করা হয় যে জনসংখ্যার সমস্যা জন্মনিয়ন্ত্রণের সংখ্যায় যতটা জড়িত ঠিক ততটাই সম্পদ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত।

১.৮ জনসংখ্যা ও সামাজিক বিন্যাস

জনসংখ্যার বৃদ্ধি জনিত প্রশ্নে বয়ঃক্রম অনুযায়ী জনগণের বিন্যাস লক্ষ্য করা জরুরী। জন্মহার বৃদ্ধি এবং মৃত্যুহার কমে গেলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঠিকই তবে এই ক্ষেত্রে আরও একটি ভিন্ন ঘটনার উদ্ভব হয়। এটি হল বয়ঃক্রম কেন্দ্রিক জনসংখ্যার বিন্যাসের মধ্যে সবিশেষ পার্থক্য। জন্মহার ও মৃত্যুহারের যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাসের আনুপাতিক হারের উপর সংশ্লিষ্ট সমাজের গড় বয়স বাড়বে অথবা কমবে সে বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গড় বয়স বৃদ্ধি পেলে একথা ধরে নিতে হবে যে সমাজে বেশি বয়স্ক মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে। অপর দিকে গড় বয়স হ্রাস পেলে বুঝতে হবে যে সমাজে কম বয়সী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বয়ঃক্রম অনুযায়ী জনসংখ্যার বিন্যাস সামাজিক চিত্রটির সম্পূর্ণতা দান করে। আবার অন্যদিকে দেখা যায় যে যদি কোন কারণে বয়ঃক্রম ভিত্তিক বিন্যাসের অসামঞ্জস্য ঘটে তাহলে সেই অবস্থা সামাজিক ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনে বিশেষভাবে কার্যকর হয়ে উঠে। কোন জনগোষ্ঠীতে যদি বয়স্ক মানুষের সংখ্যাধিক্য ঘটে তাহলে কাজকর্মে ও জীবন পরিচালনে প্রাচীন-পন্থী চিন্তাধারারই প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। আবার এর বিপরীত অবস্থা হলে নব নব চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটার দিকে ঝোঁক বেশি থাকে।

১.৮.১ জন্মনিয়ন্ত্রণ

জনবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধিতে বাধাপ্রদান। এই বৃদ্ধি রোধ করার প্রাথমিক প্রচেষ্টাটিই হল জন্মনিয়ন্ত্রণ। এটি কেবল প্রাথমিক প্রচেষ্টাই নয় — একে একটি অবিসংবাদিত পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পশ্চাতে সকল ক্ষেত্রে ছোট জনগোষ্ঠী একমাত্র আবশ্যিক বিষয় না হলেও বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকেই প্রাধান্য দিয়েছে। সেই নিয়ন্ত্রণ

কর্মের কার্যকরীপন্থা হিসেবে কৃত্রিম পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আপন আপন পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার বিষয়ে পৃথিবীর সমগ্র অগ্রসর জনগোষ্ঠী আজ বিশেষভাবে আগ্রহী। একথা ঠিক যে প্রাথমিক পর্যায়ে এই ধরনের কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা উচ্চ ও ধনী শ্রেণীর মুষ্টিমেয় মানুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা সাধারণ জনগোষ্ঠীতে প্রবিষ্ঠ হয়েছে যদিও সীমাবদ্ধরূপে। সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ-সংস্কারকদের উপর্য্যুপরি হস্তক্ষেপ ও প্রচারের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টাটি বিশ্বজনীনতা লাভ করেছে। মূলতঃ সমাজের নিম্ন অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত মহিলাদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে যাবতীয় জন্মনিয়ন্ত্রনের পদ্ধতিকে সাধুবাদ জানান হয়েছিল। অপরদিকে সুপ্রজননবিদেরা সমাজকে মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব থেকে বাঁচাবার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে মতদান করেছিলেন। কারণ এই মানসিক রোগগ্রস্ততা খুব বেশিরকমভাবে পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। অনেক সময় সমাজে অত্যধিক অদক্ষ কর্মীর আবির্ভাবকে রোধ করতেও জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কারণ সমাজে এদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে সকলের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এমনিভাবে সমাজের মধ্যস্থিত নানা প্রত্যক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রনের পক্ষে রায়দান করেছে।

১.৮.২ জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ

তবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহনের বিপক্ষেও মতবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। অনেক সময় মনে করা হয়েছিল যে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবর্তকগণ একটি বিশিষ্ট সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলেছেন। ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁদের পরিবার এতবেশি ছোট করে ফেলেছেন যে সমাজ তার কর্মধারা পরিচালনে নিম্ন ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাহায্য গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে কর্মদক্ষতা এবং কর্ম নৈপুণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবদান থেকে সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে। কোন কোন ধর্মীয় পরিমণ্ডলে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে পাপকার্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। একে ভগবানের পবিত্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য পরিচালনা বলেই অনেক ধর্মগুরু অভিমত দান করেছেন। অনেকে বলেছেন দেশকে রক্ষা করতে গেলে বহিঃশত্রুকে সবলে প্রতিহত করতে হবে। কাজেই যুদ্ধবিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। জনসংখ্যার ঘাটতি থাকলে যুদ্ধ পরিচালনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। জন্ম নিয়ন্ত্রণে দেশে বয়স্কদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে — তরুণদের সংখ্যা কমছে। এই তরুণেরাই তো যুদ্ধে যোগদান করবে। আবার অনেকের মতে বিশাল ভূখণ্ডে কলকারখানা প্রতিষ্ঠায় এবং প্রতিদিনের কর্মসঞ্চালনে বহু যুবক কর্মীর প্রয়োজন। বহু বিস্তৃত কৃষি ক্ষেত্রগুলিতেও একই ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবে বলে অনেকের ধারণা। এঁরা সকলেই জন্মশাসনের পক্ষে মতামত দান করতে অস্বীকার করেন। এই ধরনের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ সংস্কারকগণ তাঁদের যুক্তিপূর্ণ মতদান করতে অগ্রসর হয়েছেন। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে কোনক্রমেই শিশুহত্যা এবং গর্ভপাত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। যেখানে শিশুহত্যা এবং গর্ভপাত জীবনকে ধ্বংস করে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি সেখানে জীবনের আগমনকে প্রতিরোধ করে। শেষোক্ত পদ্ধতিটি অপব্যয়ী নয়। কাজেই

গর্ভনিরোধ গর্ভপাত নয়। গর্ভপাত পদ্ধতি জীববিজ্ঞানীয় ঘটনা প্রবাহের কার্যক্রমে সৃষ্ট প্রাণকে বিনষ্ট করা বোঝায়। অন্য দিকে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি প্রাণ সৃষ্টির পথেই বাধাদান করে। এইসকল বিষয় বিবেচনা করেই আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণকেই জনসংখ্যা হ্রাসের একমাত্র কার্যকরী পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে মতামত দান করেছেন। জনসংখ্যা সীমিত না হলে দেশের উপর প্রচণ্ড চাপ বর্ষিত হয় এবং সেই চাপ রাষ্ট্রকে নতুন নতুন এলাকা জয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে অবিসংবাদিতভাবে যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন প্রচেষ্টাই দুঃখ-দুর্দশা এবং যুদ্ধবিগ্রহ আনয়ন করে না। জনসংখ্যার প্রতি অবাধ নীতি অভাবনীয় দারিদ্র এবং হতাশা সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। এই প্রসঙ্গে সুপ্রজননবিদ্‌দের বিষয়টি আবার এসে পড়ে। সুপ্রননবিদ্যা জনসমাজে সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষদের জন্ম প্রত্যাশায় প্রথিশ্রুতিবদ্ধ। অপরদিকে নিকৃষ্ট, রোগগ্রস্ত ও অস্বাভাবিকদের নির্বীজনের মাধ্যমে অপনয়ন প্রচেষ্টায় এঁরা যত্নশীল। এঁদের নীতি হল অযোগ্যদের জন্মগ্রহণ এবং পুরুষানুক্রমে সঞ্চালনের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ জনবিজ্ঞানের একটি বহুমুখী গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের বহুলাংশে নানা কার্য-কারণের মাধ্যমে জন্মহার অবদমিত হয়েছে। এই অবদমনটি জনবিজ্ঞানের একটি অতীব উল্লেখীয় ঘটনা। অনেক সমাজ বিজ্ঞানীর মতে পাশ্চাত্ত্য দেশে বহু বিস্তৃত নগরায়নের ফলে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং তার জন্য জনসংখ্যা কমেছে। তবে এ বিষয়ে যথাযোগ্য এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিবাহের বয়স উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাটিও জন্মহার হ্রাসের একটি কারণ হতে পারে। তবে সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণ হিসেবে বলা যায় যে বিভিন্ন গর্ভনিরোধক পদ্ধতি প্রয়োগ পরিবারের আয়তনকে সীমিত করে রাখার মনোগত ইচ্ছার উন্মেষ। সেই উনবিংশ শতাব্দীতেই ইউরোপের দেশসমূহের সমাজ-মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। সর্বব্যাপী শিল্প বিপ্লব অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গে সমাজদর্শনকেও পরিবর্তিত করেছে। প্রাচীন ঐতিহ্য ভিত্তিক জীবনধারা আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। এখানের পরিবারগুলিতে শিশুর সংখ্যা সীমায়িত হয়েছে — কেবলমাত্র এই কারণে নয় যে পিতামাতা তাদের আপন জীবনধারার উচ্চমান রক্ষায় অসমর্থ হবেন। অপর কারণটি হল যে এঁরা মনে করেন যে পরিবারে শিশুর সংখ্যা কম হলে প্রত্যেকের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করে তাদের গড়ে তোলা সম্ভব হবে। মহিলাদের উচ্চ সামাজিক স্থান প্রাপ্তি এবং অর্থোপার্জন ভিত্তিক জীবনধারা রচিত হওয়ার ফলে তাঁদের উপর থেকে সন্তানধারনের বোঝা নেমে গিয়েছে।

১.৯ জনবিজ্ঞান ও মানবসমাজ

এতক্ষণ আমরা বিভিন্ন ধরনের আলোচনার মাধ্যমে দেখলাম যে জনবিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনসংখ্যাই এই বিশেষ বিজ্ঞান শাখাটির কেন্দ্রীয় রূপ। এই জনসংখ্যা বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। এই বিষয়গুলির অধিকাংশই সমাজ ধারা নিয়ন্ত্রিত — কাজেই মানব সমাজের নানা ধ্যানধারনার

পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব এই জনবিজ্ঞানের গঠন ও পরিচালনে রূপদান করেছে। এই সকল বিষয় স্মরণে রেখে জনবিজ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে গেলে আমাদের নিম্নবর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতকে মূল্যায়ন করতে হবে—

(১) জনবিজ্ঞান ব্যক্তি ভিত্তিক সমস্যাবলীকে গুরুত্ব দেয় না তবে সমগ্র সমালোচনার সামগ্রিক বিষয়গুলিকে আলোচনা করে।

(২) মানবগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে অঙ্কশাস্ত্রীয় এবং পরিসাংখ্যিক পদ্ধতি সমূহের সাহায্য গৃহিত হয়।

(৩) সময় ভিত্তিক এবং স্থানভিত্তিক জনসংখ্যার আকার, গঠন এবং বিস্তারের আপেক্ষিক মানকে এই বিজ্ঞান শাখাটি বিশেষ দৃষ্টি দান করে।

(৪) জনগোষ্ঠীর আকৃতির আলোচনা ও বিশ্লেষণে এই বিজ্ঞান নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে—

(ক) উর্বরতা (খ) বিভিন্ন উর্বরতা হার (গ) জন্মহারের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ঘটনা (ঘ) বিভিন্ন ধরনের মৃত্যু হার সমেত মরণশীলতা (ঙ) শিশু ও মাতার মৃত্যু হার (চ) উচ্চ এবং নিম্ন মৃত্যুহারের কারণ সমূহ।

জনগোষ্ঠীর গঠন লিঙ্গ, লিঙ্গ অনুপাত, জনস্বাস্থ্য এবং জনসংখ্যা পিরামিডের বর্গীকরনের ভিত্তিতে রূপায়িত হয়। জনসংখ্যার বিস্তার — প্রধানতঃ জনসংখ্যার ঘনত্ব, গ্রামশহরে জনবিস্তার, প্রব্রজন এবং জনসংখ্যার নানা কারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(৫) কোন দেশের জনসংখ্যার আকৃতি, গঠন, এবং বিস্তার সংশ্লিষ্ট দেশের পরিবার নিয়ন্ত্রণ এবং জননীতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ফলতঃ এই জননীতি জনবিজ্ঞান অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

জনবিজ্ঞানের পরিধি পর্যালোচনায় উপরোক্ত বিষয়সমূহকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যেহেতু জনবিজ্ঞান বিষয়টি বহু অধ্যয়ন ধারার সমন্বিত রূপ সেই হেতু এই অধ্যয়ন পরিধি নানাভাবে এবং নানা চিন্তাধারায় উপস্থাপিত হয়েছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে জনবিজ্ঞানকে তার দৃষ্টিগুলির প্রকৃতি অনুসারে দুটি দিক থেকে অনুধাবন করা যায়। প্রথমতঃ রয়েছে এর প্রযুক্তিগত বিষয়বস্তু — এর মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর আকৃতি এবং গঠন ও তার সঙ্গে এই গোষ্ঠীর বৃদ্ধি এবং বিস্তারণে দায়ী বিভিন্ন ঘটনাকে পরিসাংখ্যিক পশ্চাৎপটে বিশ্লেষণ করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই জনবিজ্ঞানের সামাজিক পর্যায়। এই পর্যায়টি একদিকে জনসংখ্যা ভিত্তিক ঘটনাবলী এবং অপরদিকে মানবগোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জীববিজ্ঞানীয় এবং বাস্তুসংস্থানিক বিষয় সমূহের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১.১০ বৃহৎ জনবিজ্ঞান ও অনুজনবিজ্ঞান

জনবিজ্ঞানের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ কর্মে-রত বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিগুলির বিশিষ্ট ধারা অনুসারে জনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধিকে দুটি মূলবিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে —

(এক) **বৃহৎ জনবিজ্ঞান (Macro Demography) :**

এই ধরনের জনবিজ্ঞান পর্যালোচনায় জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তি, লিঙ্গ অনুপাত, স্বাস্থ্যশিক্ষা ইত্যাদির ধীর ও ত্বরিত বৃদ্ধির কারণ সমূহ উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষিত হয়। বহু অর্থনৈতিক বিষয় যেমন বেকারত্ব, সাধারনের উপার্জন অবস্থা, জীবনধারার মান, শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা, উৎপাদন, উপভোগ, সঞ্চয় অভ্যাস, জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা এবং মূল্যায়ন বৃহৎ জনবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যুক্ত ঘটনাবলী যেমন দাম্পত্য স্থিতি, পারিবারিক গঠন, জাতি, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদির বর্তমান পরিস্থিতি এই বৃহৎ জনবিজ্ঞান আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। এই বৃহৎ জনবিজ্ঞান ধারার মাধ্যমে ভূগোলকেও অনুধাবন করা যায়। যেমন জনপ্রব্রজন সমস্যা, নগরায়ন ইত্যাদি বিষয় জনবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

(দুই) **অণু জনবিজ্ঞান (Micro Demography) :**

এই জনবিজ্ঞান অনুসারে বিভিন্ন ঘটনাবলীর ক্ষুদ্র এককগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। যেমন — ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী প্রভৃতি। প্রকৃত পক্ষে এই ক্ষুদ্র এককগুলি অণু জনবিজ্ঞানের প্রাথমিক উপকরণ সৃষ্টি করে। কোন একটি শহর অথবা সীমিত জনপদে একটি বিশেষ বিষয় যেমন পারিবারিক পরিবর্তন ধারা বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করলে সেটি অণু জনবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। আবার যদি সমগ্র ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ অনুসন্ধান কার্যটি পরিচালিত হয় তাহলে সেটি বৃহৎ জনবিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হবে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে কোন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা বিশেষ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, বিস্তার এবং পুনর্বিস্তার বিষয়ে আলোচনা অণু জনবিজ্ঞানেরই এক্তিয়ারভুক্ত হবে।

সাম্প্রতিককালে জনবিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনায় একটি সুষম দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে জনবিজ্ঞান মানব সমাজেরই অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন ধারায় রূপায়িত। এর মধ্যে ব্যক্তিভিত্তিক ঘটনাবলীর কোন সংযোগ নেই। এখানে সংখ্যাভিত্তিক আলোচনার ও চিত্রাঙ্কনেরও পদ্ধতি রয়েছে এবং এগুলি অপরিহার্য। জনবিজ্ঞানের অনুসন্ধান ধারায় বিশ্বব্যাপী সমতা রক্ষায় **সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘ** (United Nations Organisation) নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন —

(১) উর্বরতা, (২) মরণশীলতা, (৩) প্রব্রজন, (৪) জিনগত গঠন, (৫) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, (৬) জনসংখ্যা এবং সম্পদ, (৭) মাপন কৌশল, (৮) জনবিজ্ঞান অনুসন্ধানীদের প্রশিক্ষণ, (৯) জনসংখ্যার বিস্তারণ,

(১০) পরিবার পরিকল্পনা, (১১) জনসংখ্যার অভিক্ষেপণ, (১২) বাসগৃহ, শিক্ষা, সঞ্চয় এবং বিনিযোগের জনতাত্ত্বিক দিক।

১.১১ সামাজিক জনবিজ্ঞান

সামাজিক জনবিজ্ঞান অধ্যয়ন সর্বদাই সমাজের জীবন ও কর্মধারার সুসমঞ্জস এবং সুসম্বন্ধ অনুসন্ধানের উপরই নির্ভরশীল। কারণ এই দুইয়ের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমেই সমাজ জানতে পারবে তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার জন্য কি বিশেষ ধরনের সামাজিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের শিশুরাই আগামীদিনের কর্ণধার হবে এবং এই কারণেই প্রয়োজনানুযায়ী শিশু বিকাশ কার্যক্রম রচনা এবং রূপায়নের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এটি জাতীয় কর্মসূচির একটি অত্যাবশ্যকীয় পর্যায় হিসেবে স্বীকৃত। জনবিজ্ঞান অধ্যয়ন পরিধিতে শিশুবিকাশ প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান কার্যক্রম হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে। জনসংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষিত হয়ে কিভাবে অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন সমূহ যেমন জলসরবরাহ, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যোগাযোগব্যবস্থা, বাসগৃহ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে রূপায়িত করা যায় তার প্রতি প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাতে সামাজিক জনবিজ্ঞান বিশেষভাবে কার্যকরী। এই সামাজিক জনবিজ্ঞানের অনুসন্ধান ভিত্তিক তথ্যাবলী থেকে রাষ্ট্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বিষয়ে অবহিত হতে পারে এবং কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে সেই সমস্যা সমাধান করা যায় তারও হদিশ এই ধরনের অনুসন্ধান ধারার মধ্য থেকেই পাওয়া যাবে।

এরই উপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী **কিংসলে ডেভিস** (Kingslay Davis) অভিমত দান করেছেন যে মানব সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিভূমিকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য জনসংখ্যার পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাঁর মতে সামাজিক জনবিজ্ঞান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে বিশেষ অধ্যয়ন পরিধি রচনা করে।

(১) বিশেষভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে জনসংখ্যার তথ্য।

(২) জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও হ্রাসের হার সম্পর্কিত অনুসন্ধান।

(৩) জনসংখ্যার পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা অনুকূল হারের বিষয়ে গবেষণায়।

(৪) জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ প্রবনতার অভিক্ষেপণ।

এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যার সমস্যা সমাজের প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম। এই সমস্যা সমাজ জীবনে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি কারক যেমন সামাজিক বিঘটন এবং সামাজিক ভারসাম্যহীনতা। জনবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনা এবং অনুসন্ধান ফলাফল প্রয়োগে সামাজিক সমস্যাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। জনবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনের হার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা যায় এবং তার ফলে সামাজিক সংগঠন, সামাজিক স্থিরতা এবং সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।

১ .১২ সারাংশ

জনসংখ্যার গৌণ, বিশ্লেষণ এবং তার পরিবর্তন যে কোন দেশ এবং সমাজধারা পরিচালনে অত্যন্ত জরুরী। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানুষের বসবাস রয়েছে। তবে সকল অঞ্চলে একই ঘনত্ব বিশিষ্ট জনসংখ্যা পাওয়া যায় না। কোথাও খুব বেশি সংখ্যক মানুষ দেখা যায়, আবার কোথাও কম। কোন ভূখণ্ডে মানুষের একত্রে সুষ্টুভাবে বসবাসের জন্য এবং তাদের মৌলিক অধিকার পূরণের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের সূচনা হয়েছে। এই বিশেষ লক্ষ্য সমূহকে পরিপূর্ণ করে তুলতে রাষ্ট্রকে বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হয়। একটি রাষ্ট্রের মধ্যস্থিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, লিঙ্গ ও বয়স ভিত্তিক উপস্থাপন, জনসংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি এবং তাদের কার্য-কারণ সম্পর্কে ধারার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রকে সকল সময়েই তার মধ্যস্থিত জনসংখ্যার প্রকৃতিটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এই জনসংখ্যার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য রয়েছে বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি আরোপ করে জনসংখ্যার ব্যাখ্যা করার নামই **জনবিজ্ঞান** বা **ডেমোগ্রাফি**।

সমাজবদ্ধ জীব মানুষকে জানতে হলে একদিকে তাদের নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় চেতনা ইত্যাদির আলোচনা করতে হয় অপরদিকে সেগুলি বিভিন্ন জৈব-সাংস্কৃতিক বিষয় যেমন জন্ম, মৃত্যু, সংখ্যাবৃদ্ধি অথবা হ্রাস, পেশা, শিক্ষা, লিঙ্গানুপাতিক বিশ্বাস ইত্যাদির উপর আলোকপাত করা প্রযোজনীয় হয়ে উঠে। জনবিজ্ঞান অথবা ডেমোগ্রাফি যখন সামাজিক গতি-প্রকৃতির পশ্চাৎপটে রূপায়িত হয় তখনই তাকে বলা হয় **সামাজিক জনবিজ্ঞান**। জনগোষ্ঠীর এই বিজ্ঞান সম্মত গণনা এবং ব্যাখ্যা সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় অপরিহার্যরূপেই বিবেচিত হয়। কারণ জনসংখ্যার হ্রাস, বৃদ্ধি এবং বয়স ও লিঙ্গ অনুপাতের উপর সমাজের গতি-প্রকৃতি নির্ণীত হয়। সামাজিক জনবিজ্ঞান জনসংখ্যার নানা পরিস্থিতি মানব সমাজের পশ্চাৎপটে আলোচনা করে থাকে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব অর্থাৎ কোন একটি ভূখণ্ডে খুব বেশি মানুষের বসবাস — এই বিষয়টি কতকগুলি কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল। এগুলির মধ্যে প্রধান বিষয়সমূহ হল জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, ধরাপৃষ্ঠ, অর্থনৈতিক বিকাশের নানা দিক। পৃথিবীতে জনসংখ্যা ত্বরিতগতিতে বেড়ে চলেছে। কোন কোন অঞ্চলে শিল্পযোজনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে শিল্প এবং অপরদিকে কৃষির উন্নতির ফলে প্রচুর খাদ্যবস্তু, অধিক পরিমানে ভোগ্যবস্তু এবং অধিক ধনসম্পদ বিকাশলাভ করায় মানবজীবনে স্বস্তি এসেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রসরতার ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থার সবিশেষ উন্নতি ঘটল এবং এর ফলে মৃত্যুহার বিশেষভাবে কমে গেল। আবার নানা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জন্মহার কমে গেলেও জনসংখ্যা কিন্তু বৃদ্ধির পথে। তার কারণ মৃত্যুহারের হ্রাসপ্রাপ্তি। এই কারণেই পৃথিবীতে জন্মহার নিম্নগামী তবুও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে।

মানুষের জীবনযাত্রার মানের উপরও জনসংখ্যা নির্ভরশীল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথুসের কথায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করে। তিনি বলেছিলেন যে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে

বৃদ্ধি পায় কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর সমান্তর হারে বৃদ্ধি ঘটে। এই ধরনের পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে থাকলে কালক্রমে সমাজে খাদ্যবস্তুর অভাব ঘটবে এবং এর ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে মানুষের জীবনে যবনিকা নেমে আসবে। কাজেই এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে জনসংখ্যা সীমিত করতে হবে। অন্যথায় সমাজজীবনে ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। বর্তমান পৃথিবীতে ম্যালথুসের ভবিষ্যৎবাণী সত্যি সত্যিই পরিস্ফুট হয়েছে। তবে মানুষ তার নিত্যনতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে ম্যালথুসের ভীতিকে প্রতিহত করেছে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে কৃষির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। খাদ্যবস্তুর উৎপাদনের হার তীব্র গতিতে বেড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম উল্লেখযোগ্য এবং সংগ্রাম বহুলাংশে সফল হওয়ার কারণ উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ। একথা অনস্বীকার্য যে ম্যালথুসই পৃথিবীতে প্রথম ব্যক্তি যিনি জনসংখ্যার বিষয়ে মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মনে এই বোধটি জাগিয়েছিলেন যে যদি জনসংখ্যা সীমিত করা না যায়, তাহলে নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ন করেও মানুষ ও দেশের উন্নতিবিধান করা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে যে বিরাট জনগোষ্ঠী জীবনযাত্রার মানকে নিম্নগামী করে—জনসংখ্যা কম থাকলে মানবজীবন উন্নতরূপ লাভ করে। কিন্তু নানা ধরনের পর্যবেক্ষণ ও আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে এভাবে জনসংখ্যার সম্পর্ক স্থাপন যুক্তিযুক্ত নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ, উদ্ভাবন, সামাজিক সংগঠন এবং জনসংখ্যার বিচলন পদ্ধতির উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভরশীল। এই বিষয়গুলির সমন্বিত কার্যাবলী জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যাকে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় শক্তি দান করে থাকে। জনসংখ্যা বিষয়ক ঘটনাটি শূন্যস্থানে বিচরণ করে না — সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পরিস্থিতিগত কার্য-কারণের সঙ্গে যুক্ত। অত্যন্ত সহজভাবে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করলে বলতে হয় যে জনসংখ্যার সমস্যা সমাধানে জন্মনিয়ন্ত্রণ যতটা প্রয়োজনীয় ঠিক ততটাই সম্পদ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক।

জনসংখ্যার বিশ্বাসকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে বয়ঃক্রম অনুযায়ী জনগণের পরিস্থিতি উল্লেখ প্রয়োজন। জন্মহার ও মৃত্যুহারের যথাক্রমে আনুপাতিক হারের মাধ্যমেই ঐ সমাজের গড় বয়স বৃদ্ধি পাবে অথবা হ্রাস পাবে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। যদি গড় বয়স বেড়ে যায় তাহলে একথা মানতে হবে যে সমাজে বেশি বয়স্ক মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বিপরীত অবস্থা ঘটলে ধরে নিতে হবে যে সমাজে কম বয়সী মানুষদের সংখ্যাধিক্য ঘটেছে। জনবিজ্ঞানীদের মতে কোন সমাজে জনগোষ্ঠীর মধ্যে বয়ঃক্রম ভিত্তিক বিন্যাসের অসামঞ্জস্য ঘটলে সেই বিশেষ ঘটনাটি সমাজ মানসিকতা পরিবর্তনে কার্যকরী হয়ে উঠে।

ক্রমাগত বেড়ে চলা জনসংখ্যার ধারাকে রোধ করতে গেলে জন্মনিয়ন্ত্রণই প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে সারা পৃথিবীতে গ্রহণ করা হয়ে চলেছে। কৃত্রিম পদ্ধতি প্রযোগ করে এই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে প্রারম্ভিক পর্যায়ে ধনী ও অগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্তরের মানুষ একে স্বাগত জানিয়েছে; যদিও পিছিয়ে পড়া দেশগুলির অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই পদ্ধতি এখনও বহুল প্রচারিত হয়নি। এই

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে একসময় জোর প্রতিবাদ দানা বেঁধে ছিল। জন্মনিয়ন্ত্রণকে শিশুহত্যা এবং গর্ভপাত রূপে চিহ্নিত করে একে একসময় অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে এর উপর বিশেষজ্ঞ এবং সমাজকর্মীদের বিভিন্ন বিশ্লেষণাত্মক অভিমত এই ধরনের হত্যাজনিত চিন্তাধারার সমাপ্তি ঘটায়। গর্ভনিরোধক পদ্ধতি জীবনের আগমনকে প্রতিহত করে — এটি কখনই গর্ভপাত অথবা হত্যা নয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে পরিবার নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে সমাজ মানসিকতার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক জীবনধারায় আধুনিক চিন্তাধারার ছোঁয়া লেগেছে এবং বন্ধ মূল্যবোধে গতিশীলতার সঞ্চার ঘটেছে। শিল্প বিপ্লবের বহুবিস্তৃত এবং সুগভীর প্রভাবের ফলে এই ধরনের পরিবর্তন এসেছে একথা অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের বিরাট পরিবর্তন সমাজদর্শনকেও পরিবর্তন করেছে। মহিলাদের উচ্চ সামাজিক স্থানপ্রাপ্তি এবং তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কম শিশু জন্মদানের একটি পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছে।

জনসংখ্যার প্রকৃতি পর্যালোচনায় জনবিজ্ঞান নামক যে বিদ্যাশাখাটি উদ্ভূত হয়েছে তার পরিধি বহু বিস্তৃত এবং তার পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার ধারাটি বহু বিষয়ক উপাদানে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ একজন জনবিজ্ঞানীকে নানা দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতেই হয় না — এই সকল দিকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আন্তঃনির্ভরশীলতার প্রতি আলোকসম্পাত করতে হয়। কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং হ্রাস ও তার অন্যান্য গতি-প্রকৃতি নানা ঘটনাবলীর উপর কেন্দ্রীভূত। মোটামুটিভাবে জনবিজ্ঞানকে দুটি প্রধান দিক থেকে অনুধাবন করা যায় — (১) **প্রযুক্তিগত জনবিজ্ঞান** অর্থাৎ এখানে জনগোষ্ঠীর আকৃতি ও গঠন বিবেচনা করে তার পাশাপাশি বৃদ্ধি, বিজ্ঞানের জন্য দায়ী বিভিন্ন ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা হয় এবং (২) **সামাজিক পর্যায়ভুক্ত জনবিজ্ঞান** অর্থাৎ জনসংখ্যার বিভিন্ন তথ্যাবলীকে বিভিন্ন সামাজিক, জীববিজ্ঞানীয় এবং বাস্তুসংস্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এরই সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে সমগ্র জনবিজ্ঞান আলোচনা ধারার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে এই বিজ্ঞান বিষয়টি দুটি মূল বিভাগে বিভক্ত করা যায় — (১) বৃহৎ জনবিজ্ঞান এবং (২) অণু জনবিজ্ঞান। প্রথমটি বৃহত্তর পরিকাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার নানা দিক অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতি, ধর্ম, শিক্ষা, পেশা, নগরায়ন, বাস্তুসংস্থানিক পরিবেশের পরিবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে আলোচিত হয় এবং দ্বিতীয়টি জনবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীকে ক্ষুদ্র একক সমূহের যেমন ব্যক্তি, পরিবার, ক্ষুদ্রগোষ্ঠী পশ্চাৎপটে আলোচনা করা হয়।

বর্তমানে সারা পৃথিবীব্যাপী জনবিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও আলোচনা ধারার মধ্যে সুষম দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণে সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘ (UNO) অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় এবং নানাধরনের তাত্ত্বিক আলোচনায় জনসংখ্যার বিভিন্ন তথ্যাবলী অতীব গুরুত্বপুর্ণ। জনসংখ্যার সমস্যা সমাজ জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। কাজেই সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হলে এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাগুলির মর্মমূলে পৌঁছতে গেলে সামাজিক জনবিজ্ঞানের প্রচলিত ধারায় অগ্রসর হওয়া জরুরী।

১ .১৩ অনুশীলনী

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন —

১. জনবিজ্ঞান ও ডেমোগ্রাফি বলতে কি বোঝেন?
২. সামাজিক জনবিজ্ঞান কি?
৩. সমাজবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে জনবিজ্ঞান আলোচনার কি কি মুখ্য বিষয় রয়েছে?
৪. সমাজবিজ্ঞানী কিংস্‌লে ডেভিস্ প্রদত্ত জনবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রটি কি?
৫. কি কি কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়?
৬. জনসংখ্যা বিষয়ে ম্যালথুস (Malthus) কি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন?
৭. জনবিজ্ঞানের বিশ্বরূপী সমতা রক্ষায় UNO কি ভূমিকা পালন করেছে?
৮. সুপ্রজনন বিদ্যা কি?

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন —

১. জনসংখ্যার পরিবর্তন কিভাবে ঘটে থাকে? এবিষয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির বিস্তারিত আলোচনা করুন।
২. ''পৃথিবীতে জন্মহার নিম্নগামী তবুও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথে'' — এই উক্তিটির যথাযোগ্যতা আলোচনা করুন।
৩. জীবনযাত্রার মান বলতে কি বোঝেন? কি কি বিষয়ের উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভরশীল?
৪. ''জনসংখ্যার বৃদ্ধি শূন্যস্থানের সমস্যা নয়'' — এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বক্তব্যটির পক্ষে মতামত দিন।
৫. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কি? এর পক্ষে ও বিপক্ষে কি কি মতবাদ সূচিত হয়েছিল? ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করুন।
৬. জনবিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে আর্ন্তবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়িত একথা বলা হয় কেন? জনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধিকে মূলতঃ কয়ভাগে ভাগ করা যায়? এদের বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১.১৪ উত্তর সংকেত

ক) ১. রাষ্ট্র পরিচালনে জনগোষ্ঠীর গঠন, মানুষের সংখ্যা এবং আনুসঙ্গিক তথ্যাবলীর প্রয়োজন হয়। কোন ভূখণ্ডের জনগণের সংখ্যা এবং তার হ্রাস ও বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহিত হয় ও বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সেই জনসংখ্যার বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তখনই তাকে বলা হয় ডেমোগ্রাফি বা জনবিজ্ঞান।

২. যে জনবিজ্ঞান মানব সমাজের বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার আচরণ এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত ও বিশ্লেষিত হয় তখনই তাকে সামাজিক জনবিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়।

৩. সমাজবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে জনবিজ্ঞান আলোচনায় প্রধানতঃ চারটি বিশিষ্ট পর্যায় রয়েছে — যেমন, (১) কোন একটি বা একাধিক ভূখণ্ডের মধ্যে বসবাসকারীদের সংখ্যা নির্ণয় (২) এই জনসংখ্যার তুলনামূলক হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ধারণ। (৩) এই হ্রাস-বৃদ্ধির পশ্চাতে কার্যকরী কারণগুলি নির্ণয় এবং (৪) এই সকল তথ্য সমূহের আলোচনার মাধ্যমে জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ গতি নির্ধারণ।

৪. প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কিংস্‌লে ডেভিস্ প্রদত্ত জনবিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্রটি হল—

$P_2=P_1 + (B-D) + (IM-OM)$

এই সাংকেতিক চিহ্নগুলির অর্থ নিম্নরূপ —

P_2 কোন এক বিশেষ সময়ের জনসংখ্যা; P_1 = ঐ একই জনগোষ্ঠীর পূর্বেকার সংখ্যা; B ও D ঐ জনগোষ্ঠীর যথাক্রমে জন্মহার ও মৃত্যুহার, IM = প্রব্রজনের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি; OM = অভিবাসনের ফলে সংখ্যা হ্রাস।

৫. জনসংখ্যার ঘনত্বের পশ্চাৎপটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কার্যকরী। জনবায়ু; ভূমির উর্বরতা; ধরাপৃষ্ঠ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নানা দিক — এগুলি মানুষের জীবন ও কর্মধারাকে সহজ করে দেয়। তার ফলে এগুলির আকর্ষণে এই সব অঞ্চলে মানুষ বসবাস করতে থাকে।

৬. প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ম্যালথুস জনসংখ্যা বিষয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা হল নিম্নরূপ—
জনসংখ্যাবৃদ্ধি সমাজজীবনে প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করে। তাঁর মানে জনসংখ্যা গুণোত্তর হারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু খাদ্য সামগ্রীর সমান্তর হারে বৃদ্ধি ঘটে। দীর্ঘদিন এইভাবে চলতে থাকলে খাদ্য সামগ্রীর চরম অভাব দেখা দেবে এবং ঐ পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভিক্ষের সূচনা করে। অপুষ্টি এবং অনাহারে মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

৭. জনবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করে চলেছে তার মধ্যে সমতা রক্ষিত না হলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলনামূলক বিচার বিঘ্নিত হবে। এমতাবস্থায় সংযুক্ত রাষ্ট্র সংঘ (United Nations Organisation) এই অধ্যয়ন ধারায় কতকগুলি লক্ষণাবলী স্থির করে দিয়েছেন। এগুলির মধ্যে উর্বরতা, মরণশীলতা, প্রব্রজন, জিনগত গঠন ইত্যাদির মত এগারটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

৮. সুপ্রজনন বিদ্যা জনসমাজে সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিদীপ্ত মানুষদের জন্ম প্রত্যাশায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অপরদিকে নিকৃষ্ট, রোগগ্রস্ত ও অস্বাভাবিকের নির্বীজনের মাধ্যমে অপনয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়। সুপ্রজনন বিদ্যার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল অযোগ্যদের জন্মগ্রহণ এবং পুরুষানুক্রমে সঞ্চালনের রাস্তা বন্ধ করা।

(খ) এখানে প্রশ্নগুলির উত্তর ১নং এককের মধ্যস্থ আলোচনা থেকে সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য অনুচ্ছেদের ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করে উত্তর সংকেত দেওয়া হয়েছে —

১. প্রথম এককের ১.৫.২নং অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ দিতে হবে।

২. এর উত্তর পাওয়া যাবে প্রথম এককের ১.৬.১ নং অনুচ্ছেদের মধ্যে।

৩. এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন প্রথম এককের ১.৭ নং অনুচ্ছেদের মধ্যে।

৪. এই প্রশ্নটির উত্তর দানের জন্য প্রথম এককটি ১.৭ অনুচ্ছেদটির শেষ প্যারাটি এবং ১.৮ অনুচ্ছেদটি পুরোটাই নিতে হবে।

৫. এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে এই এককের ১.৮.১-১.৮.২ এই দুটি অনুচ্ছেদের মাধ্যমে।

৬. এই প্রশ্নটির উত্তরদানের জন্য প্রথমে ১.৯ অনুচ্ছেদের ''জনসংখ্যাই এই জনবিজ্ঞান শাখাটির কেন্দ্রীয় রূপ'' থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি দিতে হবে। এবং সঙ্গে ১.৯.১ অনুচ্ছেদটি ও ১.১০ অনুচ্ছেদটিও যুক্ত হবে।

১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

Agarwala, S. N. — Age of Marriage in India, Allahabad, Kitabmahal, 1962

Ford, T. R. and F. Gordon — Social Demography, Englewood Cliffe, 1970

Guruswamy, S. — Social Demography : Processes and Perspectives, New Delhi, Sterling Publishers, 1997.

Houser, P. M. and D. O. Dudlay (Ed) — The Study of Population : an inventory and appraisal, Bombay, Asia Publishing House, 1961

Kingsley, Davis — Human Society, New York, Macmillan & Co., 1961

Mc Nicoll, Geoffery — Consequence of rapid population growth-an overview, Washington D.C., 1984

Ogburn, W. F. and N. F. Nimkoff — A Hand Book of Sociology, Euresia Publishing House, New Delhi, 1964

Prestor, Samual, H. — Demography/Meaning and Modelling population processes, Oxford, Blackwell, 2001

Singh, K. S. — People of India — An Introduction, Calcutta, Anthropological Survery of India, 1992

Weeks, J. R. — Population : An Introduction to Concepts and Issues, Belmont, Wordsworth Publishing Concern, 1985.

একক ২ ❑ জনবিজ্ঞানের তথ্যাবলীর উৎস

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ জনবিজ্ঞানের তথ্যবলীর উৎস

২.৩ জনগণনা পদ্ধতি

২.৪ পঞ্জীকরণ

২.৪ .১ পঞ্জীকরণ তথ্যাবলীর পদ্ধতি ও ব্যবহার

২.৫ নমুনা চয়ন পদ্ধতি

২.৫.১ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নমুনা চয়নের ব্যবহার

২.৬ জনসংখ্যা ও পরিসংখ্যান

২.৭ সারাংশ

২.৮ অনুশীলনী

২.৯ উত্তর সংকেত

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

আমরা পূর্বের এককে আলোচনা করেছি যে জনসংখ্যার বিন্যাস ধারা অধ্যয়ন রাষ্ট্র পরিচালনায় অপরিহার্য বিষয়। এই বিন্যাসধারা আলোচনায় যে বিশেষ বিজ্ঞান শাখাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাকেই আমরা জনবিজ্ঞান বলি। এই বিজ্ঞান শাখাটির বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জনসংখ্যার নানা ধরনের তথ্য সংগৃহিত হয়, তারপর সেই তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনসংখ্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এই এককটির উদ্দেশ্য হল যে মানব জীবনধারার কোন কোন ঘটনাবলী এই তথ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং সেই তথ্যাবলী কোন কোন উৎস থেকে সংগৃহীত হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোক সম্পাত। এই এককটি অধ্যয়নে সংশ্লিষ্ট পাঠক অতি সহজেই বুঝতে পারবেন যে জনসংখ্যা বিষয়ে আলোচনার জন্য কি কি ধরনের তথ্যাবলী

সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে মানুষের জীবনে দুই ধরনের ঘটনা রয়েছে — কতকগুলি তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং কতকগুলি হল ঘটনাকেন্দ্রিক। এ দুই ধরনের বিষয়কে অত্যন্ত সহজভাবে এই এককটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন কোন ঘটনাবলী আবার অপরিহার্য — অর্থাৎ মানবজীবনে নিয়মমাফিক এগুলি ঘটবেই। যেমন জন্ম ও মৃত্যু। এই কারণেই এদের বলা হয় **অপরিহার্য ঘটনা** বা vital events। এই অপরিহার্য ঘটনা দুটি হল জৈবিক — এবিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এই এককের মধ্যে দেখান হয়েছে যে কিভাবে দুটি জৈবিক ঘটনা সমগ্র মানবজীবন ধারাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে এবং এদের হিসাব নিকাশ রক্ষা করার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে সেকথাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই এককে জনসংখ্যা নির্ধারণ এবং তার বিচার ও বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তিনটি ব্যাপক পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। এগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির বিষয় উপস্থাপনের পর বর্তমানের চিন্তাধারার মধ্যে এগুলির কার্যকারিতা দেখান হয়েছে। জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের ব্যবহারের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনায় দেশের নানা কাজে এদের উপযোগিতার কথাও বিবৃত হয়েছে।

২.১ প্রস্তাবনা

যে কোন ধরনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক এবং নির্ভুল তথ্যের প্রয়োজন হয়। তথ্য যদি সঠিক না হয় এবং তথ্য সংগ্রহের মধ্যে যদি সামঞ্জস্যহীনতা থাকে তাহলে সমগ্র অধ্যয়ন প্রয়াসটি নিষ্ফল হবে। জনবিজ্ঞান যেহেতু মানব জীবন ও ঘটনাভিত্তিক আলোচনা কেন্দ্রীভূত সেইহেতু এই বিজ্ঞানে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ সঠিকভাবে সংগৃহিত হওয়া প্রয়োজন। এই এককটিতে জনগণনা পদ্ধতি, পঞ্জীকরণ পদ্ধতি, এবং নমুনা চয়ন পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি আলোচনাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমেই কোন একটি পদ্ধতির সংজ্ঞাদান খুবই সহজভাবে করার পর এর মাধ্যমে আহরিত জাগণনার তথ্যাবলীর গুরুত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে। তারপর উল্লেখিত হয়েছে ঐ বিশেষ পদ্ধতিটির প্রয়োগ কৌশল এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার কার্যকারিতা। বর্ণনামূলক সামাজিক তথ্যসমূহকে পরিসংখ্যানের সাহায্যে মূল্যায়ন করার উপযোগিতাও এখানে আলোচিত হয়েছে। জনসংখ্যার পরিসাংখক তথ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এবং কিভাবে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ও উন্নয়নের প্রয়োজনে কার্যকরীভাবে আরোপ করা যায় যে বিষয়ের আলোচনা এই এককটির অন্যতম প্রধান বিষয়।

২.২ জনবিজ্ঞানের তথ্যাবলীর উৎস

জনবিজ্ঞান মূলতঃ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানরাশির সমন্বিত প্রকাশ। আমরা বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে জেনেছি যে কেবলমাত্র জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করেই এই বিজ্ঞান বিকাশ লাভ করে না — জনগণের জীবনের বিভিন্ন পরিমণ্ডলের নানা সংশ্লিষ্ট তথ্য আহরণ করে সেই জনসংখ্যা ভিত্তিক আলোচনাকে সম্পূর্ণতা দান করা হয়। কাজেই জনবিজ্ঞানের আলোচনায় বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই তথ্যাবলীর বহু উৎস রয়েছে। জনবিজ্ঞানের সুষ্ঠু আলোচনার জন্য এই তথ্য-উৎস সমূহকে ভালভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

জনবিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ দু'ধরনের তথ্য ব্যবহার করেন — (১) **ব্যক্তি বিষয়ক সংবাদ** যেমন বয়স, লিঙ্গ, বাসস্থান সংক্রান্ত বিষয়, (২) **ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়**। জন্ম ও মৃত্যুহারের বিষয়গুলিকে **অপরিহার্য ঘটনা** (vital events) বলা হয়। জনবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। সাধারণতঃ সার্বিক পরিমণ্ডলটিকে অধ্যয়নের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় — **জনগণনা পদ্ধতি, পঞ্জীকরণ পদ্ধতি এবং নমুনাচয়ন পদ্ধতি**।

২.৩ জনগণনা পদ্ধতি

কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগণনাকেই বলা হয় জনগণনা বা আদমশুমারি। জাতি সংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী জনগণনা হল কোন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বা এলাকার সমগ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা গণনা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তথ্যাবলীর সংগ্রহ, সঙ্কলন এবং প্রকাশ করার সঠিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র যে সংখ্যা বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করে তাই নয়, জাতির অর্থনীতি বিষয়ে এই ঘটনাটি আলোক সম্পাত করে। জনগণনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে প্রতি দশবছর অন্তর এই লোকগণনা সংঘটিত হয়।

জনগণনা পরিচালনার কয়েকটি পন্থা রয়েছে। যেমন প্রত্যক্ষ গণনা, পরোক্ষ গণনা, বাস্তব গণনা এবং আইনানুগ গণনা। প্রত্যক্ষ গণনার সরকারি অফিসের জনগণকেরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেগুলি প্রাক-পরীক্ষিত অনুসূচি টেবিল/ছক এবং প্রশ্নমালার মধ্যে উপস্থাপন করে। পরোক্ষ গণনা হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে অনুসূচিগুলি ডাকযোগে বিভিন্ন সংবাদদাতাদের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে সংবাদদাতাদের সবিশেষ অনুরোধ জানান হয় যাতে তাঁরা ঐগুলি যথাযথভাবে পূরণ করে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। বাস্তব এবং আইনানুগ গণনা সকল সমাজেই অঞ্চল ভিত্তিকতায় রূপায়িত হয়। যখন কোন ব্যক্তি কোন এক বিশেষ স্থানে গণনাকালীন অবস্থান করে এবং তাকে গণনার মধ্যে আনা হয় তখন তাকে বলা হয় বাস্তব গণনা। আবার যখন কোন ব্যক্তিকে তার আপন বাসস্থানে গণনা করা হয় তখন তার নাম আইনানুগ গণনা।

জনগণনা একটি অতীব কার্যকরী পন্থা — জনসংখ্যা নির্ধারন, বিচার ও বিশ্লেষণে এর জুড়ি নেই। জনগণনা হল জাতীয় মজুত গণন পদ্ধতি; কোন এক দেশের একটি বিশেষ সময়ে জনগোষ্ঠীর প্রব্রজন, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা তথ্য আহরিত হয়। সমগ্র বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। জনগণনার সময় ব্যক্তি অথবা পরিবারকে এক একটি একক হিসাবে ধরা হয় এবং সেই সময় প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যবলী সংগ্রহে সমস্তরকম প্রয়াস গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে লক্ষ্য রাখতে হয় যে জনগণনা কার্যসূচি যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সমাপ্ত হয়। যে সকল অনুসূচি বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে জনগণনাকারীদের সাহায্যে পূরণ করা হয় সেগুলি সংগৃহিত, পরীক্ষিত এবং পরিসাংখ্যিক ভাবে বিশ্লেষিত হয়। এর পর তথ্যাবলীর প্রয়োজনীয় যথার্থতা নিরূপণের পর আদমশুমারি তথ্য হিসেবে প্রকাশিত হয়। জনগণনা একটি বিশাল দায়িত্বপূর্ণ কর্মধারা — এর ব্যাপ্তি এবং গভীরতাও অধিক। এমতাবস্থায় এই কাজের প্রতিটি

স্তরেই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। এর প্রাথমিক ধাপ যেমন এলাকার নির্বাচন, ঐ এলাকার বাসগৃহ সমূহের অগ্রিম তালিকা প্রণয়ন, গণনাকারীদের প্রশিক্ষণ, যথাযথভাবে অনুসূচি এবং তথ্যসংগ্রহের বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দান করলে জনগণনার কাজটি ফলপ্রসূ হয়ে উঠে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে জনগণনা এবং পঞ্জীকরণ কখনও কখনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। প্রায়ই দেখা যায় যে পঞ্জীকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংখ্যা জনগণনার সংখ্যা হিসেবে গৃহিত হয়েছে। জনগণনার সময় মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অপরদিকে পঞ্জীকরণে কেবলমাত্র নামগুলিই পঞ্জীকৃত হয়। কাজেই শেষোক্ত ক্ষেত্রে কোন ধরনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। এছাড়াও আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে পঞ্জীকরণের কোন সীমায়িত সময় নেই — বছরের সকল সময়েই এই কাজ চলতে থাকে। জনগণনা কিন্তু এভাবে পরিচালিত হয় না। এই কাজ বিশেষভাবে নির্ধারিত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালিত হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণনার কাজ শেষ করতে হয়। আরও দেখা যায় যে জনগণনার কাজ নিয়মিত বিরামের পর পুনরাবৃত্তি করা হয়। কিন্তু পঞ্জীকরণ কাজ ঘটনার অত্যাবশ্যকতা অনুসারে পরিচালিত হয় এবং এটি একটি অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা হিসেবে পরিগণিত। যাইহোক জনগণনার পরিমণ্ডলটি জনবিজ্ঞান অনুসন্ধানের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্য উৎস হিসেবে স্বীকৃত হলেও এর কিছু ন্যূনতা লক্ষিত হয়। জনগণনা কার্যসূচিতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি গণনার অন্তর্ভুক্তি লাভে বঞ্চিত হয়। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই আবার একাধিকবার গণনার মধ্যে এসে যায়। কাজেই জনগণনার উৎসটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর ব্যবহারের সময় আলোচ্য বিষয়গুলিকে মনে রাখতে হবে।

২.৪ পঞ্জীকরণ

জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন তথ্যাবলী মানবজীবনের বিভিন্ন সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সহায়তা করে। মানব সমাজে নিম্নবর্ণিত জনবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাবলী পঞ্জীকরণ করা হয়ে থাকে — (১) জন্ম (২) মৃত্যু (৩) বিবাহ (৪) বিবাহ বিচ্ছেদ (৫) পৃথগ্‌বাস (৬) পুনর্বিবাহ ইত্যাদি।

মানবসমাজে এই পঞ্জীকরণ প্রথা দীর্ঘ দিনের তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রথাটি বিস্তারিতভাবে প্রচলিত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের ধর্মযাজক সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট ধর্ম পরিমণ্ডলের মানুষদের বিবাহ, মৃত্যু, ধর্মান্তর ইত্যাদির তালিকা প্রণয়ন করতেন। তার পূর্বে ফ্রান্সে প্লেগরোগে মৃত ব্যক্তিদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য মরণশীলতা আইন প্রচলিত হয়েছিল। এগুলি পঞ্জীকরণ বিষয়ে নিঃসন্দেহে একটি প্রচেষ্টা ছিল ঠিকই তবে এর মধ্যে প্রণালীবদ্ধতা ছিল না। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্‌এ সর্বপ্রথম পৌর পঞ্জীকরণ পদ্ধতি চালু হয়। সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টা থেকে এই পদ্ধতির ধীর বিকাশ হতে থাকে। পঞ্জীকরণ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম বিষয়ক পঞ্জীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয় এবং এবিষয়ে কোন ধরনের সহযোগিতার অভাব ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আইনানুগ দন্ডদানের ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে মৃত-জাত শিশুদের পঞ্জীকরণ আবশ্যিক করা হয়। অপরিহার্য পরিসংখ্যান পঞ্জীকরণ বিষয়ে সুইডেন পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে সুইডেন দেশের জনসংখ্যার লেখ্যসারণী রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কাজেই এই সময় থেকেই নিয়মিতভাবে জনগণের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহিত অবস্থা ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহের

জন্য অনুসূচি প্রস্তুত হতে থাকে। উল্লেখ করার বিষয় যে এই সময় থেকেই বিভিন্ন দিনের প্রণালীবদ্ধ অনুসূচি তৈরি হতে থাকে এবং এগুলিই পরবর্তীকালের উন্নত পদ্ধতির অগ্রিম সার্থক প্রয়াস বলেই বিবেচিত হয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে পঞ্জীকরণের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পৃথকীকরণ ইত্যাদি ঘটনাগুলি অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছে। পঞ্জীকরণের আইনানুগ তাৎপর্য রয়েছে কারণ এই বিশেষ পদ্ধতিটি দেশের নাগরিকত্ব বিষয়ে প্রভূত প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। বিবাহগত অবস্থা, উত্তরাধিকারিত্ব, বিভিন্ন সামাজিক বিবাদের মীমাংসা, বিশেষভাবে যেগুলি জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে।

২.৪.১ পঞ্জীকরণ তথ্যাবলীর পদ্ধতি ব্যবহার

জনবিজ্ঞানীরা পঞ্জীকরণ তথ্যাবলী অপ্রধান তথ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। এর তিনটি প্রধান উৎস রয়েছে—

১. অপরিহার্য পঞ্জীকরণ

২. জনসংখ্যার পঞ্জী

৩. সরকারী নথি

প্রথমেই অপরিহার্য পঞ্জীকরণ বিষয়ে আলোচনা করা যাক। প্রত্যেক দেশেই তার মধ্যস্থিত নাগরিকদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি তথ্যাবলীর পঞ্জীকরণকে বাধ্যতামূলক করেছে। এই ধরনের তথ্যাবলীর মাধ্যমে বেশ কয়েক বছর পর পর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত এই সকল ঘটনাগুলির তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হয়। একে বলা হয় তুলনামূলক দ্বিতীয় বিশ্লেষণ—এটি উর্বরতা, মরণশীলতা ইত্যাদির তথ্য আহরণে সহায়তা করে। তবে পঞ্জীকৃত সংখ্যা বহুসময় অসমাপ্ত থেকে যায় কারণ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পঞ্জীকরণ বিষয়ে জনসাধারণের উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যায় না। ফলে অনেক ঘটনাই অপঞ্জীকৃতই থেকে যায়। আমাদের দেশে যে ধরণের উর্বরতা তথ্য সংগৃহিত হয় তা আসল ঘটনার ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ। এমতাবস্থায় এই ধরনের অসম্পূর্ণ পঞ্জীকরণ তথ্য জন্মহারে দীর্ঘমেয়াদী গতির বিশ্লেষণ বিশ্বাসযোগ্য বলে স্বীকৃত হয় না। যেখানে জন্মবিষয়ক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ সেখানেই দেখা গিয়েছে যে বয়স এবং পেশার নির্ভুল তথ্যের অভাব। পঞ্জীকরণ পদ্ধতি নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। এগুলি হল—

ক. জন্ম প্রমাণপত্র ঃ

(১) নাম (২) পিতার নাম (৩) মাতার বয়স (৪) বৈধতা (৫) জন্মক্রম (৬) স্বামীর পেশা (৭) জন্মস্থান (৮) বাসস্থান।

খ. মৃত্যু প্রমাণপত্র ঃ

(১) মৃতের নাম (২) লিঙ্গ (৩) জাতি/সম্প্রদায় (৪) মৃতের মৃত্যুকালীন বয়স (৫) মৃত্যুর স্থান (৬) পেশা (৭) স্থায়ী বাসস্থান (৮) জন্মস্থান (৯) মৃত্যুর কারণ।

গ. বিবাহ প্রমাণপত্র ঃ

(১) বধুর নাম (২) পিতার নাম (৩) বরের নাম (৪) স্বামী/স্ত্রীর নাম (৫) জাতি/সম্প্রদায় (৬) বধুর বয়স (৭) বধুর জন্মস্থান (৮) বরের জন্মস্থান (৯) বরের পেশা।

নিবন্ধকের কার্যালয়ে সঠিক ঘটনাগুলির সরবরাহের উপরই পঞ্জীকরণ তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভরশীল। সাধারণতঃ নির্ভুল এবং ঘটনাভিত্তিক তথ্যাবলী পাওয়া যায় কারণ এই সকল তথ্যের প্রকৃতি সরল ও এগুলিতে গোপনীয়তার বিষয় নেই। কিন্তু অন্যের মারফৎ অর্থাৎ পরোক্ষভাবে যখন এই সকল বিষয়ের তথ্য সংগৃহিত হয় তখন সত্যি সত্যিই সমগ্র ঘটনাটি জটিল আকার ধারণ করে। এই ধরনের তথ্যাবলী কখনই সত্যের প্রকাশ করতে পারে না — কারণ এগুলি সবই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অনেক দেশে ব্যক্তিগতভাবে সরকার নিযুক্ত নিবন্ধকের নিকট প্রয়োজনীয় অপরিহার্য ঘটনাবলীর তথ্য জমা না দিলে নাগরিকত্বের প্রমানপত্র পেতে অসুবিধা হয়। এছাড়াও চাকুরীতে নিযুক্তি এবং সামাজিক সুরক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রমান পত্রের প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতের পৌর পঞ্জীয়ন পদ্ধতি যদিও বেশ প্রাচীন তাহলেও এ বিষয়ের কার্যকারিতা খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ভারতের জন্ম ও মৃত্যু হারের উপর যে পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ রয়েছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির পূর্ণাঙ্গ চিত্র দান করতে পারে না। এই সব বিষয় চিন্তা করে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত মতামত গ্রহণ করা হয় এবং তারই উপর ভিত্তি করে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম এবং মৃত্যু পঞ্জীয়ন আইন প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেখা গিয়েছে যে অপরিহার্য পঞ্জীকরণ বিষয়টি এখানে খুবই মন্থর গতিতে চলেছে। এর প্রধান কারণ হল যে প্রায় চার-পঞ্চমাংশ গ্রামীন অধিবাসী বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করে এবং এদের মধ্যে এই অপরিহার্য ঘটনাবলীর পঞ্জীকরণ বিষয়ে কোন সচেতনতা নেই। অশিক্ষা এবং বহু সময় অন্ধবিশ্বাস এই সকল জনগোষ্ঠীকে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে বাধাদান করে। কাজেই এই ধরনের আইন জননীতির সহায়ক হতে পারে না — কারণ এর মাধ্যমে জনসংখ্যার স্বল্পকালীন বৃদ্ধি নির্ণয়ের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। অতএব এই ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়। এগুলির মধ্যে রয়েছে জন্ম ও মৃত্যুর পঞ্জীকরণের অতীব সহজ পদ্ধতি এবং জনমনে এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সার্বিক প্রচার।

এরপর আলোচিত হচ্ছে জনসংখ্যার পঞ্জী। পৃথিবীর অনেক দেশ স্থায়ী জনসংখ্যার পঞ্জী রক্ষা করে। এর মধ্যে জনসংখ্যা ভিত্তিক যে সকল তথ্য থাকে, সেগুলি দেশের প্রশাসন পরিচালনে খুবই কার্যকরী হয়ে উঠে। বহু আইনানুগ ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে এই ধরনের সংরক্ষিত তথ্যের প্রয়োজনও বহু সময় দেখা যায়। এই তথ্যাবলীর সাহায্যে জনগণনার প্রাপ্ত জনসংখ্যার বিভিন্ন পরিসাংখ্যিক ফলাফলকে যাচাই করে নেওয়া যায়। এই জনসংখ্যা পঞ্জীর সাহায্যে জনসংখ্যার গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়।

এর পর আসে সরকারি নথি। বহু সরকারি কার্যালয় তাদের প্রয়োজনানুযায়ী জনগণের বিভিন্ন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে। এই সকল তথ্য জনবিজ্ঞানের অপ্রধান তথ্য হিসেবে কাজে লাগে। কাজেই এগুলিও জনবিজ্ঞানের সংবাদ সংগ্রহের বিশেষ উৎস হিসেবে স্বীকৃত। জীবনবীমা নিগম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণের জন্ম, মৃত্যু এবং জনসংখ্যার গতিবিধি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে। বহু দেশের সরকার নানা ধরনের সরকারি কাজে সাহায্যের জন্য জনগোষ্ঠীর জীবনের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা যেমন বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়সের অবসরকালীন ভাতা, জীবনবীমা ইত্যাদির জন্য জনসংখ্যার তথ্যাবলীর প্রয়োজন হয়। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন জনগণকে রেশন দানের জন্য তালিকা প্রস্তুত করণ, ভোটদাতাদের তালিকা তৈরি, আয়কর দাতাদের তালিকা তৈরি, টেলিফোন গ্রাহকদের তালিকা তৈরি

ইত্যাদি। এইসব তালিকাতে নানা ধরনের আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী পাওয়া যায় যা জনবিজ্ঞানের নানা সংবাদ সংগ্রহের অপ্রধান উৎস হিসেবে স্বীকৃত। এই সকল তথ্যাবলীর যদিও সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং জনবিজ্ঞান গবেষণায় এই তথ্যাবলী সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করতে পারে না তাহলেও এর বিশেষ এক উপযোগিতা রয়েছে। বিশিষ্ট ও বহুবিস্তৃত সমীক্ষাকার্যের এই তালিকাগুলি নমুনা চয়নে প্রাথমিক সাহায্য করতে পারে। জনগণনার সমীক্ষা কার্যে অক্রম নমুনাচয়নের মাধ্যমে অধ্যয়ন বিষয় স্থির করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। প্রব্রজিত গোষ্ঠী, বিবাহ বিচ্ছিন্ন মানুষ, বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ ইত্যাদির উপর গবেষণা পরিচালনা করার প্রয়োজন হলে বিভিন্ন সরকারী নথিপত্রের মধ্যে তাদের প্রাথমিক সন্ধান পাওয়া যাবে যেগুলি নমুনা হিসেবে অতি সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রশাসনের উদ্দেশ্যে যে সকল তথ্য রক্ষিত হয় সেগুলি জনগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক বাসস্থান, ঠিকানা ইত্যাদির তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ অথবা প্রতিনিধিমূলক সংবাদ সরবরাহ করে।

২.৫ নমুনাচয়ন পদ্ধতি

নমুনা চয়নের মাধ্যমে সমীক্ষাকার্য জনবিজ্ঞান বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের একটি অতিপ্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত। একটি বিশাল ও বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে সীমিত নমুনা চয়নের মাধ্যমে যে সমীক্ষাকার্য পরিচালিত হয় তারই নাম নমুনাচয়ন পদ্ধতি। এইভাবে নমুনা চয়ন করার পর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সমীক্ষাকার্যে পারদর্শী গণনাকারীদের নিয়োগ করা হয়। তাঁরা নির্দেশিত পথে তথ্য সংগ্রহ করে চলেন। সেই সব সংগৃহিত তথ্য তালিকাবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করার পর প্রকাশ করা হয়। নমুনা চয়ন পদ্ধতির সুবিধা হল যে এটি খুব ত্বরিত পদ্ধতি এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ নমুনা চয়ন ভিত্তিক সমীক্ষা সময় সময় করা যেতে পারে এবং এই পদ্ধতির বিভিন্ন প্রথাবলী নানা ধরনের হয়ে থাকে। নমুনাচয়ন পদ্ধতিতে কিছু পরিসাংখ্যিক ত্রুটি থেকে যায় ঠিকই তবে নমুনাটির আকার যাচাই করার মাধ্যমে সেই ত্রুটি কিছুটা প্রশমিত হয়। জনবিজ্ঞানে যে নমুনাচয়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেটি তিনটি পশ্চাৎপট উন্মোচন করে—

১. সম্পূর্ণ গণনা ব্যতিত স্বাধীনভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এই নমুনা চয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে যে সমীক্ষা পরিচালিত হল এবং তার সাহায্যে যে ফলাফল পাওয়া গেল তাকে সমগ্র দেশের কর্মকাণ্ডে লাগান যেতে পারে। এর মধ্যে দিয়েই যুক্তিযুক্তভাবে নির্ভূল মূল্যায়ন করা যায়। তবে নমুনাচয়ন কখনই সম্পূর্ণ গণনার পরিপূরক হতে পারে না। যদি জনগণনা ভিত্তিক পঞ্জীকরণ করতে হয় তাহলে প্রতিটি ব্যক্তিকেই এতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে—জনগোষ্ঠীর একটি অংশের সমীক্ষা করলে হবে না।

২. পূর্বে অনুষ্ঠিত সম্পূর্ণ জনগণনার ফলাফলকে আধুনিক করে তুলতে নমুনাচয়ন পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা যায়।

৩. চলতি জনগণনার ফলাফলের পরিপূরক অংশ হিসেবে নমুনাচয়ন ব্যবহৃত হয় এবং সংখ্যার যথার্থতা নিরূপণ এইভাবেই হতে পারে।

২.৫.১ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নমুনাচয়নের ব্যবহার

সম্পূর্ণ জনগণনার কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন স্তরে যেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গণনা, তালিকবদ্ধকরণ, বিন্যাসকরণ ইত্যাদিতে নমুনাচয়নের বিভিন্ন উদাহরণ ব্যবহৃত হয়। জনগণনার প্রশ্নাবলী প্রাক্‌পরীক্ষিত এবং এগুলির যোগ্যতা নমুনা চয়ন পদ্ধতির মাধ্যমেই পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত সংবাদ গ্রহণে অনুসূচিগুলি এমনভাবে তৈরি হবে যে কিছু প্রশ্ন প্রত্যেককেই করতে হবে এবং অন্যান্যগুলি নমুনা চয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদদাতাদেরই জিজ্ঞেস করতে হবে। এই পদ্ধতি জনগণনাকে নমুনা চয়নের উপযোগী পরিকাঠামো দান করবে। এইভাবে জনসাধারণের অসুবিধা কিছুটা লাঘব করা যায়। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই অনুসূচির মধ্যে আরও প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করে তালিকাবদ্ধকরণের পরিশ্রম লাঘব করা যায়। সম্পূর্ণ ও বহুবিস্তৃত অনুসূচি থেকে নমুনা আকারের তালিকাভুক্তি জনগণনার ফলাফলকে বহু পূর্বেই প্রকাশ করা যায়। অন্য কোন পদ্ধতির সাহায্যে এটি সম্ভব হয় না। প্রকল্প রচনা এবং গবেষণার জন্য জরুরীভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের জন্য নমুনা চয়ন পদ্ধতি বিশেষভাবে সাহায্য করে। জনগণনার তথ্য সমূহের যথার্থ নিরূপণে নমুনাচয়ন ব্যবহার করা যেতে পারে। অপরিহার্য পঞ্জীতে নথিভুক্ত জনগণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উৎস সমূহকে নমুনাচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

সাধারনভাবে নমুনা পদ্ধতিতে প্রাপ্ত জনগণনার পরিসংখ্যানে বর্গীকরণ এবং নমুনা চয়নে ত্রুটি থেকে যায়। তথ্যাবলীর চালনা এবং ত্রুটি মুক্তির জন্য এই পদ্ধতি সকল সময়েই অভিজ্ঞ এবং যোগ্য ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করে। অনভিজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তিরা এই কাজে ভারপ্রাপ্ত হলে সমস্ত প্রয়াসটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে উঠে। সঙ্গতি এবং কর্মীর অভাব ঘটলে সমগ্র বিষয়টি আরও সমস্যাপূর্ণ হয়ে উঠে। নমুনা কিভাবে বাছাই করা হবে সেই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে যদি পক্ষপাতিত্ব থাকে তাহলে যে তথ্য এর মাধ্যমে সংগৃহিত হবে তা সমগ্র জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করবে না। সংবাদদাতাদের অসহযোগ বিষয়টিকে আরও সমস্যাপূর্ণ করে তুলবে। এই কারণেই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই পদ্ধতিটি যেন খুবই যত্নসহকারে এবং সচেতনতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়।

২.৬ জনসংখ্যা ও পরিসংখ্যান

জনসংখ্যার পারিসাংখ্যিক দিকটার গুরুত্ব রয়েছে। এই পারিসাংখ্যিক দিকটির সামাজিক পরিমণ্ডল বিদ্যমান। জনসংখ্যার পারিসাংখ্যিক বিষয়টির বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে এবং একে নানাভাবে জনবিজ্ঞানের গবেষণা ও আলোচনায় কাজে লাগানো যায়। প্রথমতঃ এর সামাজিক সুবিধার দিকটির কথাই ধরা যাক। এই পরিমণ্ডল থেকে আমরা শিশু বিবাহ, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ এবং অন্যান্য সামাজিক দুর্ঘটনা এবং ক্ষতিকারক বিষয়গুলির কথা জানতে পারি। শিশু মৃত্যু হার, পুরুষ ও মহিলাদের মৃত্যুর কারণ বিশেষ করে যেগুলি পারিবারিক অশান্তি, প্রেমের ব্যর্থতা ইত্যাদির জন্য ঘটে থাকে তার বিষয় জানা যায়। কোন ভাষার অগ্রগতি এবং ভাষা সম্পর্কে মানুষের ব্যবহার পদ্ধতি এর মধ্যে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন সামাজিক পরিকাঠামো যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কলেজ, সিনেমা হল, সাফাই ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

রাজনৈতিক সুবিধার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে গণতান্ত্রিক দেশে আমরা ভোটদাতাদের সংখ্যা জানতে পারি এবং সেই ভাবেই প্রয়োজনীয় ভোটপত্র তৈরি করা যায়। ভোটদাতাদের জন্য কত ভোটকেন্দ্র প্রয়োজন হবে সে বিষয়টিও এর মাধ্যমে জানতে পারা যায়। জনসংখ্যার পারিসাংখ্যিক দিক জানা অত্যাবশ্যক এই কারণে যে সঠিক সংখ্যা জানা গেলে সেই অনুপাতে লোকসভা এবং বিধানসভায় কত আসনের প্রয়োজন সে কথা আমরা বলতে পারি। লোকসংখ্যার পরিসংখ্যানই প্রয়োজনানুযায়ী আসনসংখ্যা কম-বেশি করতে পারে। আবার তপসিলী জাতি ও তফসিলী আদিবাসীদের সঠিক সংখ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসন সংরক্ষণের কাজে সহায়ক হবে। জনসংখ্যার পরিসংখ্যানই নির্বাচনকালে ভোট কেন্দ্রগুলির আকৃতি এবং প্রকৃতি উপলব্ধিতে সাহায্য করে। জনসংখ্যা অনুযায়ী এই কেন্দ্রগুলিকে ছোট-বড় করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক সুবিধাগুলির মধ্যে প্রধান হল শিল্প ক্ষেত্রে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের ব্যাপক ব্যবহার। কোন শিল্প ক্ষেত্রের অগ্রগতির বিষয়টি জনসংখ্যার পরিসংখ্যান সম্প্রচার করে। জনসংখ্যার প্রকৃতি অনুযায়ী জনগণের জীবনধারনের মান জানা যায়। এটি জাতীয় উপার্জন বিষয়েও তথ্য সরবরাহ করে। দেশের সর্বত্র কখনও একই রূপ উন্নয়ন ঘটে না। উপার্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা লক্ষিত হয়। এইভাবে ভারসাম্যহীনতার উপর আলোকসম্পাত করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এই বৈসাদৃশ্যকে নিরসনের প্রচেষ্টা করা যায়। জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে দেশের মানুষের উপভোগ প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে সেই প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। দেশের বাজেট ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য জনসংখ্যার হিসাব এবং তাদের প্রকৃত পরিস্থিতির বিষয় অবগত হওয়া জরুরী। জনসংখ্যা বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যানবাহন ইত্যাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা যায়। ঘন জনবসতি অঞ্চলে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন। জনসংখ্যার পারিসাংখ্যিক তথ্য এবিষয়ে বিশেষ সহায়কের কাজ করে। জনসাধারণের কর্ম নিযুক্তি এবং শ্রমিক নীতি ব্যবস্থা ও প্রণয়নেও এর প্রয়োজন অপরিহার্য। জনসংখ্যার বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে জনঘনত্ব মাপ করা যায়। এই ধরনের এলাকাগুলিতে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। কাজেই এগুলির প্রতি সরকারের দৃষ্টি দান অতীব প্রয়োজনীয়। জনসংখ্যার তথ্য বিভিন্ন ধরনের কর আদায়ের তালিকা তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।

মানব সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই পরিসংখ্যান প্রয়োজনীয়। পরিসংখ্যান এবং জনসংখ্যার পরিচিতি যে কোন ধরনের সামাজিক উন্নয়নের কাজে অপরিহার্য। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কর্মনিয়োগ কেন্দ্র, শিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত জনসংখ্যা এবং আনুসঙ্গিক বিষয় সমূহের তথ্য জানা আবশ্যিক। তা না হলে দেশের বিভিন্ন স্থানের জনতার প্রয়োজনানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা যাবে না। খাদ্য পরিস্থিতি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিস্থিতি এবং বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের ধারণা না থাকলে খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ অসুবিধা জনক হয়ে উঠে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। সেই সকল সমস্যার পরিস্থিতিকে প্রতিহত করতে না পারলে দেশের মানুষ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সরকারি পর্যায়ে এই সকল সমস্যাগুলির সমাধানের প্রচেষ্টা গৃহিত হয়ে থাকে এবং এই কাজ তখনই সম্ভব হবে যখন জনসংখ্যা বিষয়ক নানা তথ্য সঠিকভাবে পাওয়া যাবে। অন্যথায় সমগ্র প্রচেষ্টাটি ফলপ্রসূ হবে না। জনগোষ্ঠীর পারিসাংখ্যিক বিষয়সমূহ এই সকল তথ্য সমূহের উৎস হিসেবে কাজ

করে। এছাড়াও তথ্যসংগ্রহের এই উৎসটি সমাজতান্ত্রিক, অর্থনীতিবিদ্, বণিকগোষ্ঠী, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা তাদের আপন আপন পরিমণ্ডলে ব্যবহার করে থাকেন। এই সকল ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য যাইই থাকুক না কেন প্রত্যেকেরই জনসংখ্যার পারিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এছাড়াও লক্ষ্য করার বিষয় যে জনসংখ্যার সঙ্গে পণ্যদ্রব্যের, জনসংখ্যার সঙ্গে স্থানীয় ব্যবহারকারী এবং রপ্তানীকারকদের নিকট সম্পর্ক রয়েছে। এমনকি জীবনবীমা কোম্পানীগুলি তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে একদিকে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যার হিসাব রাখে, অপরদিকে মানুষের মৃত্যু হারটি অনুধাবন করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে জনজীবনের বিভিন্ন কর্ম ও চিন্তাধারায় জনসংখ্যার বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রয়োজনীয় উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই সকল উৎস থেকেই সংগৃহিত হয় নানা ধরনের প্রয়োজনীয় তথ্য যার সাহায্যে জনবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্র মূল্যায়িত হয়।

ভারতের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (NSS) মাধ্যমে যে বৃহদাকার অনুসন্ধান প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে তার মধ্যে থেকে অপরিহার্য হার (vital rate) পাওয়া যায়। যদিও এই জাতীয় সমীক্ষা খুব সাবধানতা এবং যত্নের সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল তাহলেও এর মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্যাবলী চয়ন বিহীনতা সম্পর্কিত ত্রুটিযুক্ত হয়েছিল। এই কারণের জন্য ১৯৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মহা নিবন্ধক যে নমুনা নিবন্ধন প্রথাটি প্রচলন করেছিলেন সেটিই জনবিজ্ঞান আলোচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য অন্যতম প্রধান উৎস বলেই বিবেচিত হয়। এই উৎসের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত সকল তথ্য সরাসরি নমুনা ক্ষেত্র থেকেই সংগৃহিত হয়েছে। নমুনা পঞ্জীকরণ পরিকল্পনা দ্বৈত লেখ্য সূত্রর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখানে কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের অপরিহার্য ঘটনাসমূহের তথ্য সংগ্রহে দুটি স্বাধীন উৎসের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। দুটি উৎসের মাধ্যমে সংগৃহিত অপরিহার্য ঘটনাবলীর মধ্যস্থিত বিষয়ের সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য এবং আংশিক সাদৃশ্য যাচাই করা হয়। এই দুটি লেখ্য অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং ভূতাপেক্ষ সমীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। একেই বলা হয় **দ্বৈত লেখ্য পদ্ধতি** (Dual Record System)। যখন দুটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত তথ্য সংগ্রহের উপ-পদ্ধতি জনসংখ্যার পরিবর্তনের সাপেক্ষে ব্যবহৃত হয় তখন তার নাম হল দ্বৈত লেখ্য পদ্ধতি।

দ্বৈত লেখ্য পদ্ধতির পরিকল্পনা একটি উপযুক্ত সংখ্যক নমুনা ভৌগোলিক অঞ্চল অথবা সংলগ্ন বসতি গুচ্ছের নক্শা ও মানচিত্র অঙ্কনের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। কোন দেশে এই বসতিগুচ্ছের আকার এবং তাদের সংখ্যা এবং বিস্তৃতি পদ্ধতির উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল।

২.৭ সারাংশ

জনবিজ্ঞান আলোচনায় মানবজীবনের বহু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ক্ষেত্র থেকে তথ্য আহরণ করতে হয়। জনসংখ্যা কেবলমাত্র সংখ্যাভিত্তিকতায় রূপলাভ করে না। জনসংখ্যার সার্বিক পরিচয় পেতে গেলে জনগণের জীবনের নানা পরিমণ্ডলে বিচরণ করতে হবে। তবে তথ্য আহরণের জন্য কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় এবং ঘটনাকে নির্ভর করতে হয় কারণ এগুলির মধ্যে জনগণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর থাকে। এই তথ্য আহরণের মাধ্যমগুলিকে দুটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা হয় — (১) **ব্যক্তি বিষয়ক সংবাদ,** এবং (২) **ঘটনা সম্পর্কিত বিষয়**। প্রথমটিতে বয়স, লিঙ্গ বাসস্থান বিষয়ক তথ্যাবলী অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টিতে রয়েছে জন্ম এবং মৃত্যু হারের মত অপরিহার্য ঘটনা (vital events)।

জনবিজ্ঞানে ব্যবহৃত তথ্যাবলী সংগ্রহে নানাধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। তবে সমগ্র পরিমণ্ডলটিকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা যায় যেমন — জনগণনা পদ্ধতি, পঞ্জীকরণ পদ্ধতি এবং নমুনাচয়ন পদ্ধতি। যখন কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে কোন জনগোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে গণনা করা হয় তখনই তাকে আমরা বলি জনগণনা। তবে জনগণনা বললেও এটি কেবলমাত্র মানুষের সংখ্যা গণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জনগণনার সার্বজনীন সংজ্ঞা হল যখন কোন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে কোন অঞ্চলের সমগ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগণনা এবং তার সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। কোন দেশের জনগণনা একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জনগণনা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে করা হয়ে থাকে। আবার কখনও রয়েছে বাস্তব এবং আইনানুগ। তবে পদ্ধতি যাইই হোক না কেন প্রতিটিই প্রযুক্তিগত কৌশলে পরিশীলিত। জনসংখ্যা নির্ধারণ এবং তার প্রকৃতি পর্যালোচনায় জনগণনা একটি অদ্বিতীয় পন্থা। জনগণনা সামগ্রিকভাবে সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি সংস্থা। জনগণনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রতিটি মানুষকে একক হিসেবে ধরা হয় এবং প্রতিটি এককের সম্পর্কে যেন প্রাথমিক তথ্যাবলী আহরণ করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সমগ্র দেশের মানুষের উপর রচিত এই জনগণনার পরিকল্পনা রূপায়ন খুব সহজ কাজ নয়। তাছাড়া সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যেই একে সম্পূর্ণ করতে হবে। এমতাবস্থায় নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আরোপিত হয় এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনগণনাকারী কর্মীদের প্রকৃত প্রশিক্ষণ দান। এই দুটি বিষয় সঠিকভাবে উপস্থাপিত হলে জনগণনার মত একটি জটিল কর্মধারা সার্থকতায় পর্যবসিত হবে।

জনগণনা ব্যতিত আর কিছু পদ্ধতি রয়েছে যার মধ্যে মানুষ সম্পর্কে তথ্যাবলী পাওয়া যায়। তবে এগুলি জনগণনার মত এতটা বিজ্ঞানভিত্তিক নয় — তাছাড়া এগুলির কোনটিও একটি বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংঘটিত হয় না। তাছাড়া জনগণনার সময় সংশ্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করে তথ্য সংগ্রহ আবশ্যিক। জনগণনার মত এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ যে একেবারেই ত্রুটিহীন নয় একথা বোধ হয় বলা সম্ভব হবে না। বহু ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে সময়ভিত্তিক গণনা কার্যধারায় বহু মানুষ অন্তর্ভুক্তি লাভ করতে পারেনি। আবার কেউ কেউ একাধিকবার গণনার মধ্যে এসে গেছেন।

পঞ্জীকরণ একটি প্রাচীন পদ্ধতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজব্যবস্থায় নানা সময়ে এর উদ্ভব ঘটেছিল। পঞ্জীকরণের মাধ্যমে দেশের মানবগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত তথ্যাবলী নথিভূক্ত হয়। এই সকল তথ্যাবলী বহুলাংশে জনসংখ্যা নিরূপণ, বিচার ও বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় যে সকল ব্যক্তিগত তথ্য নথিভূক্ত করা হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান হল জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পৃথগ্‌বাস, পুনর্বিবাহ ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টায় জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, ধর্মান্তর বিষয়ে মানব সমাজে পঞ্জীকরণ পদ্ধতি আংশিকভাবে প্রযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডে পঞ্জীকরণ সকলের ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক করা হয়। এসবের পূর্বেই সুইডেনে জনসংখ্যার লেখ্য সারণী রক্ষার ব্যবস্থা গৃহিত হয়। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে পঞ্জীকরণের আইনানুগ তাৎপর্য্য রয়েছে কারণ এর মধ্য থেকেই দেশের নাগরিকত্ব বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

জনবিজ্ঞানীরা পঞ্জীকরণ তথ্যাবলী অপ্রধান তথ্য হিসেবে ব্যবহার করেন। এর মধ্যে রয়েছে অপরিহার্য

পঞ্জীকরণ, জনসংখ্যার পঞ্জী এবং সরকারি নথি। পঞ্জীকরণ তথ্যাবলীতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় যেমন জন্ম প্রমাণ পত্র, মৃত্যু প্রমাণপত্র, বিবাহ প্রমাণ পত্র। কোন মানুষ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার পক্ষে এগুলি নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে কার্যকরী। তবে নিবন্ধকের কার্যালয়ে এই সকল তথ্যের সঠিক সরবরাহের উপরই পঞ্জীকরণ তথ্যাবলীর বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভরশীল। লক্ষ্য করার বিষয় যে সকল সময় এই সকল তথ্য একেবারেই নির্ভূলভাবে উপস্থাপিত হয় না। কাজেই এগুলির ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভারতে পঞ্জীকরণ পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও এটি সম্পূর্ণ নয়। গ্রামভিত্তিক ভারতে এবিষয়ে এখনও প্রয়োজনীয় সচেতনতা আসে নি। ফলে সময়মত বিভিন্ন তথ্যাবলী সরবরাহে কোন উৎসাহই দেখা যায় না। জনসংখ্যার পঞ্জী ও বিভিন্ন সরকারী নথিপত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগৃহীত হতে পারে। সরকারী পর্যায়ে রচিত বিভিন্ন ধরনের তালিকা আর্থ-সামাজিক বিষয়ের উপর আলোক সম্পাত করে। এই সকল তথ্যাবলীর সীমাবদ্ধতা থাকলেও প্রাথমিক তথ্য হিসেবে এগুলি পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করে।

নমুনাচয়ন পদ্ধতি যে কোন সমীক্ষাকার্যে একটি অতি কার্যকরী বিষয় হিসেবে পরিগণিত। এখানে সীমিত পরিমণ্ডলের মধ্যে বিশালত্বের ধারণা সংগৃহিত হয়। কাজেই এই পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মতভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। তা না হলে সমগ্র প্রয়াসটি বিফল হবে। জনসংখ্যার পারিসাংখ্যিক দিকটির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মানব সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই পরিসংখ্যানের প্রয়োজন রয়েছে। যে কোন সামাজিক উন্নয়নের কাজে পরিসংখ্যান এবং জনসংখ্যার পরিচিতি প্রয়োজন। জনগোষ্ঠীর পারিসাংখ্যিক বিষয়সমূহ অর্থনীতিবিদ্, পরিকল্পক, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থার প্রয়োজনে লাগে। জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দেশের বাজেট ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অপরিহার্য। জনসাধারণের কর্মনিযুক্তি, শ্রমিকনীতির ব্যবস্থা গ্রহণে এই পারিসাংখ্যিক জনসংখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। ভারতের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (NSS) মাধ্যমে যে বড় ধরনের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে তার মধ্য থেকে অপরিহার্য হার পাওয়া যায়। তবে এটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় ভারতের মহানিবন্ধক যে বিশেষ ধরনের নমুনা নিবন্ধন প্রথাটি প্রচলন করেছিলেন সেটি তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। নমুনা পঞ্জীকরণ পরিকল্পটি **দ্বৈত লেখ্য সূত্রের** ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। দুটি বিশেষ ধরনের পরিকল্পিত তথ্য সংগ্রহের উপ-পদ্ধতি জনসংখ্যার মাপনে যখন ব্যবহৃত হয় তখনই তাকে বলা হয় দ্বৈত লেখ্য সূত্র।

২.৮ অনুশীলনী

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

১. জনবিজ্ঞানের তথ্য বলতে কি বোঝেন?

২. জনগণনার উদ্দেশ্য কি?

৩. অপরিহার্য ঘটনা (vital events) কি?

৪. পঞ্জীকরনের মধ্যে সমাজজীবনের কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়?

৫. বিবাহগত বয়স বলতে কি বোঝেন?

৬. ইংল্যান্ডে কখন পঞ্জীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়?

৭. দ্বৈত লেখ্য সূত্র কি?

৮. জনগোষ্ঠীর পারিসাংখ্যিক তথ্যসমূহ কি ধরনের প্রয়োজনে লাগে?

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন—

১. জনগণনা পদ্ধতির বিভিন্ন কার্যকরী পন্থা ও উপযোগিতা বর্ণনা করুন।

২. জনগণনা ও পঞ্জীকরনের মধ্যে পার্থক্য কি? পঞ্জীকরনের উৎসগুলি আলোচনা করুন।

৩. নমুনা চয়ন কি? জনবিজ্ঞানে যে নমুনা চয়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তার পশ্চাৎপট উন্মোচন করুন।

৪. জনসংখ্যার পারিসাংখ্যিক দিকটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ আলোচনা করুন।

৫. ''মানব সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই পরিসংখ্যান প্রয়োজনীয়— এই কথাটির অর্থ এবং তাৎপর্য আলোচনা করুন।

২.৯ উত্তর সংকেত

১. জনবিজ্ঞান জনগণের সংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনা করে। মানুষের জীবন এবং কর্ম নানা ধরনের পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত। জনসংখ্যা নির্ণয় ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে নানাধরনের খোঁজ খবর নিতে হয়। একেই বলা হয় জনবিজ্ঞানের তথ্য।

২. মানুষ নিয়েই দেশ গড়ে উঠে — রাষ্ট্র বিকাশলাভ করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল মানব সমাজকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করা। রাষ্ট্র তার এই পরিচালকের কাজ করার সময় তার মধ্যস্থিত মানুষের সামগ্রিক জনসংখ্যা, জন্ম ও মৃত্যু হার, শিক্ষা, বিবাহগত অবস্থা, ধর্ম, ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হওয়ার ব্যবস্থা করে। বিজ্ঞান ভিত্তিক জনগণনার মাধ্যমে বিস্তৃত মানবগোষ্ঠীর এই সকল বিষয় সংক্রান্ত নানা তথ্য পাওয়া যায়। এগুলি দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নের কাজে লাগে।

৩. জনবিজ্ঞানে মানুষের বিভিন্ন বিষয়ক জৈবিক ও সামাজিক বিষয়ের বিভিন্ন ঘটনাবলীর কথা উল্লেখিত হয়ে থাকে। মানুষের জীবনের নানা গতি-প্রকৃতির কথাই এখানে প্রাধান্য পায়। তবে এদের মধ্যে জন্মহার এবং মৃত্যুহার সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এদেরই বলা হয় **অপরিহার্য ঘটনা** বা vital events।

৪. জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য মানবজীবনের নানা ধরনের তথ্যাবলীর প্রয়োজন হয়। কাজেই এগুলিকে পঞ্জীকরণ করা হয়ে থাকে । এই কাজে মানবজীবনের যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হল — জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পৃথগ্‌বাস, পুনর্বিবাহ ইত্যাদি।

৫. বিবাহ প্রজনন সংক্রান্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। সমাজ বিবাহ প্রথার মাধ্যমে তার মধ্যস্থিত মানুষদের প্রজনন কার্যটি করার অনুমতি দান করে। মানব সমাজে মানুষের জৈবিক পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গেই প্রজননের অধিকার দেওয়া হয় না। প্রতিটি সমাজেই বিবাহ অর্থাৎ প্রজননের একটি বয়স স্থির করে দেওয়া হয়।

পরবর্তীকালে অনগ্রসর সমাজব্যবস্থা এই বয়সকে আইনানুগ করে নেয়। একেই বলা হয় বিবাহের বয়স।

৬. জীবনের নানা ঘটনাবলীর পঞ্জীকরনের কাজটি কোন কোন সংস্থা চালু করলেও এটি আংশিকভাবেই পরিচালিত হত। এর মধ্যে কারোর কোনও দায়বদ্ধতা থাকত না। কিন্তু এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে পৃথিবীর কয়েকটি দেশে সরকারি পর্যায়ে একে বাধ্যতামূলক করার কথা চিন্তা করা হয়েছিল। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে শিশুদের জন্ম ও মৃত্যুকে পঞ্জীকরণ আবশ্যিক করা হয়।

৭. দ্বৈত লেখ্য সূত্রটি পঞ্জীকরণ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত। যখন দুটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত তথ্য সংগ্রহের উপ-পদ্ধতি জনসংখ্যার পরিবর্তনের মাপনে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলা হয় দ্বৈত লেখ্য পদ্ধতি। এই দুটি উপ-পদ্ধতির একটি হল অবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ এবং অপরটির নাম ভূতাপেক্ষ সমীক্ষা।

৮. পরিসংখ্যান প্রভাবিত এবং বিশ্লেষিত তথ্যাবলী মানব সমাজের বিভিন্ন ঘটনা পরিচালনার কাজে অপরিহার্যরূপেই প্রতিভাত হয়। স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, শিল্পকেন্দ্র, কর্মনিয়োগ কেন্দ্র এমনি বহুবিধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা এবং পরিচালনার জন্য জনসংখ্যার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন জরুরী বলে বিবেচিত হয়।

(ঘ) **এখানে যে সকল প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে তার উত্তরের সবটুকুই ২নং এককের বিস্তারিত আলোচনা থেকে পাওয়া যাবে। প্রশ্নের বক্তব্যটি বুঝে নিয়ে নির্দেশমত উত্তর গুলি লক্ষ্য করুন।**

১. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য দ্বিতীয় এককটির অনুচ্ছেদ নং ২.২, ২.২.১ এবং ২.২.২ দেখুন।

২. এই প্রশ্নটির প্রথম অংশটির উত্তরের জন্য দ্বিতীয় এককের মধ্যস্থিত অনুচ্ছেদ নং ২.২.৩ দেখুন। পরবর্তী অংশটির উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ নং ২.৩.১ দেখুন।

৩. এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে দ্বিতীয় এককের অনুচ্ছেদ নং ২.৪ থেকে। এর সঙ্গে উদাহরণ যোগ করার জন্য পরবর্তী ২.৪.১ অনুচ্ছেদ দেখতে হবে।

৪. এই প্রশ্নটির উত্তর পাবেন দ্বিতীয় এককের অনুচ্ছেদ নং ২.৪.৪ এবং ২.৪.৫ এর মধ্যে।

৫. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য কেবলমাত্র দ্বিতীয় এককের ২.৪.৪ নং অনুচ্ছেদটিই দেখুন।

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Barclay, G. W. — Techniques of Population analysis, New York, Wiley, 1958

Bogue, Donald J. — Problems of Demography, New York, John Wiley and Sons, 1969

Bottomore, T. B. — Sociology, London, George Allen and Unwin Ltd., 1969

Goode, W. J. and P. K. Hatt — Methods in Social Research, New York, Mc-Grow Hill Book Co. 1952.

Guruswamy, S. — Social Demography : Processes and Perspectives, New Delhi, Sterling Publication, 1997.

Ogburn, W. F. and N. F. Nimkoff — A Handbook of Sociology, New Delhi Euresia Publishing Hosue, 1964

Proston, Sammel H. — Demography : Measuring and Modelling population processes, Oxford, Blackwell, 2001.

Young, P. V. — Scientific Social Survey and Research, New Delhi, Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., 1975.

একক ৩ ❑ ভারতের জনসংখ্যার আকার, বৃদ্ধি এবং বর্তমান পরিস্থিতি

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ ভারতের জনসংখ্যার আকার, বৃদ্ধি এবং বর্তমান পরিস্থিতি
৩.৩ ভারতের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি
৩.৩.১ পুরুষ-মহিলা অনুপাত
৩.৩.২ সাক্ষরতার হার
৩.৪ জনগোষ্ঠীর অনুপাত
৩.৫ আদিবাসী জনগোষ্ঠী
৩.৬ জনগোষ্ঠী ঃ বর্ণ ও জাতি
৩.৭ জনগোষ্ঠী ঃ বাসস্থান
৩.৮ জনগোষ্ঠী ঃ ধর্ম
৩.৯ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সমস্যা
৩.১০ জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা
৩.১১ জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা
৩.১২ সারাংশ
৩.১৩ অনুশীলনী
৩.১৪ উত্তর সংকেত
৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী দুটি এককে জনসংখ্যার প্রকৃতি-পরিস্থিতি এবং তথ্য আহরণের পদ্ধতি সাধারণভাবে আলোচনার পর যে ধরনের জ্ঞানলাভ হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই ভারতের জনসংখ্যার বিভিন্ন দিকের প্রতি লক্ষ্য করার উদ্দেশ্যেই এই তৃতীয় এককটি রচিত হয়েছে। জনসংখ্যায় ভারত যে কেবল পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থানেই রয়েছে তাই নয় — আমাদের এই দেশটির জনসংখ্যা নানা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। দেশের মানুষের সঠিক জীবনধারার

পরিচয় পেতে গেলে কেবলমাত্র সংখ্যার দিকে লক্ষ্যদান করলেই হবে না — এর সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং পারিপার্শ্বিকতা ভিত্তিক কর্ম ও চিন্তাধারা যেগুলি সংখ্যার উপর প্রভাব বিস্তারকারী। ভারতের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পথে — কি কারণে এই বৃদ্ধি এবং সেই বৃদ্ধি রোধে কি করণীয় তার সম্যক উপলব্ধি দান করাই এই এককটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ভারতের জনজীবনে কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করে পাঠককে এই বিশেষ দিকটির প্রতি আকর্ষণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন সময় সেই সকল পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতে হয়েছে। কোন কোন পদ্ধতিকে আবার প্রয়োগ করাই যায়নি। জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি সার্বিক পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি কিভাবে জনগণের মধ্যে প্রভাব করছে এবং এর কার্যকারিতা কিভাবে এবং কোন পথে চলেছে তার বিস্তারিত বিবরণ তথ্য-প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করাই এই এককটির উদ্দেশ্য। ভারতের জাতীয় জননীতির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টির মূল্যায়নের প্রচেষ্টাও এই এককটিতে গৃহীত হয়েছে। অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস এবং প্রকৃত চেতনার অভাব কিভাবে এই বহুবিস্তৃত পরিকল্পনাটির অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে সেই বিষয়টি এই এককটির মধ্যে বিবৃত হয়েছে।

৩.১ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে আদমশুমারি অর্থাৎ জনগণনার গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে কিভাবে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর আয়তন, বৃদ্ধি, লিঙ্গ ভিত্তিক গঠন, বয়স ভিত্তিক বিভাজন, উর্বরতা, মরণশীলতা, প্রব্রজন বিষয়ে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায় সে বিষয়ে সুষ্ঠু এবং বিষয়াশ্রয়ী আলোচনা করা হয়েছে। ভারতে জনগণনার সূত্রপাত কখন ঘটেছিল এবং সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত দশবছর অন্তর যে জনগণনা হয়ে চলেছে সেগুলিতে জনসংখ্যার প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে এখানে আলোচিত হয়েছে। জন্মহার এবং মৃত্যুহার কোন দেশের জনগোষ্ঠীর আয়তন নির্ধারণ করে এবিষয়ে পূর্বের এককগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। সেই পূর্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান এককটিতে ভারতের জন্মহার ও মৃত্যু হারের যে তথ্য বিভিন্ন দশকের জনগণনার মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে তারই পারস্পরিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এদের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখান হয়েছে। ভারতের মত বিশাল দেশটিতে জনসংখ্যার বিস্তারণ চতুর্দিকে দেখা যায় তবে জনসংখ্যার ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়। বিভিন্ন জনসংখ্যার তথ্যাবলীর উপর নির্ভর করে ভারতে বেশি ঘনত্ব ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিস্তারণও এই এককের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের সামগ্রিক জীবনধারণকে কিভাবে সমস্যাপূর্ণ করে তুলেছে এবং জনবিস্ফোরণকে রোধ করতে না পারলে যে আমাদের মুক্তি নাই এবিষয়টি এখানে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব বিষয়ে একটি মানুষকে সজাগ হতে হবে এবং এ বিষয়ে জনচেতনা জাগ্রত হওয়াই যে আশু কর্তব্য এই বিষয়টিকে সুচিন্তিত মন্তব্যের মাধ্যমে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। জনবিজ্ঞানীদের মতে ভারতের এই ভয়াবহ জনবিস্ফোরণকে প্রতিহত করার একমাত্র কার্যকরী পন্থা হল জনগণের বিকাশ এবং সচেতনতা। বর্তমান এককটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করতে জৈবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং শিক্ষাগত বিষয় সমূহের একটি অখণ্ড পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়োজন বলেই চিহ্নিত হয়েছে।

৩.২ ভারতের জনসংখ্যার আকার, বৃদ্ধি এবং বর্তমান পরিস্থিতি

সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যায় ভারতের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম হল চিন। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ১৫.৩ শতাংশ মানুষ ভারতের বাসিন্দা যদিও পৃথিবীর সামগ্রিক ভূমিভাগের মাত্র ২.৫ শতাংশ ভুমি ভারতে রয়েছে। যে কোন জনবিজ্ঞান ভিত্তিক পর্যালোচনায় জনসংখ্যার বৃদ্ধিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের জনসংখ্যা প্রতি দশবছর অন্তর গণনা করার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এর নাম **আদমশুমারি** (Census)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে আদমশুমারি ও জন্ম মৃত্যু পঞ্জীকরণ পদ্ধতি প্রচলনের ফলে জনবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাবলী সংগ্রহের বিশেষ উন্নতি ঘটে। গাণিতিক পদ্ধতিসমূহ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে জনবিজ্ঞান গবেষণার নানা কাজে লাগান হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। জনবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার আলোচনায় জনগোষ্ঠীর সংখ্যাসূচক বিষয় সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে থাকে। জনবিজ্ঞান আলোচনায় কোন জনগোষ্ঠীর আয়তন, বৃদ্ধি, বয়স ও লিঙ্গ ভিত্তিক গঠন, উর্বরতা, মরণশীলতা, প্রব্রজন ইত্যাদির সুষ্ঠু উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ হয়। এই সকল বিষয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিকতার পশ্চাৎপটে মূল্যায়িত হয়। কোন জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি বিষয়ে কিছু জানতে হলে জনবিজ্ঞানের প্রয়োগ অতীব প্রয়োজন। একমাত্র এই কারণেই বিভিন্ন দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় জনগণনার বিভিন্ন কার্যক্রম গৃহিত হয়। আদমশুমারি জনসংখ্যার সমাজতাত্ত্বিক রূপ। কোন সমাজই অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনুমোদন করে না। সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন একটি ভয়াবহ ঘটনা আবার জনসংখ্যা হ্রাসও বিশাল সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। কাজেই এই দুটি পরিস্থিতির মধ্যে একটি সমন্বিত ধারা রক্ষা করা প্রতিটি সমাজব্যবস্থায় অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। অতএব কিছুদিন পর দেশের জনসংখ্যা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর উপর আলোকপাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

৩.৩ ভারতের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

ভারতে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আদমশুমারি শুরু হয়। তারপর থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর এই অতি প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গৃহিত হয়ে চলেছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যা ১০২, ৭০, ১৫, ২৪১ জন। যে হারে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তার রেশ যদি ক্রমাগতভাবে একই থেকে যায় তাহলে হিসাব করা হয় যে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা হবে ১৪৫ কোটি। এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের পক্ষে অতীব দুর্ভাগ্যজনক। এতে মানুষের জীবনে চরম বিপদ নেমে আসবে। বিভিন্ন সময়ের আদমশুমারির মাধ্যমে প্রাপ্ত ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিভিন্ন সময়ে ভারতের জনসংখ্যার আকার সম্পর্কে অবহিত হই। নিচের সারণীতে ভারতীয় দশবার্ষিক আদমশুমারিতে প্রাপ্ত জনসংখ্যার সঙ্গে গড় দশবার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেওয়া হয়েছে। এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সমগ্র বিষয়টি সহজেই বোধগম্য হবে। গত একশত বছরে ভারতের জনসংখ্যার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি এর মধ্য থেকেই প্রতিফলিত হয়েছে।

সারণী নং ৩.১

দশবার্ষিক আদমসুমারির সময়	মোট জনসংখ্যা (কোটি এর হিসাবে)	গড় মোটবৃদ্ধি (শতকরা হিসাবে)
১৯০১	২৩.৮৩	০.৩০
১৯১১	২৫.২০	০.৫০
১৯২১	২৫.১২	০.৩০
১৯৩১	২৭.৮৯	১.০৬
১৯৪১	৩১.৮৫	১.৩৪
১৯৫১	৩৬.১০	১.২৬
১৯৬১	৪৩.৯১	১.৯৮
১৯৭১	৫৪.৮২	২.২০
১৯৮১	৬৮.৫২	২.২৫
১৯৯১	৮৪.৬৩	২.১৪

ভারতের সেন্সাস কমিশনার এবং ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল কর্ণওয়ালিস দেশের জনসংখ্যা ভিত্তিক তথ্যাবলী সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত। বিভিন্ন অগ্রসর ও বিকাশপ্রাপ্ত দেশসমূহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কার্যকরী সমাধানসূত্র বের করে এই বৃদ্ধিকে উল্লেখযোগ্যভাবে স্তিমিত করেছে। সমগ্র পৃথিবীর শিশুজন্মের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে এদের দশভাগের পাঁচভাগই অনগ্রসর দেশগুলিতে জন্মাচ্ছে। এই জন্মহারের তারতম্যের জন্য অগ্রসর এবং অনগ্রসর দেশগুলির জন্য অর্থনৈতিক ব্যবধান বহুবিস্তৃত হয়েছে। এর ফলে অনগ্রসর দেশসমূহের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হয়েছে। উপরের সারণী থেকে আমরা দেখতে পাই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময় থেকে ভারতের জনসংখ্যা অত্যধিক মাত্রায় বেড়েছে। এর প্রধান কারণ মৃত্যুর হার অপেক্ষা জন্মের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিশেষ অবস্থার জন্য কিভাবে এবং কেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় সে কথা আমরা প্রথম অধ্যায়েই আলোচনা করেছি। উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমসুমারিতে প্রাপ্ত জনসংখ্যা প্রায় ৮৫ কোটি এবং এই জনসংখ্যা ১৯৮১ আদমশুমারি থেকে প্রায় ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচে দেওয়া সারণী নং ৩.২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮১ আদমসুমারিতে ভারতে জন্মহার হাজার প্রতি ৩৩.৩ এবং মৃত্যুহার হাজার প্রতি ১২.৫। আবার এর পরবর্তী দশকে হাজার প্রতি জন্মহার ও মৃত্যুহার যথাক্রমে ৩০.০ এবং ১০.০। অতএব জন্মহার ও মৃত্যুহার নিম্নগামী হয়েছে যদিও এটি প্রান্তিক। কিন্তু এই প্রান্তিক উন্নতি ভারতের প্রচন্ড জনসংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। এখানে গত একশত বছরের জন্মহার ও মৃত্যুহার ৩.৩ নং সারণীতে প্রদত্ত হল। এতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী থেকে ভারতের বিভিন্ন সময়ের জন্মহার ও মৃত্যুহারের বিষয়ে অনেক বিষয় জানা যাবে। পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত জন্মহার ও মৃত্যুহারের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে নানা কথা এর মাধ্যমে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

সারণী নং ৩.২

আদমশুমারি বছর	হাজার প্রতি জন্মহার	হাজার প্রতি মৃত্যুহার
১৯০১	—	—
১৯১১	৪৯.২	৪২.৬
১৯২১	৪৮.১	৪৭.২
১৯৩১	৪৬.৪	৩৬.৩
১৯৪১	৪৫.২	৩১.২
১৯৫১	৩৯.৯	২৭.৪
১৯৬১	৪০.৯	২২.৮
১৯৭১	৪১.১	১৮.৯
১৯৮১	৩৩.৩	১২.৫
১৯৯১	৩০.০	১০.০

ভারতের জনসংখ্যার ঘনত্ব আলোচনায় আমরা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার কথা জানতে পারি। জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে আমরা কি বুঝি? এর অর্থ হল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা কত তা স্থির করা। বর্তমান ভারতের ভূখণ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের ৭৭ জন থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে ২৬৭ জনে পৌঁছেছে। অতএব জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৬.৫ গুণ বেড়েছে। এখানে দেওয়া সারণীতে বিভিন্ন আদমশুমারি বছরে প্রাপ্ত জনঘনত্বের বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সারণী নং ৩.৩

আদমশুমারি বছর সময়	প্রতিবর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব
১৯০১	৭৭
১৯১১	৮২
১৯২১	৮১
১৯৩১	৯০
১৯৪১	১০৩
১৯৫১	১১৭
১৯৬১	১৪২
১৯৭১	১৭৭
১৯৮১	২১০
১৯৯১	২৬৭

এই সারণী থেকেই দেখা যাচ্ছে পরবর্তী বছরগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্বের হার আরও বেড়ে গিয়েছে।

তবে এই ধরনের ঘনত্ব বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম হয়েছে। যেমন অরুণাচলপ্রদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশ কম — প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র দশজন বাস করে। অন্যান্য কম ঘনত্ব রাজ্যগুলি হল মিজোরাম, আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিকিম, জম্মু ও কাশ্মীর, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং হিমাচল প্রদেশ। আসাম ও ত্রিপুরা ব্যতীত সকল পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব কম। অপর দিকে পাহাড়ী এলাকায় গড়ে উঠা হিমাচল প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশ কম। দিল্লি, চণ্ডীগড় এবং পণ্ডিচেরিতে জনঘনত্ব খুব বেশি। দমন এবং দিউ এর জনসংখ্যার ঘনত্ব জাতীয় গড় ঘনত্বের তিনগুণ; কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গের ঘনত্ব জাতীয় গড় ঘনত্বের দ্বিগুণেরও বেশি। যে সকল রাজ্যগুলির জনসংখ্যার ঘনত্ব জাতীয় গড় ঘনত্বের বেশি সেগুলি হল আসাম, বিহার, গোয়া, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, দাদরা এবং নগরহাবেলী। আবার অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাত, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং ত্রিপুরায় জনসংখ্যার ঘনত্ব জাতীয় গড় ঘনত্বের কম।

৩.৩.১ পুরুষ-মহিলা অনুপাত

লিঙ্গ অনুপাত জনসংখ্যার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এর মধ্যে দেখা যায় প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে মহিলার সংখ্যা কম। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রতি এক হাজার মহিলার মধ্যে রয়েছে ১০২৯ জন পুরুষ। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে এটি হল ১০৭৬। এই ঘটনার পশ্চাৎপটে নানা ধরনের কারণ উপস্থাপিত হয়েছে। শিশুকন্যার মরণশীলতার হার বেশি কারণ জন্মের পর থেকে এদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব বেশ প্রকট। শিশুকন্যা হত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা মহিলাদের সংখ্যাল্পতার কারণ হতে পারে। কখনও কখনও শিশুকন্যার জন্মের বিষয়টিকে নথিভুক্ত করান হয় না। এই অসম লিঙ্গ অনুপাত মানুষের মানসিক প্রভাব এবং সামাজিক সমস্যা থেকেও উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে করা হয়। অনেক বিবাহিত দম্পতি দু'একটি পুত্রসন্তান জন্মালে আর কন্যা সন্তানের প্রতি আগ্রহান্বিত হন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই নির্বীজকরনের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কেরালাই একমাত্র রাজ্য যেখানে লিঙ্গ অনুপাত বিপরীত ধরনের অর্থাৎ এখানে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। অনুমান করা হয় এই রাজ্য থেকে নানা ধরনের চাকুরি/ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অধিকসংখ্যক পুরুষদের প্রব্রজন এই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

৩.৩.২ সাক্ষরতার হার

জনসংখ্যা আলোচনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনগণের সাক্ষরতার হার। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতা বিচারে কোন মানুষের একটি পোষ্টকার্ড লেখা এবং পড়ার ক্ষমতাই নির্দেশ করে। ১৯৯১ আদমসুমারী অনুসারে ভারতে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫২.১১ জন। আবার পুরুষ ও মহিলা হিসেবে বিচার করলে দেখা

যায় যে এই বিষয়টি হল — শতকরা ৬৩.৮৬ জন পুরুষ এবং শতকরা ৩৯.৪২ জন মহিলা। এই দুই এর মধ্যে কিন্তু বেশ পার্থক্য দেখা যায়। দেশের অনুন্নত এবং পশ্চাৎবর্তী অবস্থার জন্য এই ঘটনাটি অন্যতম কারণ বলেই বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতের সার্বিক সাক্ষরতার হার নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক কালে নানা ধরনের সাক্ষরতা সম্পর্কিত কর্মসূচি গ্রহণও এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। কেরালাই ভারতের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যেখানে প্রায় শতকরা ১০০ জনই স্বাক্ষর হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। তবে এই স্বাক্ষরেরা সকলেই বিদ্যালয় বা অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছে তা নয়। হিন্দি বলয়ে অবস্থিত রাজ্যগুলি স্বাক্ষরতা অর্জনে বেশ পিছিয়ে রয়েছে। এই ক্ষেত্রে মহিলাদের অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাঞ্চল, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং রাজস্থানে মহিলা স্বাক্ষরতার হার বিশেষভাবে নিম্ন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে স্বাক্ষরতা এবং শিশুশিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দান করা উচিত। বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে ভারতের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষাদানের প্রয়াস গ্রহণ করলেও তা বিশেষ কার্যকারীরূপ গ্রহণ করতে পারেনি। গ্রামীণ পরিবেশে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই নানাধরনের কাজকর্মের মধ্যে সামান্য উপার্জন করে আপন আপন পরিবারে দিয়ে থাকে। কাজেই শিশুশ্রমিক প্রথা বন্ধ না হলে এবিষয়ে বিশেষ ফললাভ করা কঠিন। তবে একথা অস্বীকার করা যাবে না যে পিতামাতার চরম দারিদ্রই তাদের ছেলেমেয়েদের যৎকিঞ্চিৎ উপার্জনে বাধ্য করে। কখনও বা এদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করলেও কিছুদিনের মধ্যেই এরা শিক্ষাকেন্দ্রে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই সঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে যে সকল অঞ্চলে বিকাশ প্রচেষ্টার মাধ্যম হিসেবে খ্রিষ্টধর্ম প্রযুক্ত হয়েছে অর্থাৎ খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকেরা তাঁদের ধর্মান্তরিত গোষ্ঠীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়েছে সেখানে স্বাক্ষরতার হার ঊর্ধ্বগামী হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ এই প্রসঙ্গে মেঘালয়, মিজোরাম এবং নাগাল্যাণ্ডের নাম করা যেতে পারে।

৩.৪ জনগোষ্ঠীর অনুপাত

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জন তপশিলী জাতিভুক্ত। এই জনগোষ্ঠী অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব নাম রয়েছে এবং এই নামগুলির সঙ্গে পেশাভিত্তিকতাও যুক্ত থাকতে দেখা যায়। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে চামার জাতিগোষ্ঠীর মানুষের এই গোষ্ঠীর মানুষদের সমগ্র জনসংখ্যার একচতুর্থাংশ গঠন করেছে। এছাড়া বৃহৎ জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে রয়েছে ভাঙ্গি, আদি দ্রাবিড়, পামি, মাডিগা, কোলি, মাহার, নমশুদ্র ইত্যাদি। প্রতিটি রাজ্যে তপশিলী জাতিদের নিজস্ব তালিকা রয়েছে।

তপশিলী জাতিগোষ্ঠী গুলির জনসংখ্যার বিস্তারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধাংশ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানায় বসবাস করে। দক্ষিণাঞ্চলে তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশে এদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। পূর্বভারতে পশ্চিমবঙ্গেও তপশিলী জাতির

বসবাস বেশ উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা যায় যে এই জাতিগোষ্ঠীর শতকরা ৮৫ ভাগই গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা এবং কৃষিকাজই তাদের প্রধান উপজীবিকা। তাদের অধিকাংশ কৃষিজীবী, কিছু ব্যবসায়ী এবং চাকুরিজীবীও রয়েছে। কোন কোন [illegible] হিসেবে পরিচিত।

১.৩ আদিবাসী জনগোষ্ঠী

ভারতে [illegible] আদিবাসীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এই আদিবাসী সম্প্রদায় ভারতের সকল জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ সৃষ্টি করেছে। এরা সকল ভারতীয় সমাজব্যবস্থার নিম্ন শ্রেণী হিসেবে পরিচিত। আদিবাসী [illegible] এই বিভিন্ন ধরনের সমাজের। সকল ভারতে [illegible] আদিবাসী রয়েছে — এদের ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি অনেক। ভারতের [illegible] আদিবাসীগোষ্ঠীর [illegible] করেছে। [illegible] আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি [illegible] মধ্যে [illegible] রয়েছে। সকল আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশ [illegible], মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, ওড়িশা এবং [illegible] বসবাস করে। [illegible] অঞ্চলে রয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ আদিবাসীর বসবাস। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, [illegible] রাজ্য। দক্ষিণাঞ্চলে [illegible] ৯ শতাংশ আদিবাসী গোষ্ঠীর বসবাস লক্ষ্য করা যায়। এগুলির মধ্যে কর্ণাটক, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের [illegible] রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ১০ শতাংশ দেখা যায়। [illegible] রয়েছে ০.৮৩ শতাংশ, [illegible] এবং [illegible] ও দ্বীপপুঞ্জে ০.১০ শতাংশ আদিবাসীর বসবাস রয়েছে। [illegible], মণিপুর, [illegible] এবং [illegible] সকল জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ আদিবাসী গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান এবং ত্রিপুরায় রয়েছে সকল জনসংখ্যার ১০ শতাংশ আদিবাসী গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের সর্বত্র আদিবাসী গোষ্ঠীর বাস নয়। এদের বসবাস প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক [illegible] অঞ্চলে। [illegible] এদের অধিকাংশ হল ভীল। এরা ভারতের [illegible] আদিবাসী গোষ্ঠী। মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে এদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। [illegible] রয়েছে সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠী। এরা ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার বাসিন্দা। ভারতের সর্বাপেক্ষা বেশি আদিবাসীর বাস আসাম তথা আসাম ও ত্রিপুরার [illegible]। এদের [illegible] জনসংখ্যা [illegible] ১০। নানা কারণে এদের জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে এই [illegible] এদের [illegible] করে যাওয়ার সম্ভাবনা। [illegible] আসাম ও ত্রিপুরার [illegible] রয়েছে [illegible] আদিবাসী [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible]। এদের জনসংখ্যা ২০০ এর [illegible]। ভারতের সকল [illegible] অঞ্চলের শতকরা ১৫ ভাগ আদিবাসীদের বসবাস রয়েছে। তবে এই [illegible] প্রায় ৪০ শতাংশ [illegible] রয়েছে।

এছাড়াও রয়েছে নানাধরনের খনিজ সম্পদ। ভারতে কিছু সংখ্যক আদিবাসী বহুপতি বিবাহকারী হিসেবে পরিচিত। দক্ষিণভারতের নীলগীরি পাহাড়ের অধিবাসী টোডা এবং উত্তরাঞ্চলের জৌনসর বাওয়ারের অধিবাসী খাসা আদিবাসীরা এই পর্যায়ভুক্ত। উত্তরপূর্ব ভারতের খাসি এবং গারো আদিবাসীরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজধারা অনুসরণ করে। লক্ষ্য করার বিষয় যে ভারতের এখনও প্রায় ৭০টি আদিবাসী আদিম প্রথায় শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এদের মধ্যে বেশি সংখ্যক আদিবাসীর বসবাস অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, এবং কেরালায় দেখা যায়। এছাড়াও বহু আদিবাসী স্থানান্তরকারী কৃষিগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এরা জঙ্গল কেটে গাছ-পালায় আগুন ধরিয়ে কৃষিভূমি তৈরি করে এবং সেই জমি ৩।৪ বছর চাষের কাজে লাগিয়ে আবার অন্যস্থানে জঙ্গলময় ভূমি নির্বাচন করে। এই কৃষি প্রথা আদিম প্রকৃতির। ভারতে এখনও ২০।২২টি আদিবাসী এই ধরনের কৃষিকাজ করে থাকে। এরা প্রধানতঃ উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং মধ্যপ্রদেশে বসবাস করে। সমগ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ৭০ শতাংশ স্থায়ী কৃষিকাজ নির্ভরশীল।

তপশিলী আদিবাসীদের মধ্যে যে জনসংখ্যা রয়েছে (৬.৭৮ কোটি) তার মধ্যে সকলেই কিন্তু একই ধরনের সামাজিক-অর্থনৈতিক পর্যায়ে পড়ে না। তাছাড়া সমগ্র আদিবাসী গোষ্ঠী অর্থাৎ প্রায় ৩৫০টি আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে ৭৫টি আদিবাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে। এরা এখনও বন-জঙ্গল নির্ভরশীল এবং আদিম প্রথায় শিকার ও সংগ্রহ ভিত্তিক জীবনে অভ্যস্ত। এদের সংখ্যা প্রায় ১৩.৫ লক্ষ এবং ১৫টি রাজ্যে এরা ছড়িয়ে রয়েছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাড়াও দেখা যায় যে এদের সংখ্যা বেশ কম। কোন কোন গোষ্ঠী যেমন আন্দামানীজ, ওঙ্গে আদিবাসীদের জনসংখ্যা অত্যন্ত কম এবং এরা ক্রমাগত জনসংখ্যা হ্রাসের সম্মুখীন হয়ে চলেছে। ভারতের সামগ্রিক জন বিস্ফোরণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ঘটনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সকল জনগোষ্ঠীকে বলা হয় আদিম আদিবাসী গোষ্ঠী। কারণ এদের মধ্যে যে লক্ষণগুলি দেখা যায় তাহল — প্রাক-কৃষি পর্যায়ের প্রযুক্তি, অত্যন্ত নিম্নমানের শিক্ষা হার এবং বন্ধ অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত জনসংখ্যা।

৩.৬ জনগোষ্ঠী ঃ বর্ণ ও জাতি

ভারতের ১০২ কোটি ৭০ লক্ষ ১৫ হাজার (আদমশুমারি ২০০১) জনসংখ্যা বহুবিধ ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীতে (Racial groups) বিভক্ত। প্রকৃতপক্ষে ভারত একটি বহুবর্ণময় দেশ। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের ভারতে দেখা যায়। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, জোরায়াস্ট্রিয়ান, ইহুদি ইত্যাদি ধর্মের মানুষ ভারতের বাসিন্দা। হিন্দুজনগোষ্ঠীই এখানে প্রধান এবং এই গোষ্ঠী দেশের প্রায় ৮৩ শতাংশ আদিবাসীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। এর পর রয়েছে মুসলিম জনগোষ্ঠী — এরা সমগ্র জনগোষ্ঠীর ১২ শতাংশ, খ্রিষ্টান ৩ শতাংশ, শিখ ২ শতাংশ, বৌদ্ধ ১ শতাংশ, এবং জৈন ০.৫ শতাংশ। জোরোয়াস্ট্রিয়ান এবং ইহুদি সংখ্যা অত্যাধিক কম।

৩.৭ জনগোষ্ঠী ঃ বাসস্থান

বাসস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে হিন্দু জনগোষ্ঠী ৮৪.৫ শতাংশ গ্রামীণ এবং ৭৬.৫ শতাংশ শহরাঞ্চলের অধিবাসী এবং মুসলিমদের গ্রামীণ অধিবাসী হল ৯.৮ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে এদের জনসংখ্যার বার ১৬.৩ শতাংশ। অতএব দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশ গ্রামের অধিবাসী এবং ২২ শতাংশ শহরের বাসিন্দা। মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই হিসাবটি হল ৩৪ শতাংশ গ্রামীণ এবং ৬৬ শতাংশ শহরের অধিবাসী। কাজেই মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শহরাঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। ভারতের জনসংখ্যার বৃদ্ধি বিচার করলে দেখা যায় যে জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি কিছুটা বেশি। এর সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে মুসলিমদের শহরাঞ্চলের বাসস্থান অপেক্ষাকৃত বেশি রকম অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং দারিদ্র দ্বারা প্রভাবিত। অধিকাংশ জনবিজ্ঞানীর মতে মুসলিমদের শহরাঞ্চলের বাসস্থানে মৃত্যুহার কম। হিন্দু জনগোষ্ঠীর বৃদ্ধি হার কম কারণ এখানে মৃত্যুহার খুব বেশি। কারণ এই জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই গ্রামীণ বাসিন্দা।

৩.৮ জনগোষ্ঠী ঃ ধর্ম

আনুপাতিক ভিত্তিতে আলোচনা করলে দেখা যায় লাক্ষাদ্বীপ এবং জম্মু এবং কাশ্মীরে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি। অপরদিকে নাগাল্যান্ড এবং মেঘালয়ে খ্রিষ্টান জনসংখ্যার আধিক্য লক্ষিত হয়। পাঞ্জাবে শিখ গোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি এবং অরুণাচলপ্রদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের প্রায় ৬০ শতাংশ অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরালা এবং তামিলনাড়ুতে বসবাস করে এবং পাঞ্জাবে সমগ্র শিখগোষ্ঠীর প্রায় ৭৯ শতাংশ দেখা যায়। চণ্ডীগর, দিল্লি ও হরিয়ানায় সামগ্রিক জনসংখ্যার যথাক্রমে প্রায় ২৫ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ৬ শতাংশ হল শিখ ধর্মাবলম্বী। ভারতীয় জনসংখ্যার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল যে ধর্মীয় অপ্রধান গোষ্ঠীগুলির প্রধান গোষ্ঠীগুলি অপেক্ষা শিক্ষার ও স্বাক্ষরতার হার অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। খ্রিষ্টান, জৈন, ইহুদি, পার্সি জনগোষ্ঠী এই ধরনের বিষয় উপস্থাপন করে। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিয়া সম্প্রদায় একটি অতীব ক্ষুদ্রগোষ্ঠী। এদের মধ্যে খ্রিষ্টান এবং পার্সীদের তুলনায় সাক্ষরতার হার বেশি। ভারতীয় বহুমুখী জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বহু বিস্তৃত জনসংখ্যা রয়েছে তার মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। জনবিজ্ঞানের নানা ঘটনা বিশ্লেষণে এগুলি বিশেষ সাহায্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করে।

৩.৯ জনসংখ্যা ঃ বৃদ্ধি ও সমস্যা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থানের তীব্র ঘাটতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাব। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদার মাত্রা

অত্যধিক হয়ে উঠে। এর ফলে অরণ্য, মৃত্তিকা, জল, খনিজ দ্রব্য এবং জ্বালানী সম্পর্কিত সম্পদের পরিমানে সঙ্কটের উদ্ভব হয়। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি যথোপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে ভারতীয় জনসংখ্যা বিভৎস আকার ধারণ করবে এবং এর ফলে দেশ ও জনজীবন ধ্বংস হবে। এমতাবস্থায় ভারত তার জনসংখ্যা নিয়ে এক বিব্রত অবস্থার সম্মুখীন। সরকারি তরফ থেকে এই সমস্যাকে প্রাথমিকভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। জন্মহার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাস করার সঠিক প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের মত বহুবিধ অনুন্নত জাতি, আদিবাসী ও ধর্মগোষ্ঠী সমন্বিত দেশের মধ্যে বাস্তবতা ভিত্তিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগের কাজ খুব একটা সহজ নয়। তাহলেও এবিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমগ্র দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনাই ভারতের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে বহুলাংশে সমাধান করে দিতে পারে যদি জনমনে এর প্রকৃত প্রচার করা হয়।

ভারতের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা এবং তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল বিষয়ে আলোচনার পূর্বে দেশের জননীতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উল্লেখ এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রথমেই জাতীয় জননীতির পশ্চাৎপটটি উপস্থাপন আবশ্যিক হিসেবেই দেখা দেয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নকালে (১৯৫১-৫৬) ভারত সরকারের যোজনা কমিশন অনুভব করে যে দেশের সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট জননীতি প্রয়োজন এবং এই ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনাকেই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়। এর ফলে যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হবে তাই-ই নয় — জনস্বাস্থ্য বিশেষ করে মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষিত হবে। যদিও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি তখনই কার্যকরী করা হয় তাহলেও এই কার্যসূচির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পড়েছিল। কারণ এই সময়েই সরকার সময় ভিত্তিক এবং লক্ষ্যমাত্রা প্রভাবিত কর্মকাণ্ডের সূচনা করে স্থূল মৃত্যুহারকে ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে হাজার প্রতি ৩৯ থেকে হাজার প্রতি ৩৫-এ নামিয়ে আনার বিশেষ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। অবশ্য যোজনা কমিশন এই প্রচেষ্টার প্রকৃতি এবং সামাজিক দৃষ্টিগুলির পরিবর্তন বিষয়ে উপলব্ধি করেনি। পরিকল্পনা রূপায়ণ বাবাদ অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করা ছাড়াও এই অভিলক্ষ্যটিকে সফল করতে এই উপলব্ধির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

এর পরবর্তী দশ/পনের বছর খুব একটা কাজ হয়নি তবে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিনিধিদের সাহচর্যে প্রাথমিক গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। এর ফলে পূর্ব সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং নবলব্ধ জ্ঞানরাজির মিলন-মিশ্রণের ফলে একটি ব্যাপক জাতীয় জননীতি গৃহিত হয় এবং তার বিস্তারিত বিবরণ ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তদানীন্তন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী কর্তৃক লোকসভায় উপস্থাপিত হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে ভারতের উন্নয়নের জন্য উর্বরতা-নিয়ন্ত্রণের বহুবিস্তৃত ভূমিকার বিষয় উল্লেখ ছাড়াও এই জননীতি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উল্লেখ করে। সরকারি নীতি অনুযায়ী যে প্রচেষ্টা গৃহিত হবে তাতে আমরা আশারাখি যে এই পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই জনসংখ্যার হাজার প্রতি ৩৫ থেকে হাজার

প্রতি ২৫এ জন্মহার নামিয়ে আনা সম্ভব হবে। এর মধ্যে থাকবে একটি বিশেষ বিষয় যেমন মেয়েদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বিবাহের বয়স হবে ১৮ বছর এবং ছেলেদের এটি হবে ২১ বছর। স্বেচ্ছা নির্বীজকরণের জন্য আর্থিক উদ্দীপক হিসেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করণ; স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান এবং শিশু পুষ্টি বিষয়ক ঘটনা। জোরপূর্বক এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্বীজকরণ ছাড়াও উপরোক্ত কার্যধারাগুলি খুব ধীর ও সমতারক্ষা করে পরিচালিত হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এই ধরনের জোরপূর্বক নির্বীজকরণকে মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। কাজেই এই সময়ে জনগণের মধ্যে বিশেষ বিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তনের পর এই কঠোরতা অবদমিত হতে থাকে। ভারতীয় জনমনের এই বিক্রিয়াপূর্ণ গতিবিধির কথা বিবেচনা করে পরবর্তীকালে এই বিষয়টিকে শিথিল করা হয় তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রকল্পটিকে এতটুকু গুরুত্বহীন করা হয়নি। এই সময় পরিবার পরিকল্পনার একটি বিশেষ কৌশল গৃহিত হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে একটি সরকারি সবিস্তার জনসংখ্যা বিবৃতির মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনাকে সমগ্র উন্নয়ন প্রকল্পের একটি অখণ্ড অংশ বলেই স্বীকৃতি দান করা হয় তবে এই বিষয়টি উল্লেখ থাকে যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে পূর্ববর্তী জাতীয় জননীতি, ১৯৭৬ এর মত এই নীতিটিও পূর্বের মত একটি বিবৃতি হিসেবেই পরিগণিত হয় — এটি বিধেয়ক (Bill) অথবা আইন হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। এই প্রসঙ্গে একমাত্র বিবাহের বয়স সংক্রান্ত বিষয়টি আইন হিসেবে নির্দেশিত হল — মেয়ে ও ছেলেদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ২১ বছর হবে।

৩.১০ জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার বিশেষ অগ্রগতি না হওয়ার কারণে চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যোজনা কমিশন ১৯৭৯ এ জননীতির উপর একটি কর্মীগোষ্ঠী নিয়োগ করে। এই কর্মীগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী জনসংখ্যা নীতিগ্রহণে পরামর্শ দান করে। এর মাধ্যমে স্থির হয় যে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র দেশের **নীট জনন হার** (NRR) বর্তমান ১.৬৭ থেকে ১ এ নামাতে হবে। এই দীর্ঘমেয়াদী কর্মপদ্ধতিই নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল এবং এটি ২০০১-খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

১. পরিবারের গড় আকৃতি ৪.৩ শিশু থেকে কমিয়ে ২.৩ শিশু করতে হবে।

২. জনসংখ্যার হাজার প্রতি ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের জন্মহার কমিয়ে ফেলা হবে। প্রতি হাজারে বর্তমান ৩৩ স্তর থেকে কমিয়ে এটি ২১ করা হবে।

৩. হাজার প্রতি জনসংখ্যার মৃত্যুহারও ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ থেকে কমিয়ে ৯ করা হবে এবং শিশুমৃত্যুর হার বর্তমানের ১২৯ থেকে হ্রাস করে ৬০ এ আনা হবে। এই সংখ্যাটি আরও নিচে নামাবার প্রচেষ্টা গৃহিত হবে।

৪. ২২ শতাংশ যোগ্যতা সম্পন্ন দম্পতিকে ১৯৭৯-৮০ তে পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সুরক্ষা দান করা হয়েছে সেটি বৃদ্ধি করে ৬০ শতাংশ করতে হবে।

৫. বিংশ শতাব্দীর অন্তিম পর্যায়ে ভারতের জনসংখ্যা মোটামুটি ৯০০ মিলিয়নে রাখতে হবে এবং ২০৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জনসংখ্যা ১২০০ মিলিয়ন সুস্থিত করা হবে।

১৯৯১ আদমশুমারির এবং অন্যান্য জনবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ও অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। এই ধরনের ফলাফলে শঙ্কিত হয়ে সরকারের পরিবার কল্যাণ বিভাগ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় গতিবেগ প্রদানের জন্য একটি কার্যকরী প্রকল্প রূপায়ণ করে। বেসরকারি বিশেষজ্ঞগণ এবং প্রতিনিধিদের মত অনুযায়ী এই কার্যকরী প্রকল্পটির ১৯৭৬ এর জননীতি তুলনায় খুবই সীমিত ক্ষমতা ছিল এবং থাকলেও সেটি সঠিক প্রয়োগ করতে পারেনি। যাইহোক এই ধরনের সীমিত কর্মধারা রূপায়ণের পশ্চাৎপটেও কেরালা, তামিলনাড়ু, গোয়া এবং মিজোরামের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সাফল্য এবিষয়ে প্রণিধান যোগ্য। লক্ষনীয় বিষয় যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আলোচ্য রাজ্যগুলির সাফল্যকে পৃথিবীর যে কোন দেশের সমরূপী কর্মসূচীর সঙ্গে তুলনীয়। এছাড়া পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটকে মাঝারি ধরনের সফলতা মিলেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে চারটি বৃহৎ রাজ্য যেমন উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং রাজস্থানে আজও শোচনীয় ফল দেখা দিয়েছে। বিহারে এবং রাজস্থানে সন্দেহাতীতভাবে সমগ্র পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণে অতীব নিকৃষ্ট ধরনের অবদান উপস্থাপন করেছে। প্রসঙ্গক্রমে এই চারটি রাজ্যের (বর্তমানে সাতটি) একত্রিত জনসংখ্যার হার সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। কাজেই সর্বভারতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার এই রাজ্যগুলি সফলতা বা অসফলতা সমগ্র জাতীয় উদ্যোগটির একটি বিশেষ বাঁক হিসেবে চিহ্নিত হয়।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) পূর্ববর্তী পরিকল্পনার বিষয়গুলিকে আরও জোরদার করে সমগ্র প্রয়াসটিকে আরও কার্যকরী করে তোলা হয়। ১৯৯১ এর আদমশুমারিতে ভারতের জনসংখ্যা ৮৪.৩৯ কোটিতে পৌঁছাল। ভারত সরকারের নিকট স্বাভাবিকভাবেই এই জনবিস্ফোরণ একটি বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়াল এবং একে মোকাবিলা করতে আরও শক্তিশালী এবং ফলদায়ক করে তুলতে ভারত সরকার একটি অতীব কার্যকরী প্রকল্প গ্রহণ করলেন। এগুলি নিম্নরূপ—

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কেবলমাত্র বন্ধ্যাত্বকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেই চলবে না; প্রকৃত জনসংখ্যা কত কমেছে তার প্রতি প্রাথমিক দৃষ্টিদান আবশ্যিক।

২. শহরের বস্তি এলাকাগুলিতে পরিবার পরিকল্পনা খুব বেশি ভাবে কাজে লাগনোর জন্য নতুন কার্যক্রম প্রণয়ন।

৩. সার্বজনিক অনাক্রম্য কার্যক্রমের ত্বরিত রূপায়ণ এবং শিশুমৃত্যুর সৃষ্টিকারী ব্যাধি সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও প্রসূতি মৃত্যু রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪. প্রচলিত গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদির গুনমানের উন্নতির সঙ্গে নতুন ধরনের গর্ভনিরোধকের সরবরাহ।

৫. বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে কাজে লাগাতে হবে।

৬. তথ্য, শিক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের যাবতীয় স্থানীয় সমাজ সংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করে মানুষকে এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. উচ্চ পর্যায়ের সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আন্তর্বিভাগীয় সমন্বয় কার্যটিকে আরও জোরদার করে তুলতে হবে।

৩.১১ জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

ভারতের মত বিশাল একটি দেশে যেখানে জনবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে সেখানে জনসংখ্যা হ্রাসকরণ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়ই নয় — এটি অপরিহার্য। ভারতীয় জনগণের স্বার্থেই জনসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ যে ভাবেই হোক করতেই হবে। একথা অনস্বীকার্য যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত একটি ব্যাপক, গভীরতা বিশিষ্ট এবং জটিল ধরনের সমস্যা মোকাবিলা খুব একটা সহজ কাজ নয়। লক্ষ্য করার বিষয় যে বহুদিন ধরে নানাধরনের প্রকল্প প্রণয়ন এবং সেগুলির রূপায়ণের সাহায্যে সরকারি প্রচেষ্টা গৃহিত হয়ে চলেছে কিন্তু তার মাধ্যমে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতীয় জননীতির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রভূত গুরুত্বদান করা হয়েছে। মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে সহজ কিন্তু জন্মহারকে কমিয়ে আনা বেশ দুরূহ। ধর্ম, বিশ্বাস-সংস্কার, রাজনীতি বহুক্ষেত্রে জন্মহার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে চলেছে। মনে রাখতে হবে যে ভারতের জনসংখ্যার সমস্যাকে খাদ্য ত্রান ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না। যদি জনগণকে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হয় এবং অন্যকোন বিষয় পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা না হয় তাহলে দেখা যাবে যে খাদ্য সরবরাহের উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি করে যাবে এবং তারপর আবার অনাহার, অর্ধাহার শুরু হবে। কাজেই এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ উর্বরতা হ্রাস। যদি উর্বরতা বৃদ্ধি পায় তাহলে পরিনামে মরণশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। এবিষয়টি স্বীকৃত যে উর্বরতা রোধ ব্যতিরেকে মরণশীলতাকে হ্রাস করলে তার মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী সুবিধা পাওয়া যায় এবং তা অচিরেই অনিশ্চিত হয়ে উঠে। ভারতের জনসংখ্যা যদি বাধাহীনভাবে বেড়ে যেতে থাকে তাহলে সারা পৃথিবী উজাড় করে দিলেও খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না। এছাড়া এই বাধাবিহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি একদিন এমত অবস্থার সৃষ্টি করবে যে এই বিশাল ভূখণ্ডে মানুষ দাঁড়াবার জায়গা পাবে না। অতএব বিদেশ থেকে খাদ্য ত্রান গ্রহণের মাধ্যমে প্রচন্ডভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যাকে বাঁচাবার যুক্তিযুক্ত পথ হতে পারে না। দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থাগুলির মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে হবে।

ভারতের জনগণের বিশাল অংশ অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, নানা ধরনের কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস অনুসরণকারী হিসেবে পরিগণিত। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা। কাজেই কেবলমাত্র লক্ষ্যমাত্রা-যুক্ত প্রচেষ্টা প্রয়োগের মাধ্যমে উর্বরতা হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে জনমনের পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে করা যাবে না। এই বিশেষ ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত ও সহজবোধ্য তথ্য প্রদান, শিক্ষা প্রসার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মূলক কর্মধারার ব্যবস্থাপনা জনমনে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির প্রতি প্রভাব সৃষ্টি করবে। সচরাচর দেখা যায় যে শহরাঞ্চলের নগরবাসী এবং ধনীব্যক্তিরা যারা অতিসহজে সন্তান প্রতিপালনে সক্ষম তারা দ্রুত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। অপরদিকে যাদের সন্তান পালনের বিশেষ অক্ষমতা রয়েছে, চরম দারিদ্র্য যাদের সাধারণ জীবন ধারাকেও ব্যাহত করেছে সেই জনগোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোন উৎসাহই নেই। গ্রামীণ মানুষদের মধ্যে নানা ধরনের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে যে এরা জন্ম শাসনকে এড়িয়ে যায়। গ্রামের মানুষদের মধ্যে বহুকালের একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রকটভাবে বিরাজিত — ''জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।'' অর্থাৎ জন্ম কোন বিশেষ শক্তির দান, এবং যখন তিনি জীব সৃষ্টি করেছেন তখন আহার দানের দায়িত্বও তাঁর। এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায় যে এই জনগোষ্ঠী জন্মরহস্য সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত নন এবং সন্তান জন্মদানের মধ্যে যে প্রতিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়িত্ব এবং কর্তব্য জড়িত সে বিষয়েও এরা একেবারেই উদাসীন। অনেক সময় জন্ম শাসনকে পাপ কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়। ভগবানের সৃষ্টির এই প্রয়াসকে অবরুদ্ধ করার মধ্যে ন্যায় ও পবিত্রতার বিরুদ্ধ আচরণ বলেই বিবেচিত হয়। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বন্ধনহীন গতিটিকে রোধ করতে হলে সাধারণ অশিক্ষিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে দূর করতেই হবে। এদের মনে দীর্ঘকালীন সংস্কারগুলির সমাপ্তি রচনা করতে হবে, তা না হলে সমস্ত রকমের বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং বাস্তবমুখী প্রয়াস সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য বিফলে পরিণত হবে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক যে কোন কার্যক্রম বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলের মাধ্যমে প্রণীত হবে এবং এগুলি বিচক্ষণতার সঙ্গে রূপায়িত হবে। এই ধরনের কার্যক্রম বাধ্যতামূলক, ভীতিপ্রদর্শনমূলক না হয়ে হবে প্ররোচনামূলক।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার জন্য, অনেক জনবিজ্ঞানীর মতে, সর্বাপেক্ষা কার্যকরী এবং সুফলদায়ক গর্ভ নিরোধক হল জনগণের বিকাশ। মানুষের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে কেবলমাত্র পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচি এবং জননীতি প্রয়োগ করেই উর্বরতা হ্রাস সম্ভব নয় তবে একে বৃহত্তর ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার পশ্চাৎপটে মূল্যায়ন করতে হবে। জন্মহার হ্রাসের পশ্চাতে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে — (১) কৃষিকেন্দ্রিক জীবন থেকে শিল্পকেন্দ্রিক জীবনের মধ্যে গাঠনিক রূপান্তর এবং উত্তর শিল্পকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা; (২) সামাজিক বিকাশ, প্রাথমিকভাবে শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষা। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ প্রয়াসটি জৈবিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং পারিপার্শ্বিকতা ভিত্তিক। কাজেই সুষ্ঠু ভাবে এই ধরনের প্রকল্পকে রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন

বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে মানব মন, চিন্তাধারা ও সমস্যাসমূহের পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার একটি অখণ্ড চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। সমস্যাটির বিভিন্নরূপী প্রকৃতি ও পরিস্থিতির অখণ্ড উপলব্ধিই সংশ্লিষ্ট গবেষক ও কর্মীদের সমাধানে প্রকৃত পথ নির্দেশ দান করবে।

৩.১২ সারাংশ

সমগ্র পৃথিবীতে জনসংখ্যায় ভারত দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যার ১৫.৩ শতাংশ মানুষের বসবাস ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায়। ভূমিভাগের দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে সমগ্র পৃথিবীর ভূমিভাগের মাত্র ২.৫ শতাংশ ভারতে রয়েছে। কাজেই স্বল্প ভূমিভাগে জনসংখ্যার চাপ খুব স্বাভাবিকভাবেই বিপর্যয়ের সূচনা করেছে। প্রতি দশ বছর অন্তর ভারতে জনগণনা করা হয়। সরকারিভাবে জনগণনার প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। তারপর প্রতি দশবছর অন্তর এই কাজটি পরিচালিত হয়ে চলেছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জনগণনার সর্বমোট জনসংখ্যা হল ১০২ কোটি, ৭০ লক্ষ, ১৫ হাজার, ২৪১ জন। ভারতের জনসংখ্যা তীব্রগতিতে বেড়ে চলেছে। জনবিজ্ঞানীরা হিসাব করেছেন যে এই হারে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪৫ কোটিতে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে কোন দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। কাজেই একটি বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনসংখ্যাকে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। জনগণনা জনসংখ্যার একটি সমাজতাত্ত্বিক রূপ। কোন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমর্থিত হয় না। তবে একথা স্মরণীয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যেমন একটি ভয়াবহ ঘটনা ঠিক তেমনি জনসংখ্যা হ্রাসও খুবই সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে পৃথিবীর শিশুজন্মের ছয়ভাগের পাঁচভাগই অনগ্রসর দেশগুলিতে জন্মাচ্ছে। এর ফলে অনগ্রসর দেশগুলিতে জনসংখ্যার অত্যাধিক চাপে সাধারণ জীবনের নাম ত্বরিত গতিতে নিম্নগামী হচ্ছে। ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে এই ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২৬৭ জন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে যে ঘনত্ব ছিল ৭৭ জন। এটি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তবে এই ঘনত্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। মিজোরাম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, জম্মু ও কাশ্মীর, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি রাজ্যে জনঘনত্ব বেশ কম। আবার বেশি জনঘনত্বের রাজ্য হল দিল্লি, চন্ডীগর, পণ্ডিচেরী ইত্যাদি। জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল লিঙ্গানুপাতিক জনগোষ্ঠীর বিস্তারণ। ভারতে পুরুষ এবং লিঙ্গ অনুপাতে বৈষম্য দেখা যায়। বিভিন্ন আদমশুমারির বিবরণীতে একথা প্রমাণিত। এর পর রয়েছে সাক্ষরতার হার। ভারতে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫২.১১ জন। আবার পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সাক্ষরতার হার বেশ কম। দেশের অনুন্নত এবং পশ্চাৎবর্তী অবস্থার জন্য এই বিষয়টি দায়ী বলেই মনে করা হয়। ভারতের মধ্যে কেরালাই একমাত্র রাজ্য যেখানে স্বাক্ষরতার হার শতকরা ১০০ জন। মধ্যভারতের রাজ্যগুলির স্বাক্ষরতার হার তুলনামূলকভাবে কম।

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জন তপশিলী জাতিভুক্ত। এই জাতিদের সমগ্র জনগোষ্ঠীর অর্ধাংশ উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানায় দেখা যায়। এরা শতকরা ৮৫ ভাগই গ্রামীন অঞ্চলের বাসিন্দা। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে চামার জাতি সর্ববৃহৎ। অপরদিকে আদিবাসিরা সর্বভারতীয় জনসংখ্যার ৯ শতাংশ সৃষ্টি করেছে। সমগ্র ভারতে প্রায় সাড়ে তিনশয়ের মত আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে। সমগ্র আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশ পূর্ব এবং মধ্যভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দা। এদের সংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগই আদিবাসী। ভারতের সর্ববৃহৎ আদিবাসীর নাম গন্দ এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আদিবাসী হল আন্দামানীজ — আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা। আদিবাসীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার খুব কম। দীর্ঘকাল বঞ্চনার শিকার হয়ে এই সব জনগোষ্ঠী প্রচন্ড পিছিয়ে পড়েছে। আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক জীবন বিভিন্ন ধরনের। কোন কোন আদিবাসী এখনও সেই আদিম পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। এদের সমাজ-অর্থনীতি দুর্ভাগ্যজনক। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরনের ৭৫টি আদিবাসি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। এদের জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে। ভারতের প্রায ১০৩ কোটি জনসংখ্যা বহুবিধ ধর্ম ও জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এরা সারাভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ, বস্ত্র ও বাসস্থানের তীব্র ঘাটতি। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যনীয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদার মাত্রা অত্যধিক হয়। এই কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন অরণ্য, মৃত্তিকা, জল, জ্বালানী, খনিজদ্রব্য প্রভৃতির পরিমাণে তীব্র সঙ্কটের উদ্ভব হয়। বর্তমানে ভারত তার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার বিষয়ে মহা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। কাজেই এই প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করতে ভারত সরকার এই বিশেষ সমস্যাটিকে অগ্রাধিকার দান করেছেন। জন্মহার নিয়ন্ত্রণই এই সমস্যার জটাজাল থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায়। এই পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য নানা ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতের মত অনুন্নত জাতি, আদিবাসী এবং বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীভুক্ত মানুষদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রনের পদ্ধতি সমূহ সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তোলা প্রায় অসম্ভব। তাহলেও এবিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করে দেশবাসীকে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সচেতন করে তোলার ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত সরকারের যোজনা কমিশন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে একটি নির্দিষ্ট জননীতি প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করে এবং এই পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনাকেই প্রাথমিক গুরুত্ব দান করা হয়। এর মাধ্যমে কেবল জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই নয় — মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা গৃহিত হবে। ইতিমধ্যে মৃত্যুহারকে কমিয়ে আনার জন্য সরকার বিশেষ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এর বেশ কিছুদিন পর জন্মহার নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে নানা ধরনের অভিজ্ঞতা এবং নতুন জ্ঞান আহরণের ফলে একটি ব্যাপক জাতীয় জননীতি গ্রহনের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা গৃহিত হয়। এতে স্থির হয় যে উর্বরতা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে হবে। তাছাড়া একটি বাস্তবানুগ

প্রতিশ্রুতি গৃহিত হয় — জনসংখ্যার হাজার প্রতি ৩৫ থেকে হাজার প্রতি ২৫এ জন্মহার নামিয়ে আনতে হবে। এর সঙ্গে বিবাহের ন্যূনতম বয়স স্থিরীকরণ, স্বেচ্ছা নির্বীজকরণের জন্য আর্থিক অনুদানের পরিমান বৃদ্ধি, স্ত্রীশিক্ষার অগ্রাধিকার প্রদান এবং শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক উন্নতি বিধান। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে জন্মহার নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে যথেষ্ট উদ্দীপনা সহকারে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তবে জনসাধারনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক কোন কিছুই করা যাবে না। বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যার প্রকৃতি পর্যালোচনা করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার নানা ধরনের কার্যকরী পরিবর্তন ও পরিবর্জন হতে থাকে। পূর্বকালীন অসফলতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নব উদ্যোগে পরবর্তী পরিকল্পনা প্রণীত হয় এবং সেগুলির সার্থক রূপায়ণে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়।

ভারতের মত বিশাল একটি দেশ যেখানে জনবিস্ফোরণ ঘটে চলেছে সেখানে জনসংখ্যা হ্রাসের বিষয়টি একটি জীবন-মরণ সমস্যা। সেই সমস্যাকে সার্বিক ভাবে প্রতিহত করার প্রতিবন্ধকতার সীমা-পরিসীমা নেই। ভারতীয় জননীতির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসে জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ গুরুত্বদান করা হয়েছে। বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীকে বাঁচাবার প্রয়াস কখনও যুক্তি যুক্ত নয়। এ বিষয়ের কার্যকরী পদক্ষেপ হল জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থাগুলির মৌলিক পরিবর্তন।

৩.১৩ অনুশীলনী

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন —

১. আদমশুমারি কাকে বলে? এর উদ্দেশ্য কি? ভারতে কখন আদমশুমারি শুরু হয়েছিল?

২. জনসংখ্যার ঘনত্ব কি? ভারতের কোন কোন রাজ্য অধিক জনঘনত্ব সম্পন্ন?

৩. জনসংখ্যার আকার বলতে কি বোঝেন?

৪. ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা হারে তপশিলী জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা কত? কোন কোন রাজ্যে এই জাতিভুক্ত মানুষদের সংখ্যা বেশি।

৫. তপশিলী আদিবাসিরা ভারতীয় জনসংখ্যার কত শতাংশ সৃষ্টি করেছে? ভারতে এদের বিস্তারণ সম্পর্কে বলুন। এখানের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র আদিবাসীর নাম ও বাসস্থান উল্লেখ করুন।

৬. ২০০১ আদমশুমারিতে ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যা কত?

৭. ভারতে ছেলে ও মেয়েদের ন্যূনতম বিবাহের বয়স কত? এটি কিভাবে স্থির হয়েছে এবং কেন?

৮. ভারতের কোন কোন আদিবাসীদের মধ্যে বহুপতি মূলক বিবাহ দেখা যায়? এই বিবাহের ধরনটি কি?

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর বিস্তারিত উত্তর দিন —

১. ভারতীয় জনসংখ্যার আকার বিষয়ে একটি তথ্য ভিত্তিক আলোচনা করুন।

২. ভারতীয় জনসংখ্যা তপশিলী জাতি ও আদিবাসীদের স্থান নির্ণয় করে একটি উদাহরণ ভিত্তিক বিবরণ দিন।

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কি কি প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে? ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ ফলাফল কি?

৪. ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কি কি পরিকল্পনা রচিত এবং পরিচালিত হয়েছে? এগুলির বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ?

৫. জনবিস্ফোরণ কাকে বলে? জনবিস্ফোরণ মোকাবিলায় ভারত সরকার কি কি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন?

৬. জনবিজ্ঞানীদের মতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি কি? এবিষয়ে আলোচনা করুন।

৩.১৪ উত্তর সংকেত

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর ঃ

১. একটি ভূখণ্ডে যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে মানুষের সংখ্যা গণনা করা হয় তখন তাকে আদমশুমারি বলা হয়। প্রতি বছর কর বৃদ্ধির মাধ্যমে একে প্রকাশ করা হয়। আদমশুমারির মাধ্যমে দেশের মানুষের কেবলমাত্র সংখ্যারই হ্রাস-বৃদ্ধি নয় আরও বহু বিষয় যেমন পেশা, শিক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষ তথ্য লাভ করা যায়। এই সকল তথ্য দেশের নানা ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয়। ভারতে ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আদমশুমারি শুরু হয়। সেই সময় থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর এই কাজ আজও হয়ে চলেছে।

২. জনঘনত্বের অর্থ হল কোন দেশে বা অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কত লোক বাস করে অথবা আয়তন অনুসারে লোকসংখ্যা কত। উক্ত দেশ বা অঞ্চলের উপর জনসংখ্যার চাপ কত তা বোঝাবার জন্য জনবসতির ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়। ভারতের কয়েকটি রাজ্য বিশেষ জনঘনত্বপূর্ণ; এগুলি হল দিল্লি, চণ্ডীগড়, পণ্ডিচেরী, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি।

৩. কোন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাসূচক বিশ্লেষণ, সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন — এর বৃদ্ধি, বয়স অনুযায়ী বিভাজন, লিঙ্গ ভিত্তিক পার্থক্য, উর্বরতা, মরণশীলতা, প্রব্রজন ইত্যাদির সুষ্ঠু বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে উক্ত জনগোষ্ঠীর যে পরিমণ্ডলটি বিকশিত হয় তাকেই বলা হয় জনসংখ্যার আকার।

৪. ভারতের সার্বিক জনসংখ্যার শতকরা ১৬ জন তপশিলী জাতিভুক্ত। ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই এদের লোকসংখ্যা ছড়িয়ে থাকলেও কয়েকটি রাজ্যে এই জাতিভুক্ত মানুষদের উপস্থিতি খুব বেশি।

এই রাজ্যগুলি হল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানা। এই রাজ্যগুলিতে একত্রে সমগ্র তপশিলী জাতির মানুষদের প্রায় অর্ধাংশ বাস করতে দেখা যায়।

৫. আদিবাসী সম্প্রদায় ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ সৃষ্টি করেছে। সমগ্র আদিবাসী জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশ পূর্ব ও মধ্যভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে দেখা যায়। পশ্চিম ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানে রয়েছে ২৮ শতাংশ আদিবাসী দক্ষিণ ভারতে মোটামুটিভাবে ৬ শতাংশ দেখা যায়।

৬. ২০০১ আদমশুমারিতে ভারতের সর্বমোট জনসংখ্যা হল ১০২ কোটি, ৭০ লক্ষ, ১৫ হাজার ২৪১ জন।

৭. ভারতে ছেলেদের এবং মেয়েদের ন্যূনতম বিবাহের বয়স হল যথাক্রমে ২১ বছর এবং ১৭ বছর।

৮. দক্ষিণভারতের টোডা আদিবাসী এবং উত্তরাঞ্চলের খাসা আদিবাসীদের মধ্যে বহুপতিমূলক বিবাহ দেখা যায়। এই বিবাহের ধরন অনুযায়ী কয়েকজন (প্রধানতঃ কয়েকভাই) মিলে একত্রে একটি মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে।

(খ) প্রশ্নাবলীর উত্তর সংকেত

এখানে একক নং ৩ এর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশ্নগুলির উত্তর-সংকেত দেওয়া হল। এগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে উত্তরসমূহ তৈরি করুন। সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহ ভাল করে পড়ুন।

১. এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যে অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে তা হল ৩.১.২ ও ৩.১.৩ এবং ৩.১.৪। এগুলি ভালভাবে পড়ে প্রশ্নটির প্রয়োজনানুযায়ী উত্তর দিন।

২. তপশিলী জাতি এবং আদিবাসী বিষয়ক এই প্রথাটির উত্তরের জন্য ৩.৫; ৩.৫.১; ৩.৬; ৩.৬.১ ও ৩.৬.২ দেখতে হবে। তপশিলী জাতির জন্য ৩.৫ এবং ৩.৫.১ অনুচ্ছেদ দুটি নির্দিষ্ট হয়েছে। আদিবাসীদের বিষয়ে উত্তরের জন্য ৩.৬; ৩.৬.১ এবং ৩.৬.২ দেখুন।

৩. এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তৃতীয় এককের মধ্যে যে অনুচ্ছেদগুলি দেখতে হবে তা হল ৩.৬.৩; ৩.৭.২ এবং ৩.৮.১।

৪. ৩ নং এককের ৩.৯ অনুচ্ছেদ, ৩.৯.১ ও ৩.৯.২ অনুচ্ছেদগুলিতে পাওয়া যাবে।

৫. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য ৩ নং এককের মধ্যস্থিত ৩.৯.৩ ও ৩.৯.৫ অনুচ্ছেদ দুটি দেখতে হবে।

৬. ৩ নং এককের ৩.৯.৬ অনুচ্ছেদেই এই প্রশ্নের উত্তরটি রয়েছে। এবং ৩.৯.১ অনুচ্ছেদটিও যুক্ত করেন।

৩.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

Guha, Sumit — Health and population in South Asia from earliest time to the present, New Delhi, Parmanent Black, 2001.

Laroca, Arti — Population Explosion — a Contemporary Census, New Delhi, Agricole Publishing Agency, 1990.

Medge, J. — Tools of Social Sincence, New York, Longman, Green of Co. Ltd. 1953.

Mahadevan K. (Ed) — Women and Population Dynamics, New Delhi, Sage Publications, 1989.

Mahadevan, K. and P. Krishnan (Ed) — Methodology for Population Studies and Development, New Delhi, Sage Publications, 1993.

Narain, V. and C. P. Prakasan — Population Policy-Perspectives in Developed Countries, Bombay, Himalayan Publishing House, 1992.

Publications Division, Govt. of India — India-2002 : A Reference Annual, New Delhi, 2002.

Shah, Anup — Ecology and crisis of overpopulation : Future prospects for global sustainability, Edward Elgar, Cheltenham Eng : 1998.

Solomon, M. E. — Population Dynamics, London, Edward Arnold, 1969.

Thompson, W. S. — Population Problems, New York, Mc Grow-Hill Book Company, 1953.

Yadav, Saroj — Population Education-New policy, New Delhi, Shree Publishing House, 1988.

একক ৪ ❑ উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজন : বিভিন্ন কার্য-কারণের প্রভাব

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ প্রস্তাবনা

৪.২ উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজন : বিভিন্ন কার্য-কারণের প্রভাব

৪.৩ উর্বরতা এবং তার সামাজিক নির্ধারক

৪.৩.১ উর্বরতা হ্রাস : বিবাহ

৪.৩.২ উর্বরতা হ্রাস : বিভিন্ন সামাজিক পদ্ধতি

৪.৪ মরণশীলতা এবং তার সামাজিক নির্ধারণ

৪.৫ মরণশীলতার কারণ সমূহ

৪.৬ মানব প্রব্রজন — প্রকৃতি ও পরিস্থিতি

৪.৭ প্রব্রজন সংক্রান্ত সমস্যা

৪.৮ সারাংশ

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১০ উত্তরমালা

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১২ পরিভাষা

৪.০ উদ্দেশ্য

জনসংখ্যার আকার, বৃদ্ধি এবং হ্রাসের বিষয়ে পূর্বেকার এককগুলিতে যে ধরনের আলোচনা করা হয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিষয় যেমন উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজনকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তিনটি ঘটনার মধ্যে দুটি জৈবিক এবং একটি ব্যবহারিক। এই তিনটির সম্মিলিত কার্যকারিতা কিভাবে একটি জনগোষ্ঠীর আকৃতি-প্রকৃতিকে রূপায়িত করেছে সে বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনার উদ্দেশ্যেই এই এককটি রচিত হয়েছে। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর মত জৈবিক ঘটনাবলী অনুধাবন করলেই জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির পূর্ণ বিকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে না — কারণ এর মধ্যে বহু সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক

ও সাংস্কৃতিক বিষয় যুক্ত। এমতাবস্থায় একজন জনবিজ্ঞানীকে জনসংখ্যার পূর্ণ চিত্র দেখতে গেলে সংশ্লিষ্ট সমাজধারার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। এই এককটিতে সেই উদ্দেশ্যটিকে সম্মুখে রেখেই বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। মানব সমাজে জনসংখ্যার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব সৃষ্টিকারী উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজনের উপর নানা ধরনের কার্য-কারণের অতি নিকট সম্পর্ক রয়েছে এবং এই এককটির বিষয়বস্তুর আলোচনায় এগুলিকেই সর্বাধিক গুরুত্বদান করা হয়েছে। উর্বরতার সঙ্গে বিবাহগত অবস্থা, বিবাহকালীন বয়স, শিক্ষা, মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি ও অনুশাসন কিভাবে জড়িত এবং উর্বরতা হ্রাসে এদের গুরুত্ব কিরূপ তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এই এককটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মরণশীলতা এমন একটি ঘটনা যার হ্রাস এবং বৃদ্ধি দুইই জনসংখ্যাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মরণশীলতার ধারাও পরিবর্তিত হয়। বিকাশশীল দেশগুলিতে মরণশীলতার হার কম। কি কি কারণের জন্য মরণশীলতা নিম্নগামী তার বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ এই এককটির মধ্যে সন্নিবদ্ধ হয়েছে। একটি অতিপ্রাচীন পদ্ধতি হিসেবে প্রব্রজন কিভাবে দীর্ঘকাল ধরে অপ্রতিহত গতিতে জনসংখ্যা নির্ধারণে কাজ করে চলেছে সেই বিষয়টিকে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য এই এককটির মধ্যে নিহিত রয়েছে। ভারতীয় জনবিন্যাসে প্রব্রজনের গুরুত্ব আলোচনাতেও এই এককটি প্রভূত আলোক সম্পাত করেছে।

৪.১ প্রস্তাবনা

জনসংখ্যার তিনটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজনের সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করে প্রত্যেকটির কার্যকরী প্রভাব সমূহের বর্ণনার মাধ্যমে এই এককটির রূপদান করা হয়েছে। উর্বরতা সন্দেহতীতভাবে একটি জৈবিক ঘটনা। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এর জৈবিক বিষয়টি বিভিন্ন ধরনের সমাজ-সংস্কৃতিক গতি-প্রকৃতি ও চিন্তাধারার মধ্যে বিরাজিত। কিভাবে জৈবিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক বিষয়গুলি পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার একটি অখণ্ড পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য এই এককটির বিশেষ ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে। জন্মহার বৃদ্ধি যেমন জনসংখ্যাকে স্ফীত করে ঠিক তেমনি মৃত্যুহার হ্রাস পেলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। কাজেই এই এককটির মধ্যে উর্বরতা এবং মরণশীলতাকে পাশাপাশি রেখে বিভিন্ন বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে যাতে এই দুটি ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্ক ধারাটিতে সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নত ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক নানা প্রক্রিয়া মরণশীলতার হার নিঃসন্দেহে কমিয়েছে। অপরদিকে উর্বরতাকেও কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হ্রাস করার ব্যবস্থা গৃহিত হয়েছে। এগুলির প্রভাব জনসংখ্যার উপর কিভাবে পড়েছে সে বিষয়ে এখানে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। প্রব্রজনকে জনসংখ্যার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ধরা হয়েছে তাই-ই নয় — প্রব্রজন একটি জটিল পদ্ধতি এবং কিভাবে সেই জটিলতা সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে কেন্দ্র করেই এখানের আলোচনা বিশেষ রূপলাভ করেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের জনগোষ্ঠীই যুগযুগান্ত ধরে প্রব্রজনের দ্বারা প্রভাবিত। তবে কোথাও বেশী, কোথাও কম। প্রব্রজনের মাধ্যমে যেমন জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও চিন্তাধারার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার জন্য সমাজ মানসিকতারও আমূল পরিবর্তন ঘটে থাকে। এই এককটির মধ্যে আলোচ্য বিষয়টিকে বিশেষভাবে

চিত্রিত করা হয়েছে। ভারতীয় জনসংখ্যার নানা জাতীয় জৈবিক ও সাংস্কৃতিক মিলন-মিশ্রণের যে দীর্ঘকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার মূলে রয়েছে প্রব্রজনের বহুবিস্তৃত ইতিহাস।

৪.২ উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজন : বিভিন্ন কার্য-কারণের প্রভাব

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে জনবিজ্ঞানীর কাজ হল কোন এক অঞ্চলে জনসংখ্যা নিরূপণ করা, সেই জনসংখ্যার মধ্যে পূর্বের বছরগুলিতে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এরই উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার প্রকৃতি ও পরিস্থিতি কিরূপ হতে পারে তার উপরও আলোক সম্পাত করা জনবিজ্ঞানীর অধ্যয়ন অন্তর্ভূক্ত। এই বিশেষ কর্ম সম্পাদনে তিনি জন্ম, মৃত্যু এবং প্রব্রজনের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। এই সময় অর্থাৎ কর্মকালীন পর্যায়ে তিনি জন্মের ঘটনাগুলি থেকে মৃত্যুর ঘটনাসমূহের বিয়োগ দেন এবং অভিবাসন থেকে প্রবাসনকে একই ভাবে আচরণ করেন। জন্ম উর্বরতার উপর নির্ভরশীল এবং ঠিক একইভাবে মৃত্যুও মরণশীলতার উপর নির্ভর করে। অতএব এই তিনটি ঘটনা অর্থাৎ উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজন কোন এক অঞ্চলের জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে থাকে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে তিনটি ঘটনা — উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজন — মানুষের সমাজ, সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এগুলি সবই একদিকে সমাজের বিভিন্ন ধারায় নির্ধারিত আবার অপরদিকে তারা সামাজিক পর্যায়কেও নির্ধারণ করে। কাজেই একজন জনবিজ্ঞানীকে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন পরিসাংখ্যিক তত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজের কর্মধারার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। জন্ম ও মৃত্যু জৈবিক এবং অবশ্যম্ভাবী ঘটনা হলেও মানব সমাজ ও সংস্কৃতিতে এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ব্যবহার পদ্ধতি রয়েছে। কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার খুব বেশী হওয়ার কারণ কি? কোন একটি সম্প্রদায় গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ দলে দলে প্রব্রজিত হচ্ছে অথবা বাইরের মানুষ একটি বিশেষ অঞ্চলে দ্রুতগতিতে এসে পড়ছে? সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থার ধারার মধ্যে প্রবেশ না করতে পারলে এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না। জনসংখ্যার বৃদ্ধির মধ্যে জীব বিজ্ঞানীর ঘটনা কার্যকর হলেও এর উপর সমাজ মানসিকতার প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে আধিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কি উপায় অবলম্বিত হতে পারে সে বিষয় স্থির করতে হলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর রীতি-নীতি, আচার আচরণের বিষয় অবগত হতেই হবে। কোন জনবিজ্ঞানী কেবল একটি বিশেষ অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে কোন জনসংখ্যার বিচার করেন না — সেই জনসংখ্যার নানা চরিত্রও তার আলোচ্য বিষয়। তিনি জনসংখ্যাকে বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, পেশা এবং বিবাহগত অবস্থার উপর ভিত্তি করে নানা গোষ্ঠীতে অথবা পরিসাংখ্যিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। জনবিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত এই সকল লক্ষণগুলি সবই সমাজ ধারায় পরিশীলিত। কাজেই জনগণনা জনসংখ্যা এবং তাদের সামাজিক পরিস্থিতি উভয় ক্ষেত্রেরই তথ্য সরবরাহ করে থাকে। কোন মানব জনসংখ্যা সমাজ-সাংস্কৃতিক ক্রিয়া বিক্রিয়ার ঘটনাবলী থেকে দূরে থাকতে পারে না। এই কারণেই কোন জনসংখ্যার কেবলমাত্র জৈবিক বিষয়গুলির উদ্ঘাটন করে সামগ্রিক রূপ পাওয়া যাবে না — এটি পেতে গেলে জনসংখ্যার সামাজিক তাৎপর্যগুলির বিশ্লেষণ প্রয়োজন। জনসংখ্যার প্রকৃতির পশ্চাৎপটে সমাজ নানা ধরনের কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করে। কোন কোন সামাজিক উপাদান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ব্যাপ্তিতে সহায়তা করে। আবার কোন ধরনের উপাদান জনসংখ্যার হ্রাস করে। তবে এই দুই-এর মধ্যে ভারসাম্য প্রয়োজন। কোন সমাজ ব্যবস্থাই

অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে দেয় না। কাজেই পরিমিত খাদ্য সরবরাহ ব্যতিরেকে যদি জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে সেই পরিস্থিতি মরণশীলতাকে বৃদ্ধি করবে। এইভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি কমবে। আবার খাদ্যসরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে যদি অনুরূপভাবে জনসংখ্যাবৃদ্ধি না হয় সমাজধারা একটি অসুবিধা জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। কেবলমাত্র জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেই কোন সমাজের প্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না — সেই জনসংখ্যার মধ্যে কিভাবে আইন-শৃঙ্খলা রচিত হয় সেটি দেখা সমাজের আশুকর্তব্য বলেই বিবেচিত হয়। অনিয়ন্ত্রিত জনগোষ্ঠী সামাজিক শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে ফেলবে এবং সর্বক্ষেত্রে উদ্বেগ ও হতাশার উদ্ভব ঘটবে। এমন অবস্থার সূচনা ঘটলে সমাজকে অচিরেই সেই অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে প্রতিহত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি যেমন সমাজে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায় অপরদিকে তেমনি জনসংখ্যার ত্বরিত হ্রাস প্রাপ্তি সমাজে সংকট সৃষ্টি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সামাজিক অবস্থার সমন্বয় সাধন বিশেষভাবে জরুরী।

৪.৩ উর্বরতা এবং তাঁর সামাজিক নির্ধারক

উর্বরতা একটি জৈবিক ঘটনা হলেও জন্মহারের সাধারণ জৈবিক ব্যবস্থা দান ভুল পথই নির্দেশ করে থাকে। নানা ধরনের সামাজিক চিন্তাধারা জন্ম হার নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য মানবিক ব্যবহার প্রণালীর মত প্রজননও প্ররোচিত না হলে কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ সন্তান উৎপাদন হয় না। বিভিন্ন ধরনের গর্ভ নিরোধক পদ্ধতির ব্যবহার প্রমান করে যে উর্বরতা বরাবরই সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। আদিম জনগোষ্ঠীর সমাজ ধারাতেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। কাজেই মানব সমাজে এটি প্রাচীন। সমাজ কখনও তার সদস্যদের তাদের সম্পূর্ণ জৈবিক ক্ষমতা অনুযায়ী বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না। সমাজ সকল সময়েই প্রকৃত প্রজনন ধারার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের অগোচরেই ঘটে চলেছে; তাহলেও সেই অজানিত ব্যবস্থার পদ্ধতি বস্তুতপক্ষে জন্মহারকে কমিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখি যে নরনারীর যৌন মিলনের বিষয়ে বহু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অন্যান্য প্রাণীদের আপন ইচ্ছা অনুযায়ী যত্রতত্র যৌন মিলন সমাজ কর্তৃক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের সামাজিক অনুশাসন যার ফলে মানব প্রজনন ধারার উদ্দামতা শিথিল হয়। উর্বরতার উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সমাজ কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন বিবাহের ন্যুনতম বয়স স্থির করা হয়েছে, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছে। একক বিবাহের প্রচলনকে জনপ্রিয় করা হয়েছে এবং পারিবারিক আকারকে সীমিত করার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে। এইসব নিষেধাজ্ঞা, আচার-ব্যবহার প্রচলন করে সমাজ উর্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কখনও কখনও সমাজ গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারে উৎসাহ দান করে, আবার কখনও বা গর্ভপাতকে অনুমতিদান করে অবাঞ্ছিত শিশুর জন্মদানকে প্রতিহত করেছে।

৪.৩.১ উর্বরতা হ্রাস বিবাহ

উর্বরতার সঙ্গে বিবাহগত অবস্থা খুব বেশী সম্পর্কযুক্ত। বিবাহিত জীবনই হল পরিবার গঠনের আনুষ্ঠানিক

সূচনা যা উর্বরতা প্রকাশকে নির্দেশ করে। আদিম জনগোষ্ঠী এবং বিকাশ প্রাপ্ত দেশগুলিতেও বিবাহগত অবস্থা বিভিন্ন জটিল ও বহুমুখী পরিস্থিতির উদ্ভব করে। বিবাহগত অবস্থা এবং উর্বরতা কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিবাহকালীন বয়স। এছাড়াও আরও প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। যেমন বিবাহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, বিবাহের ধরণ, বিবাহের ব্যয়, সত্বর বিবাহ এবং বিলম্বিত বিবাহ, প্রথম যৌন মিলনের সময় নির্দেশ, বিবাহিত জীবনের সমস্যা, বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ। ফলপ্রসূ কার্যকরী দাম্পত্য জীবনের ব্যাপ্তি উর্বরতার একটি প্রধান নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উপরোক্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত গভীরভাবে উর্বরতা বিষয়ক পরিস্থিতির পশ্চাৎপটে কাজ করে থাকে।

বিবাহকালীন বয়সের বিষয়ে বিভিন্ন সমাজধারার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমাজের উর্বরতার প্রকৃতি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আহরণ করা যায়। এই চলটি (variable) সকল সময়েই পরিবার পরিকল্পনার উদ্যোগের উর্ধ্বে রয়েছে বলেই মনে করা হয়। কারণ এই বিশেষ চলটি বিকাশশীল দেশগুলিতে বাল্যবিবাহের মাধ্যমে উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলিতে বিলম্বিত বিবাহের ফলে প্রজনন কালটিকে সংক্ষেপ করে দেয়। বিকাশশীল এবং বিকাশপ্রাপ্ত দেশগুলিতে গ্রাম ও শহর এলাকার জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী এমনকি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিবাহকালীন বয়সের খুব কম বেশী ভেদাভেদ লক্ষিত হয়। লক্ষ্য করার বিষয় এই বিশেষ চলটি অর্থাৎ বিবাহকালীন বয়স নানা পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে যেমন আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন প্রব্রজন, পেশা পরিবর্তন ইত্যাদি।

অধিকাংশ আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অল্পবয়সেই বিবাহানুষ্ঠান সংঘটিত হয় কিন্তু প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্ক না হলে যৌন মিলনের মাধ্যমে বিবাহকে সম্পূর্ণতা দান করা হয় না। এই ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে অল্পবয়সে বিবাহের বিষয়ে দু'ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় — একটি ব্যাখ্যা হল জীববিজ্ঞানীয় এবং অপরটি সামাজিক। প্রথম ব্যাখ্যাটি প্রজাতির উদ্‌বর্তন। অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের প্রজনন ক্রিয়া খুবই স্তিমিত। সাধারণভাবে একবার একটি শিশুই জন্মলাভ করে। মানব শিশুর জন্য দীর্ঘকালীন জনিতৃ যত্নের প্রয়োজন হয়। যতদিন পর্যন্ত না শিশু আত্মনির্ভর হয়ে উঠে ততদিন তাকে সকল রকমের সাহায্য করে যেতে হয়। এমতাবস্থায় অল্পবয়সে বিবাহ প্রজাতির উদ্‌বর্তনকে বিশেষভাবে সহায়তা করে বলেই মনে করা হয়।

৪.৩.২ উর্বরতা হ্রাস : বিভিন্ন সামাজিক পদ্ধতি

জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ, শিশুহত্যা ও গর্ভপাতের মাধ্যমে মানবসমাজে উর্বরতা হ্রাস করার প্রয়াস দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তবে বর্তমানে এগুলিকে আরও কার্যকরী এবং সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উর্বরতাবৃদ্ধির পক্ষে কাজ করে চলেছে বহু সমাজ-সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা। বিভিন্ন বিকাশশীল দেশগুলিতে দেখা যায় যে সাধারণভাবে এখানে উর্বরতা বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ মানসিকতার উদ্ভব ঘটেছে কারণ এই সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রয়োজনে পুত্রসন্তানের বিশেষ চাহিদা বর্তমান। ঐতিহ্য ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে কৃষি কেন্দ্রিক পিতৃতান্ত্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সমাজ-সাংস্কৃতিক কর্ম সম্পাদনের জন্য পুত্রসন্তান অপরিহার্য। পুত্রসন্তানকে এখনও পিতামাতা তাঁদের

বৃদ্ধবয়সের একমাত্র ভরসা বলে মনে করেন এবং তার ফলে পুত্রসন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধি আবশ্যিক বলেই চিন্তা করা হয়। পরিবারের প্রকৃতি অনুযায়ীও উর্বরতা চিন্তাধারার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। যেমন একবিবাহ, কেন্দ্রিক পরিবারে উর্বরতা ভিত্তিক চিন্তাধারা খুবই সীমিত, অপরদিকে বর্ধিত একান্নবর্তী পরিবার আরও সন্তানের আগমনে উৎসাহী। এই কারণে একথা বলা হয় যে যতদিন পর্যন্ত বর্ধিত পরিবার মানুষের নিরাপত্তার চরম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে ততদিন পর্যন্ত পরিবারে সন্তান সংখ্যা সীমিত করার প্রবণতা ফলপ্রসূ হবে না।

এই প্রসঙ্গে সমাজে মহিলাদের মর্যাদার বিষয়টিও এসে পড়ে। কোন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা এবং তৎসংক্রান্ত নানা ঘটনাবলীর সঙ্গে উক্ত সমাজে মহিলাদের অবস্থানের বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। সমগ্র সমাজ এবং পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষ করে নবজাতকদের সংখ্যা, তাদের আগমনের সময় ইত্যাদি বিষয়ে নীতি নির্ধারণে মহিলারাই অগ্রণী। জন্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জন্মহার কমানোর অর্থাৎ উর্বরতা হ্রাসের প্রচেষ্টাটি মহিলাদের কার্যকরী উদ্যোগেই সম্পুর্ণ ফলপ্রসু হতে পারে। বিভিন্ন সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে আমাদের দেশে কর্মে নিযুক্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে উর্বরতা সীমিত হওয়ার বিশেষ প্রবণতার উদ্ভব হয়েছে। মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা সয়ম্ভর হওযার ফলে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতির বিশেষ সুযোগ ঘটেছে। উপয্যুপরি সন্তান ধারনের ফলে কর্মস্থলে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া দীর্ঘদিন প্রসূতি ছুটি গ্রহনের ফলে কিছু আর্থিক ক্ষতিও হয়ে থাকে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কর্মরত মহিলাদের বিবাহকালীন বয়স বিলম্বিত হয় এবং এরা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান-সন্ততির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয় না — অন্ততঃ এই নির্ভরশীলতা মানসিকতা এদের মধ্যে এতটা প্রকট নয়।

উর্বরতার উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী অপর একটি অতি প্রয়োজনীয় চল-এর নাম হল শিক্ষা। সমাজ, অর্থনীতি এবং পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রকৃতি পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষার অলোকই মানুষকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি থেকে শিক্ষিত মানুষেরা মুক্তি পেয়ে যায় — এদের মধ্যে জীবনের মূল্যবোধ নতুনভাবে বিকশিত হয়। শিক্ষা প্রাপ্তদের মধ্যে বিবাহগত বয়স বৃদ্ধি পায় — এদের মধ্যে বাল্যবিবাহ কোনদিনই প্রসারলাভ করতে পারে না। পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে এবং তাদের জীবনে এই বিশেষ চিন্তাধারাটি সমধিক প্রসারলাভ করে। পরিবারের নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষিত মহিলাদের বিশেষ সুযোগ ঘটে। উর্বরতার ক্ষেত্রেও এই মহিলারা তাদের নিজস্ব মতামত দান করে অধিকাংশ সময়েই অধিক সন্তান জন্মদানকে নিরুৎসাহ করে। সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে অশিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে উর্বরতা জনিত প্রভাব খুব বেশী। এদের সন্তান সংখ্যা খুব বেশী এবং তারা অনেকাংশই অপুষ্টির শিকার হয়ে পড়ে।

আবার দেখা যায় যে অত্যাধিক শিশু মৃত্যুর হার ছোট পরিবার স্থাপনে বিরোধিতা করে। এই মরণশীলতাকে রুখতে উচ্চ উর্বরতার প্রয়োজন অনুভূত হয়। যেহেতু শিশুদের উদ্‌বর্তিত থাকা সন্দেহাতীত নয় সেইহেতু পিতামাতা সকল সময়েই বেশী সংখ্যক শিশুর জন্মদানে আগ্রহী হয়ে উঠে। পৃথিবীতে যে সকল সমাজে শিশুমৃত্যুর হার অত্যধিক সেখানে বিবাহগত বয়স বেশ কম, ঘনঘন সন্তানধারণ এবং বৃহৎ পরিবার গঠনের প্রবণতা লক্ষিত হয়।

৪.৪ মরণশীলতা এবং তার সামাজিক নির্ধারণ

জীববিজ্ঞানীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মরণশীলতা সেই দেহটির লয় বোঝায় যে দেহটির একদিন জীবন্ত জন্মলাভ ঘটেছিল। যাইহোক, জনবিজ্ঞানের মতে মৃত্যুর কারণে জনসংখ্যার আকারকে মরণশীলতা হ্রাস করে দেয়। জন্মহার বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার আকার বেড়ে উঠে ঠিকই তবে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির মৃত্যুহার হ্রাসও একটি বিশিষ্ট কারণ। সমাজ মৃত্যুর কারণ ঘটিয়ে থাকে এই বিষয়টি মেনে নিতে আমাদের একটু অস্বস্তি লাগে বৈকি। তবে সত্যি সত্যিই এমন কতকগুলি সামাজিক ঘটনা রয়েছে যেগুলি মরণশীলতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত। সমাজের মধ্যে এমন কিছু কার্যাবলী লক্ষিত হয় যেগুলির মাধ্যমে মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়। বহু সময় বৃদ্ধ ও অশক্ত মানুষদের তাদের ভাগ্যের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়। বিকলাঙ্গ শিশুদেরও অনাদরে ফেলে রাখা হয় যারা কালক্রমে মারা পড়ে। শিশুকন্যাদের মেরে ফেলার রেওয়াজ বহু সমাজে রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মানুষ উৎসর্গ পুরাকালে বিশেষভাবে দেখা যেত। আবার কখনও শাস্তিদান হিসেবে মানুষদের হত্যা করা হত। বহু সময় আত্মবিসর্জনও মরণশীলতার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ভারতের সতীদাহ প্রথা এর বিশিষ্ট উদাহরণ। কোন কোন সময় পরাজিত সৈনিকদল শত্রুহস্তে নিগৃহিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু বরণকেই শ্রেয় বলে মনে করত। বহু সময় দেখা যায় কোন একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অথবা সঙ্কল্প নিরসনে মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদ হয়েছে। নানা ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে মানুষ আত্মঘাতী হয়েছে। এই ঘটনাটি বিভিন্ন যুগে দেখা গিয়েছে এবং আজিও এটি কার্যশীল। অতএব হত্যা করা অথবা আত্মঘাতী হওয়া তা এককভাবেই হোক অথবা সমষ্টিগত ভাবেই হোক সামাজিক মানুষের মৃত্যুর গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে পরিচিত।

প্রতিটি মানুষই সুস্থ জীবনযাত্রা এবং দীর্ঘকালীন জীবন প্রত্যাশা করে। এই বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার জন্য মানুষ যুগে যুগে নানা ধরনের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ের উপস্থাপন করেছে। তবে এগুলির মধ্যে বহু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রভাব বিস্তার করেছে যার ফলে এই সকল রোগ চিকিৎসা বিদ্যা অনেকাংশ ক্ষতিকারক হয়েছে। অধিকাংশ আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদুবিদ্যা বিষয়ক নানা চিন্তাধারা লক্ষিত হয়। এই সমাজ ব্যবস্থায় মায়াবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা ইত্যাদিতে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং রোগের উপশমের জন্য ওঝা বা যাদুকরদের আহ্বান করা হয়ে থাকে। এরা নানা ধরনের আধিভৌতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগের চিকিৎসা করে থাকে। এছাড়াও ধর্মভীরু মানুষ বহুসময় রোগের উপশমের জন্য নানাধরনের জৈবিক শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে। এই সকল নির্ভরশীলতা বহুলাংশেই কৃতকার্য হয় না এবং মানুষের মরণশীলতাকে বাড়িয়ে তোলে। যদিও আধুনিক মানুষ অনেকাংশে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছে তাহলেও মানুষের জীবনে এর প্রভাব এখনও খুব বেশী।

মানুষের সমাজে নানাধরনের ক্ষতিকারক রীতিপদ্ধতি রয়েছে যেগুলি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল অনুশাসন কখনও সমাজ মধ্যস্থিত মানুষদের খাদ্যাভাসকে নিয়ন্ত্রিত করে, কখনও বা পোষাক-পরিচ্ছদ আবার কখনও বা সামগ্রিক জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করে। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে খালি পায়ে হাঁটা আজও একটি বিশেষ সামাজিক রীতি। কিছুদিন পূর্বে মহিলাদের জুতা ব্যবহার সামাজিক নিষেধ ছিল। এই সকল রীতি পদ্ধতিগুলি এতবেশী গভীরতা বিশিষ্ট এবং মানুষের মনে এত প্রভাব বিস্তারকারী যে

এগুলির ক্ষতিকারক দিকগুলি প্রচার করলেও জনমনে তাদের খুব একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না — বরং মানুষ আরও জোরে এগুলিকে আঁকড়ে রাখে। এগুলি খুব স্বাভাবিকভাবেই স্বাস্থ্যের ক্ষতিসাধন করে এবং এভাবে চলতে চলতে মানুষকে অসুস্থ করে তোলে — ফলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। তবে এর পাশাপাশি নানা ধরনের প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে। বিভিন্ন পরিবার, শিল্পসংস্থা, সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের বিষয়ে যত্নবান হয়েছে। যাইহোক বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মৃত্যুহারকে কমিয়ে ফেলার প্রতি দৃষ্টিদান করা হয়েছে।

৪.৫ মরণশীলতার কারণসমূহ

জনসংখ্যার আলোচনায় মরণশীলতার তথ্যাবলীর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে একথা আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি তবে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা যায়। মরণশীলতা কেবলমাত্র জনসংখ্যার আকৃতির উপরই প্রভাব বিস্তার করে না — এর গঠন, প্রকৃতি এবং স্বভাবটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে জনসংখ্যায় এর ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই ধরনেরই প্রভাব বিস্তার করে। মরণশীলতার গতি-প্রকৃতির উন্নয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয় এবং এই বিষয়টি নিম্নবর্ণিত কার্যকারণের উপর নির্ভরশীল যেমন — (ক) উন্নত বিবাহগত উত্তরজীবিতা (খ) গর্ভপাত হ্রাস প্রাপ্তি (গ) কয়েকধরনের সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের ফলে উর্বরতাবৃদ্ধি (ঘ) উর্বরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে যদি মরণশীলতা কমতে থাকে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে (ঙ) পিতামাতাকে প্রতিপালন করার কাজে শিশুদের গুরুত্ব বৃদ্ধি। তবে দেখা যায় যে মরণশীলতার হ্রাস প্রাপ্তি উর্বরতার উপর প্ররোহ ফলাফল বিস্তার করে। যেমন শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়ার ফলে কোন দম্পতি পরবর্তী শিশু জন্মকে বিলম্বিত করতে পারে যেটি মৃত শিশুর স্থানপূরণে বিশেষ প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হত। শিশুদের উদ্‌বর্তন এবং স্তন্যদান কালটি দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে জন্মবিরতি বেড়ে যায় এবং এর ফলে জন্মহার কমে যায়।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে মরণশীলতা কী কী কারণের উপর নির্ভরশীল? এবিষয়ে জনবিজ্ঞানীরা প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাত করেছেন। তাঁদের মতে কারণগুলি হল নিম্নরূপ—

(ক) বংশধারার বিভিন্ন লক্ষণাবলী মরণশীলতার উপর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে।

(খ) কোন ব্যক্তির দেহগঠন যেমন জৈবিক এবং মানসিক লক্ষণসমূহ মরণশীলতাকে প্রভাবিত করে।

(গ) কতকগুলি পরিবেশ পরিস্থিতিগত বিষয় যেমন সম্প্রদায়ের আকৃতি, ঐতিহ্য, জলবায়ু, গ্রামীণ অথবা শহরাঞ্চল, পেশা, ঘনজনবসতি ইত্যাদির উপর মরণশীলতার ধারা নির্ভরশীল।

এই তিনটি বিষয় পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্র রচনা করে এবং তার ফলে এদের সামগ্রিক ফলাফল জটিল এবং কখনও কখনও অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একথা বিশেষভাবে উপস্থাপন করে যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে মরণশীলতার উপর পরিবেশ-পরিস্থিতির ফলাফল অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এবং বিকাশশীল দেশে এই পরিবেশ-পরিস্থিতির কার্যাবলী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে না। বস্তুতপক্ষে বিকাশশীল দেশগুলি পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সক্ষমতালাভ করেছে। সেইহেতু দেখা যায় যে বংশগতি এবং মনস্তাত্ত্বিক

বিষয়সমূহ বিকাশশীল দেশে মরণশীলতার গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিককালে বায়ু, জল, খাদ্যবস্তু প্রভৃতির ক্রমান্বয়িক দূষণ বিকাশশীল দেশগুলিতে মরণশীলতার কারণ হিসেবে আবার পরিবেশ-পরিস্থিতিকে সম্মুখে হাজির করেছে। এ বিষয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বিশেষ সতর্কবার্তা দান করেছেন, পরিবেশ দূষণকে কার্যকরীভাবে প্রতিহত করতে না পারলে মানবজীবন বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে। যাইহোক, বর্তমানকালে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মরণশীলতার ভার বেশ কম এবং এর জন্য চারটি বিশিষ্ট কারণ উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হয় — (ক) মহামারী এবং বিভিন্ন ব্যাধির বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ, (খ) কৃষিকাজের যন্ত্রীকরণ (গ) দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিকাশ এবং (ঘ) অর্থনৈতিক ব্যবহারের জন্য মহাদেশ এবং উপনিবেশ উন্মোচন।

একথা অনস্বীকার্য যে বিকাশশীল দেশসমূহে মরণশীলতার হার বিশেষভাবে কম। এই বিষয়ে তিনটি পর্যায় বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় বলেই গণ্য করা হয় —

(১) প্রথম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আর্থিক উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। এই সব দেশের জনগণ সুষম খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত। যার ফলে মরণশীলতার হার কমেছে।

(২) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মরণশীলতার হার কম হওয়ার কারণ হল উন্নত জনস্বাস্থ্য সেবা এবং মহামারী ও ব্যাধির উপর নিয়ন্ত্রণ। বয়স নির্দিষ্ট মরণশীলতার হারের হ্রাসও লক্ষ্যণীয়; বিশেষভাবে শিশুমৃত্যুর হার অত্যধিক কমেছে।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে জৈব রসায়নের উন্নয়ন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে বিশেষভাবে উন্নীত করেছে যার ফলে মরণশীলতার হার বিশেষ নিম্নগামী হয়েছে।

৪.৬ মানব প্রব্রজন — প্রকৃতি এবং পরিস্থিতি

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রব্রজন একটি বিশিষ্ট উপাদান। প্রব্রজন জনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয় — এটি জনসংখ্যার মূল্যায়ন প্রচেষ্টার কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত। গ্রাহক এবং প্রেরক অঞ্চলের সঙ্গে প্রব্রজনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান এবং এটি প্রাকৃতিক বিস্তৃতির সংযোগে বিরচিত। এর ফলাফল বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হতে পারে এবং এটি প্রবজিত অথবা অপ্রবজিত জনগোষ্ঠীর আপেক্ষিক আকৃতির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া আঞ্চলিক উন্নয়নের ধারার উপরও এর নির্ভরশীলতা রয়েছে। প্রব্রজন সংশ্লিষ্ট দেশ, অঞ্চল অথবা এলাকার অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক কল্যাণ, সমাজ সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজবিজ্ঞানীরা প্রব্রজনকে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। কুজনেটস্ অভিমতদান করেছেন যে, জনসংখ্যার পুনর্বন্টন এবং আর্থিক বিকাশের সম্পর্ক ধারাটি আধুনিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির কার্যসাধন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে নতুন শিল্পসংস্থায় মূলধন বিনিয়োগ করতে হলে শ্রমিক বিনিয়োগ, নগরের বৃদ্ধি এবং নতুন সম্পদ ও এলাকার বিকাশের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হবে যেগুলির সবই জন্মস্থান থেকে দুরবর্তী এলাকায় নানা পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মনুষ্যবসতি গড়ে তোলার উপর নির্ভরশীল। প্রব্রজন সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি প্রধান লক্ষণ।

একে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে এবং কখনও বা নতুন ব্যবহার প্রণালী ও জীবনধারার পদ্ধতির বিচ্ছুরণের একটি প্রয়াস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই কারণেই প্রব্রজনকে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের নির্দেশক এবং উৎপাদক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় — এটি জনসংখ্যার আকৃতি এবং প্রকৃতি ও তার সঙ্গে আর্থ-সামাজিক গঠনকে উদ্ঘাটিত করে।

যদিও প্রব্রজন মানব ইতিহাসের মর্মমূলের সঙ্গে যুক্ত তাহলেও এই বিষয়টির প্রতি আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা রয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে প্রব্রজনের অন্তর্নিহিত কার্য-কারণের উপর সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মানববিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরে নানা ধরনের বিধি, মতবাদ এবং অনুকল্প রচনায় দীর্ঘদিন ধরে আত্মমগ্ন রয়েছেন, কিন্তু প্রব্রজন মতবাদটির উপর সম্পূর্ণ এবং কার্যকরী বিশ্লেষণ এখনও করা যায়নি। বর্তমানে এবিষয়ে আমাদের জ্ঞান দৃঢ়সংবদ্ধ নয় এবং বহু ক্ষেত্রে অগভীর। বিভিন্ন ধরনের মতবাদ এবং তাদের বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যা আমাদের মনে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। একথা স্মরণীয় যে প্রব্রজনের কারণগুলি এতবেশী জটিল এবং বহুবিস্তৃত যে এগুলির সুসম্বদ্ধ উপস্থাপন সম্ভব হয় না। কোন রকম উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে প্রব্রজন ঘটেনা — কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে আবার কোন কোন সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষ প্রব্রজিত হয়। এই সকল উদ্দেশ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই বহুমুখী এবং নানাধরনের ঘটনা বিচিত্রার সঙ্গে যুক্ত। প্রব্রজনের মধ্যে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টা থাকে ঠিক তেমনি আবেগপূর্ণ মনোভাব দ্বারা এটি পরিশীলিত হয়। আপন সমাজ ব্যবস্থায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে কোন এক অজানা দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া এবং সেখানে বসবাস করা খুব একটা সহজ কাজ নয়। এই বিষয়টির একদিকে যেমন রয়েছে মনোগত পরিস্থিতি অপরদিকে তেমনি আর্থিক মূল্যমানও প্রকট। অর্থাৎ একস্থান থেকে অপর স্থানে প্রব্রজনের জন্য বিশেষ ব্যয় বহন করতে হয়। প্রব্রজন প্রস্তুত ব্যক্তিদের স্থির করে নিতে হয় যে এই গমন-আগমনের পশ্চাৎপটে আর্থিক এবং আবেগ সমন্বিত মূল্যমানের আপেক্ষিক পার্থক্যটি কী ধরনের। কোন কোন সময় প্রব্রজিত মানুষ বা জনগোষ্ঠী এই প্রব্রজন ভিত্তিক আপেক্ষিক সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়টিকে ঠিকমত মূল্যায়ন করতে পারে না। এর ফলে দেখা যায় যে মানুষের প্রব্রজনের ইতিহাস বিভিন্ন অযৌক্তিক আশা-আকাঙ্খার প্রভাবে হতাশাপূর্ণতায় পর্যবসিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, স্থায়ী আবাস এবং প্রব্রজিত আবাসের জনগোষ্ঠীর মনোভাব প্রব্রজনের ব্যাপ্তি বিষয়ে নির্দেশদানকারী হিসেবে পরিগণিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন একটি দেশ বা অঞ্চল তার মধ্যস্থিত মানুষদের আবাস ত্যাগে উৎসাহ দান করে না কারণ তাদের এই প্রব্রজন জন্মভূমির নানা কাজে অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রব্রজনকে সমর্থন করা হয় যখন দেখা যায় যে প্রব্রজনকারী জনগোষ্ঠী তাদের ভূসম্পত্তি এবং চাকুরী বা চাকুরীর বেশ কিছু সম্ভাবনা রেখে যায়। গ্রাহক দেশগুলির জনগণ এই অভিবাসনের বিরোধিতা করতে পারে কারণ এই ঘটনা তাদের কর্মের সুযোগ নষ্ট করবে। আবার এই অভিবাসন যদি বেশ কিছু নতুন সুযোগের সৃষ্টি করে তাহলে সেটি স্বীকৃতি লাভ করবে। আবার এবিষয়ও দেখা যায় যে গ্রাহকদেশের জনগণ কোন বিশেষ জাতি, ধর্ম, ভাষা এবং আর্থিক অবস্থা

অনুযায়ী প্রব্রজনকারী গোষ্ঠীদের অগ্রাধিকার দান করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রব্রজন পদ্ধতি সর্বদাই নির্বাচনমূলক। প্রথমতঃ, একটি অঞ্চলের অধিবাসিদের সার্বিকভাবে প্রব্রজনে উৎসাহিত করা যায় না এবং দ্বিতীয়তঃ, আবার সকল মানুষকেই কর্মস্থান পরিবর্তনে স্বাগত জানান হতে পারে না। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পশ্চাৎপটে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে প্রব্রজনের ধারা বিশেষভাবে প্রবাহিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধরনের মানবপ্রব্রজন উচ্চমাত্রা লাভ করেছিল। আবার একটি অতি সম্ভাবনাপূর্ণ দেশ আমেরিকায় প্রব্রজন একসময়ের ইউরোপে প্রচণ্ড আলোড়ন এনেছিল। একটি উচ্চাশাপূর্ণ দেশ হিসেবে আমেরিকা বিবেচিত হয়েছিল যেখানে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হবে। এই প্রব্রজনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল যে ঐ দেশে প্রব্রজিত অধিবাসীরা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পাবে এবং ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা লাভ করবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রব্রজন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এর পর কানাডা, আর্জেন্টিনা ইত্যাদিও প্রব্রজিত জনসংখ্যায় ভরে উঠতে থাকে। আবার আফ্রিকার আদিবাসীরা দাস ব্যবসার শিকার হয়ে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমেরিকায় প্রব্রজিত হয়েছিল।

প্রব্রজনের ক্ষেত্রে অন্যান্য কার্যকরী বিষয়গুলির মধ্যে তাৎপর্যপুর্ণ হল নতুন দেশে অভিগম্যতা এবং ভ্রাম্যমানতার বাধানিষেধের অনুপস্থিতি। প্রয়োজনীয় উন্নতধরনের পরিবহন ব্যবস্থার অভাব অভিগম্যতাকে সীমাবদ্ধ করেছে। মানুষ যখন ছোট ছোট নৌকা তৈরী করতে শুরু করল তখন তারা অল্পসংখ্যায় জলপথে ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতে কৃতকার্য হল। বর্তমান কালে খুবই উন্নতমানের পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষদের মধ্যে ভ্রাম্যমানতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুসময় দেশের জনগোষ্ঠীর এই ধরনের ভ্রাম্যমানতার উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় ছাড়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হতে পারে। এই নিষেধাজ্ঞা প্রব্রজনকে প্রতিহত করে। প্রব্রজনের জন্য পাসপোর্ট (ছাড়পত্র) এবং ভিসার (প্রবাসাজ্ঞা) প্রয়োজন হয়। প্রথমদিকে সকল আগন্তুককে নির্দ্বিধায় প্রবেশের অনুমতি দান করা হত কিন্তু পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট প্রব্রজনকারীর বিশ্বাস, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নৈতিক চরিত্রের উপর লক্ষ্যদান করা হয়। কাজেই প্রব্রজন কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থার উপরই কেন্দ্রীভূত নয় — এই বিষয়টি অর্থনৈতিক মূল্যমান, রাজনৈতিক বাধা-বিপত্তি, জাতিগত রূপ ও মনোভাবের উপরও নির্ভরশীল।

প্রব্রজন অতীব জটিল পদ্ধতি — এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। প্রব্রজনের ঘটনা থেকে বহু শিল্পসংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়। বহুসময় আদিবাসী মানুষেরা সন্তোষজনক পারিশ্রমিকে গ্রহণযোগ্য কাজ পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যদি অভিবাসিত মানুষ কোন চাকুরী না পায় অথবা যে ধরনের অবস্থার মধ্যে সে কাজ করতে বাধ্য হয় তা তার পক্ষে উপযোগী নয় অথবা সে দুর্ব্যবহার এবং বঞ্চনার শিকার হয়েছে। এর ফলে তার মধ্যে অবিচার প্রাপ্তির মনোভাব সৃষ্টি হয়। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা। অনেক সময় দেখা যায় যে অভিবাসিত মানুষটি সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা না জানলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সে অন্তরিত হয়ে পড়ে। ফলে তাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়। যখন কোন অভিবাসিত ব্যক্তি এবং দেশীয় মানুষ একই

ভাষার মাধ্যমে মনের ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে না তখনই পরস্পরের সংস্কৃতি বোধগম্যের ব্যাপারে সত্যিসত্যিই প্রতিবন্ধকতা গড়ে উঠে। এতে অভিবাসিত ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয়। বসবাসের অবস্থাও নানা অসুবিধা সৃষ্টি করে। কোন বড় শহরে অভিবাসিত ব্যক্তি সর্বপ্রথমেই বাসস্থানের সমস্যার সম্মুখীন হয় — তার আপন দেশে যেটি খুব সহজলভ্য ছিল। কখনও দেখা গিয়েছে যে অভিবাসিত ব্যক্তির নতুন দেশে কাজ করা ও উপার্জন করার বিষয়ে উচ্চাশা নিয়ে হাজির হয় এবং পরবর্তীকালে যখন সে দেখে এই বিষয়টি তার নিজের দেশ অপেক্ষা উন্নতমানের নয় অথবা তার থেকেও নিকৃষ্ট ধরনের, তখন সে তীব্র অনুশোচনা বোধ করে।

প্রব্রজনের প্রভাব একটি আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে যে ভাবে পড়ে অন্য একটি আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে তা একই ধরনের নাও হতে পারে। বিভিন্ন সমাজধারার মধ্যে প্রব্রজন বিন্যাসে বিস্তৃত বৈষম্য থাকতে পারে। প্রব্রজনের ফলাফল ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রব্রজন হয় সৌভাগ্য, সুখ-শান্তি এবং সুবিন্যস্ত জীবন আনতে পারে অথবা দুঃখ-কষ্ট, মানসিক ব্যাধি এবং বিঘটিত জীবনধারার সৃষ্টি করতে পারে, কারণ সামাজিক গঠন এবং জনবিন্যাসে প্রব্রজনের ফলাফল ব্যক্তিগত পর্যায়েই প্রতিফলিত হয়। প্রব্রজন জন্ম ও মৃত্যুর ঘটনা থেকে পার্থক্য রচনা করে। প্রব্রজন দুটি ক্ষেত্রে বিকশিত হয় — **উৎসের ক্ষেত্র** এবং **গন্তব্যের ক্ষেত্র**। গন্তব্যের ক্ষেত্রে ফলাফল ইতিবাচক হতে পারে অপরদিকে উৎসের এটি হতে পারে নেতিবাচক। অথবা দুটি ক্ষেত্রে একই ধরনের ফলাফল হতে পারে। এই ফলাফলের গতি-প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, জনসাংখ্যিক এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। এছাড়াও এটি সামগ্রিক প্রব্রজনের বৃহত্বের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই প্রব্রজিত মানবগোষ্ঠী কোন বিশেষ ধরনের বয়স, লিঙ্গ এবং পেশা কেন্দ্রীকতায় পর্যবসিত সে বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। যদি কোন দেশ থেকে যুবাগোষ্ঠীর মানুষেরা প্রব্রজিত হয়ে যায় তাহলে ঐ এলাকাটি কর্মকালীন বয়সের মানুষদের হারাবে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই ঐ এলাকার জনগোষ্ঠীর গঠন বিভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ অথবা আরও বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষদের উপর নির্ভরশীল হবে। অপর পক্ষে দেখা যাবে যে গ্রাহক অঞ্চলটি তার কর্মী পরিমণ্ডলে বহু সক্রিয় মানুষদের লাভ করবে। কিন্তু এই পদ্ধতিটির একটি পরম্পরা ভিত্তিক ফলাফল রয়েছে। যদি সংশ্লিষ্ট এলাকাটিতে প্রব্রজিত জনগোষ্ঠীর অন্তঃপ্রবাহ অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে তাহলে তার নিজস্ব জনসংখ্যার মধ্যে প্রচণ্ড চাপ পড়বে এবং এই পরিস্থিতি প্রব্রজিত মানুষদের বহির্গমনে উদ্বুদ্ধ করবে। লিঙ্গ ভিত্তিক জনসংখ্যার গঠনেও অনুরূপ ফলাফল দেখা দেবে যদি প্রব্রজনের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে একই ধরনের লিঙ্গ ভিত্তিক সদস্যের দ্বারা রূপায়িত হয়। প্রব্রজন পদ্ধতি জনসংখ্যার লক্ষণাবলীর ফলাফল সৃষ্টিকারী। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ এবং চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অভাবহেতু যদি শিক্ষিত ব্যক্তিরা এলাকা ত্যাগ করে তাহলে প্রেরক অঞ্চলের শিক্ষার হার কমে যাবে। অপরদিকে গ্রাহক এলাকার শিক্ষার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে পেশা ভিত্তিক সমাজধারা গঠনেও পরিবর্তন আসবে। অন্তঃপ্রব্রজন এবং বহিঃপ্রব্রজনের ফলে যে বিভিন্ন ধরনের মানুষদের আসা-যাওয়া ঘটতে থাকে তার জন্য জনগোষ্ঠীর জাতিগত ও সংস্কৃতিগত গঠনের পরিবর্তন হয়। এই বিষয়টি পরিবার ও

আত্মীয়তার গঠন-প্রকৃতি এবং তার সঙ্গে সামাজিক ভূমিকা এবং মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটায়।

একথা সচরাচর মনে করা হয় যে প্রব্রজন অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপ সৃষ্টি করে এবং নানাধরনের জটিল সমস্যাপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব করে। কিন্তু এই ধরনের চিন্তাধারার পেছনে সে রকম কোন নিশ্চয়তা নেই। যেহেতু প্রব্রজিত মানুষদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত ও দক্ষ যুবাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, কাজেই এরা গন্তব্য এলাকাটির বিশেষ মূলধন হিসেবে পরিগণিত হয় — একথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা যায় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রব্রজিত মানুষেরা আরও প্রশিক্ষিত হয়ে দক্ষতা লাভ করে আর্থিক সম্পদসহ আপন দেশে প্রত্যাবর্তন করে। তাহলেও প্রব্রজন একটি বিশিষ্ট মানব ব্যবহার প্রণালী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এবং এই ধারাটি মানব সমাজের ঊষাকাল থেকে শুরু হয়ে আজিও তা অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চলেছে। তবে সাম্প্রতিককালে নানাধরনের কঠোর বিধি নিষেধ প্রয়োগ করে স্বতঃস্ফূর্ত প্রব্রজনকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সামগ্রিক ইতিহাস বিভিন্নরূপী প্রব্রজন ধারায় প্রভাবিত। সেই আদিমকাল থেকেই যুগযুগান্ত ধরে বহিরাগত মানবগোষ্ঠীর আগমন ভারতের জনবিন্যাসে একটি বৈশিষ্ট্য এনেছিল। এখানে জনসংখ্যার ভিত্তিমূলে একদিকে যেমন পরিবর্তন এসেছিল অপরদিকে তেমনি ভারতের সমাজ-সাংস্কৃতিক জীবনধারায় বহু বিস্তৃত আলোড়ন এনেছিল। সমগ্র ভারতীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে বিচিত্ররূপী চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। ভারতীয় অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনচর্যা সুদীর্ঘকাল ধরে এই প্রব্রজনেরই ফল।

৪.৮ সারাংশ

জনসংখ্যার উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজন যুক্তভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই ঘটনাগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এরা একদিকে যেমন বিভিন্ন সামাজিক ধারায় নির্ধারিত হয়ে থাকে অপরদিকে তেমনি এগুলি সামাজিক পরিস্থিতিকেও নির্ধারণ করে। এই কারণেই জনবিজ্ঞানীরা উর্বরতা, মরণশীলতা এবং প্রব্রজনকে জনসংখ্যা পর্যলোচনায় প্রাথমিক গুরুত্বদান করেছেন। জন্ম ও মৃত্যু নিঃসন্দেহে জৈবিক ঘটনা — এগুলি বিভিন্ন ধরনের জৈব কার্য-কারণের দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু তাহলেও দেখা যায় যে এই জৈবিক ঘটনাদুটিকে কেন্দ্র করে মানব সমাজ ও সংস্কৃতিতে নানাধরনের চিন্তাধারা ও ব্যবহার প্রণালী গড়ে উঠেছে যেগুলির বহুবিস্তৃত কার্যকরী প্রভাব এই ধরনের জৈবিক পরিমণ্ডলকে পরিশীলিত করেছে। এই কারণেই জনবিজ্ঞানীদের সকল সময়েই তাত্ত্বিক ও পরিসাংখ্যিক আলোচনা ধারার পাশাপাশি সামাজিক গতি-প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে হয়। সামাজিক জনবিজ্ঞানের নির্দেশিত পথে এই অনুধাবন প্রচেষ্টা পরিচালিত হবে। কাজেই কোন জনবিজ্ঞানী একটি বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী কোন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাতাত্ত্বিক আলোচনায় মগ্ন থেকেই কর্ম সম্পাদন করেন না—তাঁকে জনসংখ্যার বিভিন্ন চরিত্র বিশ্লেষণে অগ্রণী হতে হয়। মানবগোষ্ঠীকে বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, ধর্ম, পেশা, বিবাহগত অবস্থার উপর আলোচনা করে নানা শ্রেণীভুক্ত করা হয়ে থাকে। জন্মহার, মৃত্যুহারের উপর যেমন কোন

জনগোষ্ঠীর হ্রাস এবং বৃদ্ধি নির্ভর করে ঠিক তেমনি প্রব্রজনও এবিষয়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণেই দুটি বিশিষ্ট জৈবিক-সামাজিক ঘটনাবলীর সঙ্গে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের বিভিন্ন স্থানে গমনাগমনকেও প্রয়োজনীয় গুরুত্বদান করা হয়েছে। এই গমনাগমন যখন স্থায়ীভাবে ঘটে থাকে তখন সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের জনসংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধির সৃষ্টি হয়।

উর্বরতা জীব বিজ্ঞানীর ঘটনা হলেও একে কেবলমাত্র জীবনবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নিরীক্ষা করলে সম্পূর্ণতা পাওয়া যাবে না। মানুষের অন্যান্য ব্যবহার প্রণালীর মত প্ররোচিত না হলে প্রজনন কার্যকরী হয় না। মানুষের সমাজে গর্ভনিরোধক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে জন্মশাসন প্রথাটি খুবই প্রাচীন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নানা ধরনের সামাজিক অনুশাসন ও রীতি-নীতি প্রচলিত হয়েছে। সমাজস্থিত মানুষ সেই সকল সামাজিক শাসন পদ্ধতিকে মেনে চলতে বাধ্য হয়। এর ফলে অজানিতভাবেই জন্মহার কমিয়ে দেওয়ার পক্ষে কাজ করে চলেছে। মানুষ একটি প্রাণী — তার জৈবিক জীবন, প্রজননগত ব্যবহার প্রণালী প্রাণীদের মতই। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীরা যেখানে ইচ্ছানুযায়ী এবং যত্রতত্র যৌন মিলনে নিজেদের নিয়োজিত করে মানুষের সেখানে রয়েছে সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত নানা নিষেধাজ্ঞা এবং তার পাশাপাশি সুসমঞ্জস ব্যবহার পদ্ধতি। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষ ও নারীর দৈহিক মিলনের মধ্যে নানা ধরনের বাধা নিষেধ রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও দেখা যায় যে সকল সময় অবাধ যৌন মিলন সম্ভব হয় না। বিবাহই সামাজিক মানুষের যৌন মিলনের স্বীকৃতি দান করে — এটি সামাজিক অনুমতি। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান কখনও বা আইনানুগ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই অনুমতিদান করা হয়। অনেক সময় সমাজ গর্ভনিরোধক পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহদান করে। গর্ভপাত এবং শিশুহত্যাকে অনুমতি দানের মাধ্যমে অবাঞ্ছিত শিশুর জন্মকে রোধ করে পরিবার সীমিত করতে আগ্রহী হয়।

উর্বরতার হ্রাস বৃদ্ধিতে বহু সামাজিক চিন্তাধারা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। একবিবাহ কেন্দ্রিক পরিবার উর্বরতা ভিত্তিক চিন্তাধারায় সীমাবদ্ধতা আরোপ করে কিন্তু কৃষিভিত্তিক যৌথ পরিবার সকল সময়েই সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধি কামনা করে। কোন কোন সমাজে পুত্রসন্তানের বিশেষ কতকগুলি ধর্ম-সাংস্কৃতিক উপযোগিতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সকল ক্ষেত্রে মানুষ অধিক পুত্রসন্তানের জন্ম কামনা করে। বৃদ্ধ বয়সে নির্ভরশীলতা এবং নিরাপত্তাকে অধিকতর কার্যকরী করে তুলতে অনেক পিতামাতাই বহু পুত্র সন্তানের কামনা করে থাকে। সমাজে মহিলাদের অবস্থানগত বিষয়ের উপরও উর্বরতা নির্ভরশীল। মহিলারা শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম হলে উর্বরতা হ্রাসের প্রচেষ্টা তাদের মতামত এবং হস্তক্ষেপে অতীব কার্যকরী হয়ে উঠে। সমাজ মধ্যস্থিত মানুষদের শিক্ষাদানই উর্বরতা হ্রাস করনের একটি বিশিষ্ট প্রয়াস হিসেবে স্বীকৃত।

জনসংখ্যার আকার মরণশীলতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। একথা ঠিক যে মরণশীলতার ফলে জনসংখ্যা হ্রাস হলেও উর্বরতা এবং মরণশীলতার মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তাহলে জনসংখ্যায় অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেবে। সমাজে রোগ ব্যাধি ছাড়াও আরও বহুকারণে মৃত্যু ঘটে। বহু সমাজে সামাজিক রীতি পদ্ধতি এরকম যে সেগুলি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। বহু অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সামাজিক মানুষকে মৃত্যুবরণে বাধ্য করে।

জনসংখ্যার আলোচনায় মরণশীলতার তথ্যাবলীর খুবই গুরুত্ব রয়েছে। মরণশীলতা হ্রাস পেলে জনসংখ্যার মধ্যে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাবই বিস্তৃত হয়। জনবিজ্ঞানীরা অনুধাবন করেছেন যে মরণসীলতার হ্রাসপ্রাপ্তি উর্বরতার উপর প্ররোহ ফলাফল বিস্তার করে থাকে। বিভিন্ন সমাজ সাংস্কৃতিক কার্যাবলী মরণশীলতার উপর সমধিক প্রভাব ফেলে। যেমন সামাজিক কারনেই ব্যাধি ও মৃত্যু ঘটে থাকে ঠিক তেমনই আবার সমাজ ব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে মৃত্যুহার কমিয়ে দিচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি, স্বাস্থ্য সচেতনতা ইত্যাদি কারণে মৃত্যুর হার বিশেষভাবে নিম্নগামী।

প্রব্রজনকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনর্বন্টনের একটি বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। প্রব্রজন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সমাজকল্যাণ, সমাজ-সংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর তার নানা ক্রিয়া-বিক্রিয়া উপস্থাপন করে। প্রব্রজন মানব ইতিহাসের অতীব প্রাচীন একটি বিষয় তবে এর কারণসমূহ এতবেশী জটিল ও গভীরতাপূর্ণ যে এর সুসম্বন্ধ উপস্থাপন সম্ভব হয় না। প্রব্রজনের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে আবেগপূর্ণ মনোভাব কার্যকরী রূপ গ্রহণ করে। প্রব্রজনের প্রভাব একটি আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে যে ভাবে পড়ে অপর একটি সমরূপী পরিমণ্ডলে তার ধরন একইরূপ নাও হতে পারে। প্রব্রজনের ফলাফল ব্যক্তি এবং সমাজ দুইয়েরই মধ্যে বিকাশলাভ করে। এই ঘটনাটি জন্ম ও মৃত্যুর বিষয়গুলি হতে পৃথক ধারা রচনা করে। প্রব্রজনের প্রধান বিকাশ ক্ষেত্র দুটি — **উৎসের ক্ষেত্র** এবং **গন্তব্যের ক্ষেত্র**। প্রথমটিতে ফলাফল ইতিবাচক হয় এবং দ্বিতীয়টি নেতিবাচক ফলাফল প্রদান করতে পারে। অথবা দুটি ক্ষেত্রে একই ধরনের ফলাফল ঘটতে পারে। তবে ফলাফলের প্রকৃতি সর্বদাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক, জনসাংখ্যিক এবং রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রব্রজনের ধারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ভূখণ্ডের জনচরিত্র রূপায়নে কার্যকরী। প্রব্রজনের পদ্ধতি জনসংখ্যার ঘটনাবলীর ফলাফল সৃষ্টিকারী। যখন কোন ধরনের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ অথবা লোভনীয় চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য শিক্ষিত মানুষেরা আপন এলাকা ত্যাগ করে অন্য দেশে পাড়ি দেয় তখন প্রেরক অঞ্চলের শিক্ষার হার কমে যাবে। অপরদিকে গ্রাহক এলাকার শিক্ষার হার বাড়বে। এই ঘটনা পেশা ভিত্তিক সমাজধারা গঠনেও অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করবে। প্রব্রজন খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস প্রব্রজন প্রভাবিত লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এই প্রব্রজনই ভারতের জনবিন্যাস, ধর্ম, ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানাধরনের বৈচিত্র্য আনয়ন করেছে।

৪.৯ অনুশীলনী

(ক) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

১. উর্বরতা কি? জনবিজ্ঞানে উর্বরতার ভূমিকা কী?

২. মরণশীলতা এবং উর্বরতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী?

৩. উর্বরতার নিয়ন্ত্রণে সামাজিক রীতি-পদ্ধতি নিষেধাজ্ঞার সুষ্ঠু বিবরণ দিন।

৪. বিকাশশীল দেশগুলিতে মরণশীলতার হার কম কেন?

৫. প্রব্রজনের পর্যায়ে উৎসের ক্ষেত্র এবং গন্তব্যের ক্ষেত্র বলতে কী বোঝেন?

(খ) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর দিন —

১. মানব সমাজের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাসের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করুন। সমাজে কী ধরনের জনসংখ্যা আদর্শ হিসেবে গণ্য হয়?

২. উর্বরতার বৃদ্ধিকে সমাজ কিভাবে প্রতিহত করেছে? প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি সমূহের বিবরণ দিন।

৩. উর্বরতা ও শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করুন।

৪. মরণশীলতা বলতে কী বোঝেন? মরণশীলতা কী কী কারণের উপর নির্ভরশীল? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৫. জনসংখ্যায় মরণশীলতার ভূমিকা কী? বিকাশকালীন দেশগুলিতে মরণশীলতা কম হওয়ার কারণ কী?

৬. প্রব্রজন কী? সামগ্রিক জনসংখ্যার প্রব্রজন কী কী প্রভাব সৃষ্টি করে? প্রব্রজনের ফলে কী ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় আলোচনা করুন।

৪.১০ উত্তরমালা

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর —

১. উর্বরতা কথাটি জন্মহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটি একটি জৈবিক ঘটনা হলেও বিভিন্ন সামাজিক লক্ষণাবলী এই উর্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে একথা সাধারণভাবে বলা যায়। তবে কোন মানব সমাজই তার সদস্যদের আপন আপন জৈবিক ক্ষমতা অনুযায়ী বংশবৃদ্ধি করতে দেয় না। বংশবৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ধারা অর্থাৎ উর্বরতার দুর্বার গতিকে সমাজ নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। জনবিজ্ঞান আলোচনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিকারী উর্বরতাকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং তার ফলাফল কী এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিদান করা হয়।

২. মৃত্যুহার এবং জন্মহার অর্থাৎ মরণশীলতা এবং উর্বরতার উপর কোন জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। জনসংখ্যার আকার পর্যালোচনা করলে একথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে উর্বরতার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটলে জনসংখ্যার আকার বৃদ্ধি হয় ঠিকই, তবে এই বৃদ্ধির জন্য মৃত্যুহার হ্রাসও একটি কারণ। কাজেই এই দুটি ঘটনার মধ্যে একটি পারস্পরিক সংযোগ সূত্র রয়েছে।

৩. উর্বরতার উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সমাজ কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যেমন বিবাহের ন্যুনতম বয়স স্থির হয়েছে। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; একক বিবাহের প্রচলনকে জনপ্রিয় করা হয়েছে এবং পরিবারের আকারকে সীমিত করার প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই সব নিষেধাজ্ঞা, আচার-ব্যবহার প্রচলন করে সমাজ উর্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

৪. বিকাশশীল দেশগুলিতে মরণশীলতার হার কম কারণ অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের ফলে এই সব দেশের জনগণ সুষম খাদ্য গ্রহণে সক্ষম। এই সব দেশে উন্নত জনস্বাস্থ্য সেবা এবং ব্যাধি ও মহামারীর উপর বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকার ফলে মানুষের মৃত্যু হার কমেছে। সাম্প্রতিককালে জৈব-রসায়নের বিশেষ উন্নতির ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানও উন্নয়নের চরম স্থানে পৌঁচেছে। এগুলি সবই উন্নয়নশীল দেশে মরণশীলতা কমিয়েছে।

৫. মানব প্রব্রজন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ঘটেছিল — কোথাও খুব বেশী আবার কোথাও খুব কম। সকল সমাজেই এর প্রকোপ একরূপ ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ধরনের মানব প্রব্রজন উচ্চমাত্রা লাভ করেছিল। অতি সম্ভাবনাপূর্ণ দেশ হিসেবে আমেরিকায় প্রব্রজন ইউরোপের জনসংখ্যায় প্রচণ্ড আলোড়ন এনে ছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রব্রজন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

৬. প্রব্রজন ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যে এখানে দুটি বিষয় রয়েছে — একটি গমন এবং অপরটি আগমন। একদল মানুষ আপন দেশ ত্যাগ করে অপর দেশে প্রবেশ করছে। যে দেশ ছেড়ে যাচ্ছে সেটিই হল উৎসের ক্ষেত্র এবং সেখানে পৌঁছচ্ছে তাকে বলা হয় গন্তব্যের ক্ষেত্র।

(ঘ) প্রশ্নাবলীর উত্তর সংকেত

একক নং ৪ এর জন্য যে সকল প্রশ্নগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলির উত্তর দানের জন্য নিম্নবর্ণিত উত্তর সংকেত দেওয়া হল। প্রশ্নগুলির মধ্যস্থিত বিষয় অনুধাবন করে উত্তরগলি দেখে নিন।

১. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য একক নং ৪ এর ৪.১ অনুচ্ছেদটি দেখতে হবে।

২. উর্বরতা সংক্রান্ত এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য অনুচ্ছেদ ৪.২; ৪.২.১; ৪.২.৩ ও ৪.২.৪ আলোচনা করতে হবে।

৩. উর্বরতা ও শিক্ষা পারস্পরিক সম্পর্ক ধারাটি একক নং ৪ এর ৪.৪ অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

৪. এই প্রশ্নের উত্তরটির জন্য ৪ নং এককের ৪.৫; ৪.৬ এবং ৪.৬.১ অনুচ্ছেদগুলি দেখুন।

৫. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য প্রথমে ৪.৫ অনুচ্ছেদ এবং তারপর ৪.৬.২ অনুচ্ছেদ দেখুন। এর সঙ্গে অনুচ্ছেদ ৪.৬ টিরও বিষয়বস্তু যুক্ত করুন।

৬. এই প্রশ্নটির উত্তরদানের প্রারম্ভেই ৪ নং এককস্থিত ৪.৭ অনুচ্ছেদ দেখুন। তারপর ৪.৭.১ অনুচ্ছেদ যুক্ত করুন। এরপর ৪.৮.১ অনুচ্ছেদটি দেখুন।

৪.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Anker, Richard — Demographic Change and the role of women, in Women's Roles and the Population Trends in the Third World, ed. by Anker, Ritch and etal, London, Croom Helm, 1981.

Bangrasrts, John and R. S. Potter — Fertility, Biology and Behaviour : An analysis of Proximate Determinants, New York, Academic Press, 1983.

Hoon, Vinita — Living on the Move, New Delhi, Sage Publications Pvt. Ltd. 1996.

Mahadevan K. — Fertility and Mortality — Theory, Methodology and Empirical Issues, New Delhi, Sage Publication & Pvt. Ltd., 1986.

Do — The Population Dynamics in the Indian states, New Delhi, Mittal Publications, 1989.

Nam, Chartes — Populations and Society, Boston, Haughton Mifflin Co., 1968.

Nurun, Nabi and P. Krishnan — Approaches to the study of Human Migration, in Methodology for Population Studies and Development, ed. by K. Mahadevan and P. Krishnan, Sage Publications Pvt. Ltd., 1993.

Ruzicka, L. T. — Mortality in India, Past Trends and Future Prospects, Conference on the Population of India, Oxford, 1983.

৪.১২ এই পর্যায়ে ব্যবহৃত শব্দের ইংরেজী পরিভাষা

আক্রম—Random

অনুক্রম—Sequence

অনুকল্প—Hypothetical

অণুজনবিজ্ঞান—Micro demography

অনুসূচি—Schedule

অধিগম্যতা—Accessibility

অপনয়ন—Elimination

অপরিহার্য পঞ্জীকরণ—Vital registration

অভিবাসন—Immigration

আদমশুমারি—Census

আন্তর্বিষয়ক—Interdisciplinary

উদ্‌বর্তন—Survival

উন্নত বিবাহগত উত্তরজীবিতা—Improved marital survivorship

উপপদ্ধতি—Subsystem

গর্ভাবস্থার অবসান—Termination of Pregnancy

গর্ভ নিরোধক—Contraception

গর্ভপাত—Abortion

গণসচেতনতা/গণজ্ঞাপন—Mass Communication

গণ স্বাস্থ্যসেবা—Public Health Service

ক্ষমতা প্রদান—Empowerment

ছাড়পত্র—Passport

তপশিলী আদিবাসী—Scheduled tribe

তপশিলী জাতি—Scheduled Caste

দাম্পত্য স্থিতি—Marital status

দ্বৈত লেখ্য পদ্ধতি—Dual record system

নির্বীজকরণ—Vasectomy

নীট জনন হার—Net reproductive rate

ন্যুনতা—Shortcoming

নমুনাচয়ন—Sampling

নমুনাচয়ন পদ্ধতি—Sampling method

পরিকল্প—Scheme

পরিবার পরিকল্পনা—Family planning

পরিবার প্রকল্প—Family programme

পরিসম্পদ—Asset

পরিবেশ—Enviroment

প্ররোহফল—Offsetting effect

প্রব্রজন—Migration

প্রসূতি ছুটি—Maternity leave

পরিসাংখ্যিক বিশ্লেষণ—Statistical analysis

বিবাহকালীন বয়স—Age at marriage

বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়—Nupitality

বিবাহ প্রমাণপত্র—Marriage certificate

বন্ধ্যাকরণ—Sterilization

ভূতাপেক্ষ—Retrospective

ভ্রাম্যমানতা—Mobility

মজুতগণন—Stock taking

মরণশীলতা—Mortality

মহানিবন্ধক—Registrar General

মৃতজাত—Still birth

মৃত্যু পঞ্জীকরণ—Death registration

মৃত্যু প্রমাণপত্র—Death certificate

জনবিজ্ঞান—Demography

জনসংখ্যার ঘনত্ব—Population density

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার—Population growth rate

জনসংখ্যার স্থিতিস্থাপক—Population parameter

জনসংখ্যার পঞ্জী—Population register

জন্মক্রম—Birth order

জন্ম নিয়ন্ত্রণ—Birth control

জন্ম প্রমাণপত্র—Birth certificate

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা—National Sample Survey

জাতীয় সূত্র—National Principle

জীবন নির্বাহ স্তর—Subsistence level

জৈব রাসায়নিক পদ্ধতি—Biochemical Method

যন্ত্রীকরণ—Mechanization

সপ্রতিবন্ধ অর্থব্যবস্থা—Restricted economy

সামাজিক মূল্যমান—Social values

সামাজিক জনবিজ্ঞান—Social demography

সামাজিক বিকাশ—Social development

সামাজিক নির্ধারক—Social determinants

সামাজিক সংগঠন—Social Organisation

সুষম দৃষ্টিভঙ্গি—Balanced view

সুপ্রজনন বিদ্যা—Eugenics

স্থিতিয়—Static

সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি—Decision making Process

একক ১ ❑ ম্যালথাস পূর্ববর্তী জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ জনসংখ্যাবিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা

১.৩.১ কনফিউসিয়াস (confucious)-এর চিন্তাভাবনা

১.৩.২ প্লেটো (Plato)-এর চিন্তাভাবনা

১.৩.৩ John Graunt এবং William Petty-এর চিন্তাভাবনা

১.৩.৪ জনসংখ্যাতত্ত্ব সংক্রান্ত অন্যান্য বক্তব্য

১.৪ সারাংশ

১.৫ অনুশীলনী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে মূলত ম্যালথাস পূর্ববর্তী জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই এককটি থেকে শিক্ষার্থী —

- ম্যালথাস পূর্ববর্তী সময়ে জনসংখ্যা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে যে ধরণের তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল সে সম্বন্ধে এক সম্যক ধারণা লাভ করবেন;
- ম্যালথাস-এর সমসাময়িককাল ও ম্যালথাস পরবর্তীকাল-এ জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার এক সুস্পষ্ট রূপরেখার সন্ধান পাবেন।

১.২ প্রস্তাবনা

মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে জনসংখ্যার আয়তন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে দেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি। সেই কারণেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই এককে ম্যালথাস পূর্ববর্তী জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার আলোচনায় সেই চিত্রই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৩ জনসংখ্যা বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা

যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ধারক হল তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাত্ত্বিকভাবে যাই হোক না কেন, অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক (capitalist), সমাজতান্ত্রিক (socialist) বা মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy) যে নামেই ভূষিত হোক না কেন সব কিছুরই একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষের কল্যাণসাধন। যদিও 'কল্যাণ' শব্দটির তাৎপর্য বহুমুখী এবং ব্যঞ্জনাপূর্ণ। এই আলোচনায় আমরা প্রধান দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেব। বিষয় দুটি হল (১) মানুষের জৈবিক নিরাপত্তা এবং (২) মানুষকে ক্রমশঃ উন্নততর জীবনযাত্রার দিকে নিয়ে যাওয়া।

মানবসভ্যতার ক্রমোন্নতির ধারাকে যদি আমরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে অতীতে প্রায় সর্বত্র বৃহৎ জনসংখ্যা দেশের সমৃদ্ধি ও প্রতীক রূপে গণ্য হতো। অর্থাৎ অতীতে একটা দেশকে অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখতে প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়েছে জনসংখ্যার কর্মক্ষম অংশের উপর। উপযুক্ত কারিগরী জ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাব এর মূল কারণ ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। তদুপরি ধর্মীয় ও নৈতিক শাসনগুলিও তৎকালীন এই ধরণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার মানুষকে খাদ্যশস্যসহ জীবনধারণের অন্যান্য আবশ্যিক পণ্যে অধিকতর উৎপাদনশীল করেছে এবং উন্নততর জীবনযাত্রার সন্ধানও দিয়েছে। ফলে দেশের সম্পদ ও শক্তির বিচারে এল পূর্ণমূল্যায়ন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি ও শিল্পবিপ্লব মানুষের প্রাত্যহিক গোষ্ঠিজীবনে এক নূতন বিপ্লবের সূচনা করলো।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় এই দুই বিপরীত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমৃদ্ধি ও শক্তির প্রতীক, অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধিই দারিদ্র্যের কারণ, অগ্রগতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান এককে আমরা জনসংখ্যা সংক্রান্ত এই দুই বিপরীতমুখী তত্ত্বের উৎস নিয়েই আলোচনা করব।

১.৩.১ ঃ কনিফিউসিয়াস (confucious)-এর চিন্তাভাবনা ঃ

জনসংখ্যা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার শুরু হাজার হাজার বছর পূর্বে হলেও চীনা দার্শনিক Confucious (কনফিউসিয়াস)-এর দার্শনিক চিন্তাভাবনায় তার একটা পরিষ্কার চিত্র দেখতে পাই। Confucious-এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল জমির উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহ। Confucious-এর মতে জনসংখ্যা হ্রাস হলে জমিতে চাষ-আবাদ কম হবে এবং স্বাভাবিক কারণেই রাজস্ব কম সংগৃহীত হবে। অপরদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর প্রভূত চাপ পড়বে। Confucious-এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার অনেকখানিই 'কাম্যজনসংখ্যা' (Optimum population) ধারণার উপর নির্ভরশীল। 'কাম্য জনসংখ্যার' প্রতিপাদ্য বিষয় হল কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ (Natural Resources) পূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়ে থাকে, যাকে 'কাম্য বা সর্বোত্তম জনসংখ্যা' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে সম্পদের উপযুক্ত ও পূর্ণ ব্যবহার করে কোন দেশে যতসংখ্যক মানুষের উচ্চমানের জীবনযাত্রা রক্ষা করা সম্ভব নয়, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে 'কাম্য জনসংখ্যা' বলে (বি। দ্র। ঃ 'কাম্য

জনসংখ্যা'র উপর বিশদ আলোচনা পাঠ্যবস্তুর এই পর্যায়ের একক ৩-এ করা হয়েছে।) অবশ্য Confucious-এর চিন্তাভাবনার 'কাম্য জনসংখ্যা'র কথা প্রাধান্য পেলেও জনসংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনায় বিশেষত বিবাহ, পরিবার ও সন্তানধারণ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মতামত থেকে একথা পরিষ্কার যে তিনি মূলতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমর্থক ছিলেন। অর্থাৎ Confucious-এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল সমৃদ্ধি ও শক্তির প্রতীক।

১.৩.২ ঃ প্লেটো (Plato)-এর চিন্তাভাবনা ঃ

গ্রীক দার্শনিক Plato সমাজদর্শনেও জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূত্র আমরা খুঁজে পাই। দার্শনিক Plato-র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তৎকালীন স্বাধীন গ্রীক নগরী (Greek city states)। সার্বভৌম শাসনাধিকার প্রাপ্ত এই স্বাধীন নগরীর বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করতে গিয়েই Plato জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। Plato-এর মতে সার্বভৌম শাসনপ্রাপ্ত স্বাধীন নগরীতে গ্রীকবাসীর অন্তর্নিহিত শক্তি ও ক্ষমতার পূর্ণবিকাশ জনসংখ্যার আয়তনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অর্থাৎ এই ধরণের নগরীতে জনসংখ্যার আয়তন যা হওয়া প্রয়োজন তাকেই Plato 'কাম্য বা সর্বোত্তম জনসংখ্যা' বলে চিহ্নিত করেছেন।

১.৩.৩ ঃ John Graunt এবং William Petty-এর চিন্তাভাবনা ঃ

জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে যুক্তিসম্মত ও তথ্যসমৃদ্ধ বিচার বিশ্লেষণ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই শুরু হয়। ইংরেজ গণিতজ্ঞ William Petty এই সময়ে জনসংখ্যা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির তিনি নামকরণ করেন Political Arithmetic Petty-র গবেষণা সহযোগী John Graunt কেই সাধারণতঃ আধুনিক জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা জনক (founding father) বলে ধরে নেওয়া হয়।

জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাসে Graunt কে যদি পরীক্ষামূলক জনসংখ্যাতত্ত্বের জনক বলা হয় তবে তার সহযোগী Petty কে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক বা ফলিত জনসংখ্যাতত্ত্বের জনক। Graunt প্রণীত Natural and Political Observations made upon the Bills of Mortality কে বলা যেতে পারে জনসংখ্যাতত্ত্বের তত্ত্বীয় ও পরীক্ষামূলক গবেষণার প্রথম প্রকাশিত দলিল।

এই গ্রন্থে Graunt তৎকালীন লণ্ডন শহর ও তার আশেপাশের গীর্জা ও সমাধিক্ষেত্রে রাখা নামকরণের দলিলে মৃতব্যক্তিদের ব্যক্তিগত বিবরণসমূহকে বিশ্লেষণ করে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ — ইত্যাদির হার এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। যে সামান্য এবং অনেকাংশে অসম্পূর্ণ তথ্যকে ভিত্তি করে Graunt যে বয়স নির্দিষ্ট মৃত্যুহারের সারণী প্রস্তুত করেন তা এককথায় চমকপ্রদ। Graunt প্রদত্ত এই সারণীকে আধুনিক জীবন-সারণীর আদিপুরুষ বলা যেতে পারে। এছাড়া Graunt লণ্ডন শহরের জনসংখ্যা পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেবার চেষ্টা করেন।

William Petty অবশ্য জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিভিন্ন ঘটনার পরিমাপকে অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন। জনসংখ্যা সংক্রান্ত নানা জটিল বিষয়ের সমাধানে জনসংখ্যাতত্ত্বের সেই আদি যুগেও Petty চিন্তাভাবনা করেছেন। তিনি একদিকে যেমন জনসংখ্যার অভিক্ষেপ (Population projection) নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, অন্যদিকে নগরায়ণের সঙ্গে অর্থনৈতিক-সামাজিক

কাঠামোর সম্পর্কের কথা, কর্মজীবী অংশের সঙ্গে জনসংখ্যার গঠন ও বিন্যাসের সম্পর্ক, বেকারত্ব ও আধাবেকারত্ব ইত্যাদি নানা সামাজিক সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামিয়েছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে সীমিত ও অসম্পূর্ণ তথ্যকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করবার যে দৃষ্টান্ত Graunt এবং Petty রেখেছেন তা পরবর্তীকালে ইউরোপের বহুদেশে জনসংখ্যা বিশ্লেষণে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায়। পরবর্তীকালে ম্যালথাস-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আমরা পরবর্তী এককে (অর্থাৎ একক-২) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করবো।

১.৩.৪ ঃ জনসংখ্যাতত্ত্বসংক্রান্ত অন্যান্য বক্তব্য ঃ

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য এখানে আমরা আরও দুই একজন সমাজবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করবো যাঁরা কোনও না কোনভাবে জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।

এদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড-এর Halley-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৬৯৩ সালে Halley প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন-সারণী প্রস্তুত করেন যার উর্দ্ধসীমা ছিল ৮৪ বৎসর। ঐ সারণীতে স্থিতিশীল জনসংখ্যার ছবিটি পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

১৬৯৫ সালের লোক গণনার ভিত্তিতে Gregory King ইংল্যাণ্ডে ও ওয়েলসের জনসংখ্যার হিসাব ও তার গঠন বিন্যাস প্রকাশ করেন।

১৭০৭ সালে ফ্রান্স Sebastian Vauban ফ্রান্সের জনসংখ্যার অনুরূপ হিসাব দেন। Vauban এই প্রসঙ্গে বাৎসরিক গণনার উপযোগিতার কথাও বলেন এবং কার্যপ্রণালীরও যথাযথ নির্দেশ দেন।

জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাসে এই সময়কার (১৭৪১-৬৫) সবথেকে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হ'ল জার্মানীর Johann Sussmilch এর লেখা জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি। Sussmilch নানা ধরনের অনুপাতের (Ratio) হিসাব দেন যেমন, — জনসংখ্যা ও বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু, জন্ম ও বিবাহ, বয়স-নির্দিষ্ট মৃত্যুহার, সমগ্র জনসংখ্যার মৃত্যুহার ইত্যাদি। তৎকালীন বিশ্বের জনসংখ্যার নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রস্তুত করতে যে অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা তাঁর লেখার প্রতিটি ছত্রে ফুটে ওঠে।

১.৪ সারাংশ

সারা বিশ্বে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি সমানভাবে পৃথিবীর সব অংশে হয়নি। একই অঞ্চলে একই দেশে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধির হারও সমান নয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শিক্ষা, শিল্পবিকাশ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চল বা দেশ বা সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ও ব্যবধান যত বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা তত্ত্বের গুরুত্বও ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা গেছে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা তাদের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যাকে দেখেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংখ্যার বিচার বিশ্লেষণ।

১.৫ অনুশীলনী

১) এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(ক) দার্শনিক Confucious কোন্ দেশের লোক ছিলেন?

(খ) Confucious এর জনসংক্রান্ত চিন্তাভাবনা মূলতঃ কোন ধারণার উপর নির্ভরশীল?

(গ) দার্শনিক Plato-র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কী ছিল?

(ঘ) Graunt প্রণীত জনসংক্রান্ত বইটির নাম কী?

(ঙ) পরীক্ষামূলক জনসংখ্যা তত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়ে থাকে?

(চ) ব্যবহারিক বা ফলিত জনসংখ্যা তত্ত্বের জনক কাকে বলা হয়ে থাকে?

(ছ) Graunt কোন্ শহরের জনসংখ্যা পরিবর্তনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন?

(জ) জনসংখ্যার অভিক্ষেপ নিয়ে কে প্রথম আলোচনা করেন?

(ঝ) ১৬৯৩ সালে Halley প্রথম কী প্রকাশ করেন?

(ঞ) জার্মান বিজ্ঞানী Sussmilch-এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সময়কাল কী ছিল?

২) সঠিক / ভুল নির্দেশ করুন ঃ-

ক) যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ধারক হ'ল তার অর্থনৈতিক অবস্থা।

খ) Confucious এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল জমির উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহ।

গ) Confucious মূলতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরোধী ছিলেন।

ঘ) Plato'র আলোচনায় 'কাব্য বা সর্বোত্তম জনসংখ্যার' উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ঙ) William Petty ছিলেন একজন ইংরেজ সমাজ দার্শনিক।

চ) John Graunt কেই আধুনিক জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতার জনক বলা হয়।

ছ) Petty-ই সর্বপ্রথম বয়স নির্দিষ্ট মৃত্যুহারের সারণী প্রস্তুত করেন।

জ) Gregory King লোকগণনার ভিত্তিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী সারণী প্রস্তুত করেন।

ঝ) ১৭০৭ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী Vauban জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনার সূত্রপাত করেন।

৩) **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ-**

ক) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়?

খ) গ্রীক দার্শনিক Plato-র জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনার মূল কথা কী?

গ) Confucious এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

ঘ) পরীক্ষামূলক জনসংখ্যা তত্ত্বের জনক হিসাবে Graunt-র ভূমিকা নির্দেশ করুন।

ঙ) ফলিত জনসংখ্যা তত্ত্বের জনক হিসাবে Petty'র ভূমিকা নির্দেশ করুন।

৪) **বিশদ্ উত্তর দিন ঃ-**

ক) ম্যালথাস পূর্ববর্তী জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার রূপরেখা দিন।

খ) জনসংখ্যা তত্ত্বের ইতিহাসে Graunt ও Petty-র অবদানের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১) মহাপাত্র, অনাদিকুমার — বিষয় সমাজতত্ত্ব, Indian Book Concern [Chapter-16].

২) কর, পরিমল ভূষণ — সমাজতত্ত্ব, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩) Smelser — Sociology [Chap- 3, 8, 13-18].

একক ২ ❑ ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ ম্যালথাসের জনসংখ্যাবিষয়ক মতবাদ

২.৩.১ ম্যালথুসীয় তত্ত্বের মূলকথা ও বৈশিষ্ট্য

২.৩.২ ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমালোচনা

২.৩.৩ ম্যালথুসীয় তত্ত্বের যথার্থতা

২.৪ প্রান্তলিপি

২.৫ সারাংশ

২.৬ অনুশীলনী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককে (একক ১) আমরা জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত নিয়ে আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার চেষ্টা করবো। এই একক থেকে শিক্ষার্থী মূলতঃ

- জনসংখ্যাতত্ত্বের ইতিহাসে ম্যালথুসীয় চিন্তাভাবনার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবেন এবং
- জনসংখ্যা তত্ত্বের ক্ষেত্রে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ও যথার্থতা জানতে পারবেন।

২.২ প্রস্তাবনা

জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে পরিবর্তিত করতে গেলে জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন স্থান, কাল ও সাংস্কৃতির উত্তরাধিকার ভেদে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের বিশ্লেষণ ও তাত্ত্বিক ধ্যানধারণার প্রায়োগিক দিকগুলির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা। বিগত একশ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বিগত কয়েক দশকে দ্বিগুণেরও বেশি। অনুন্নত ও উন্নতিশীল দেশসমূহে এই বৃদ্ধি এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিকগুলি নিয়ে যেমন নতুন করে চিন্তাভাবনা হচ্ছে তেমনি জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সূক্ষ্ম নির্ভরযোগ্য পরিমাপ উন্নততর জনসংখ্যা পূর্বাভাস ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে চলেছে অতি উচ্চ পর্যায়ের গবেষণা।

জনসংখ্যাতত্ত্ব বিবর্তনের ইতিহাসে Thomas Robert Malthus এক কিংবদন্তী পুরুষ। শুধু জনসংখ্যাতত্ত্ববিদদের মধ্যেই নয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যেই Malthus একটি বহুবিতর্কিত ও বহু প্রশংসিত নাম। জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা তাই জনসংখ্যা বিবর্তনের ইতিহাসকে Malthus কে কেন্দ্র করে তিনভাগে ভাগ করেছেন - Malthus পূর্ববর্তীকাল, Malthus এর সমসাময়িককাল ও Malthus এর পরবর্তীকাল। আমরা এই এককে মুলতঃ ম্যালথুসীয় তত্ত্ব নিয়েই আলোচনা করবো।

২.৩ ম্যালথাসের জনসংখ্যাবিষয়ক মতবাদ

জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার আলোচনায় Thomas Robert Malthus (1766 - 1834) এক কিংবদন্তী নাম। এই নীতিবাগীশ, সুপন্ডিত, বৃটিশ ধর্মযাজক ১৭৬৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৫ সালে তিনি ইংল্যান্ডের East India College এর ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। জনসংখ্যার আধিক্যের কথাটা অর্থনৈতিক ভাবনায় প্রথমে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের ইউরোপে গুরুত্ব পায়। বৃটিশ সমাজবিদ ম্যালথাস সাহেবের জনসংখ্যা তত্ত্বে এ কথাটাই স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে ম্যালথাস তাঁর জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিতর্কিত বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। ম্যালথাস প্রবর্তিত জনসংখ্যা তত্ত্ব আজও বহুক্ষেত্রে আলোচিত ও প্রশংসিত। তাই জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার বিবর্তনের ইতিহাসকে ম্যালথাসকে কেন্দ্র করেই মোটামুটি তিন-ভাগে ভাগ করেছেন।

১) ম্যালথাস পূর্ববর্তীকাল ২) ম্যালথাস-এর সমসাময়িক কাল ও ৩) ম্যালথাস-এর পরবর্তীকাল।

২.৩.১ ম্যালথুসীয়তত্ত্বের মূলকথা ও বৈশিষ্ট্য

ম্যালথাসই প্রথম চিন্তাবিদ যিনি জনসংখ্যা পরিবর্তন সম্পর্কে একটি সুসামঞ্জস্য ও সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ তিনিই প্রথম যিনি গণিতের সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করেন জনসংখ্যার দ্রুত মাত্রা বৃদ্ধির হার। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত নির্দেশিকাও তিনি সেই সঙ্গে দিলেন।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ''An Essay on the Principles of Population as it Affects the Future Improvement of Mankind with Remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. condorect and other Writers'' বইটিতে জনসংখ্যা সংক্রান্ত তার তাত্ত্বিক মতামত পোষণ করেন।

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের দু'টি মৌল স্বীকার্য হল ঃ (১) প্রথমত, মানুষের অস্তিত্বের জন্য খাদ্য অপরিহার্য। (২) দ্বিতীয়ত, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণও অপরিহার্য এবং এ আকর্ষণ চিরদিন প্রায় সমমাত্রায় বজায় থাকবে। ম্যালথুসীয় তত্ত্বের মূলকথা, জনসংখ্যার চাপ পৃথিবীর পক্ষে মানুষের আহার্য যোগানের ক্ষমতার তুলনায় অত্যধিক।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সুখ-সমৃদ্ধির পথে মানবজাতির অগ্রগতি নানা সময়ে ব্যাহত হয়েছে। মূলতঃ তার কারণ অনুসন্ধানই ম্যালথাসের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর মতে, যে বড় কারণটি পূর্ববর্তী সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা হল সব প্রাণীর মধ্যেই লভ্য আহার্যের অনুপাতে দ্রুততর হারে বংশবৃদ্ধি করার প্রবণতা। লভ্য

জমি সীমিত হওয়ার ফলে এবং সেইসঙ্গে কৃষিব্যবস্থার জটিলতার জন্য ম্যালথাস এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, মানুষের খাদ্যোৎপাদন খুব অনুকুল অবস্থায় ও শুধু সমান্তর শ্রেণী (arithmetic series)-এর ধারায় বৃদ্ধি পেতে পারে। অন্যদিকে, কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে জনসমষ্টির আয়তন প্রতি ২৫ বছর অন্তর দ্বিগুণ হারে অর্থাৎ একটি গুণোত্তর শ্রেণী (geometic series)-এর ধারায় বৃদ্ধি পাবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনো নির্দিষ্ট সময় (২৫ বছর) অন্তর জনসংখ্যা ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ - এই সারির ন্যায় বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু খাদ্যোৎপাদন হয়তো বৃদ্ধি পাবে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ - এই সারির ন্যায়। সহজেই এমন ভাবা যেতে পারে যে, খাদ্য সরবরাহের মান পাঁচ বা ছয়গুণ বৃদ্ধি জনসংখ্যার ১৬ বা ৩২ গুণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হবে।

স্বাভাবিক কারণেই ম্যালথাসের মতে, দেশে খাদ্যশস্যের যোগানের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন দেশে জনাধিক্যের ফলে দেশের খাদ্যোৎপাদন জনগণের চাহিদা মেটাতে পারে না। জনাধিক্য হওয়ার অর্থই খাদ্যের ঘাটতি, আর খাদ্যের ঘাটতি মানেই অভাব অনটন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধের হাতছানি। ফলস্বরূপ, দেশে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায় এবং জনসংখ্যাও কিছু মাত্রায় কমে। এইভাবে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যালথাসের মতে, এই ভারসাম্য কিন্তু খুবই ক্ষণস্থায়ী। কারণ, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনসংখ্যা গুণোত্তর প্রগতিতে (arithmetical progression) বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু যেহেতু সেইসঙ্গে খাদ্যের যোগান সেই হারে বৃদ্ধি পায় না, সেহেতু অল্পদিনের মধ্যেই দেশে জনাধিক্য দেখা দেয়।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার মূলে যে কয়েকটি মৌলিক ভাবনা কাজ করেছে তার অন্যতম হল মানুষ সামাজিক জীব। স্বাভাবিক কারণেই তার সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের চাপ — এই দুই শক্তির মধ্যে যে টানাপোড়েন তা মনুষ্যতর প্রাণীর তুলনায় খুবই জটিল। বংশবৃদ্ধির সহজাত সংস্কার প্রবল হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মধ্যেই তাকে রাশ টানতে হয়। মানুষের বিচার-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম ক্ষমতাই তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে যাদের সে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসছে তাদের লালন-পালন করার জন্য যথেষ্ট রসদ যোগানো তার পক্ষে সম্ভবপর কি না। ম্যালথাস মনে করেন মানুষ যদি এই ভাবনাতে কার্যকরী করার প্রচেষ্ঠায় নিযুক্ত থাকে তবে সমাজে অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ম্যালথাস নিজে ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানুষ। তাঁর মতে গর্ভপাত বা অনুরূপ কৃত্রিম জনশাসন হল অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। অন্যদিকে, এই ভাবনাচিন্তাকে একেবারেই উপেক্ষা করলে জনসংখ্যা যে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাবে যে অনতিবিলম্বে সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশকেই জীবন ধারণের ন্যূনতম মানেরও নীচে বাস করতে হবে। ম্যালথাসের মতে, বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর্যালোচনা এই অমোঘ নিয়মের সত্যতাই প্রমাণ করে।

বস্তুতঃ, ম্যালথুসীয় তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুটি মূল সূত্র ঃ

১) বেঁচে থাকতে গেলে খাদ্যের প্রয়োজন সর্বদাই থাকবে, এবং

২) পুরুষ ও নারীর মধ্যে যৌন আবেগের সম্পর্ক শুধুমাত্র সর্বজনীন নয় এই সম্পর্ক অপরিবর্তনীয়ও বটে।

অন্যদিকে, জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে ম্যালথাস মূলতঃ তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এই সিদ্ধান্তগুলো হল ঃ

১) কোনো দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সেদেশের খাদ্যের যোগানের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

২) খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও সেইসঙ্গে তার সরবরাহের উন্নতি ঘটলে অবশ্যই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে যদি না কোনো শক্তিশালী প্রতিরোধ এই বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করে।

৩) এই সব প্রতিরোধ বা অন্য কিছু শক্তি যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির অমিত শক্তিকে প্রতিহত করে খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য সরবরাহের সমমাত্রায় নিয়ে আসে তা আত্ম বা নৈতিক সংযম, অসৎ অভ্যাস বা পাপ অথবা দুঃখ-দুর্দশা এই তিনটির কোনো না কোনটার অন্তর্গত।

ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে দুটি বিকল্প প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। এর একটিকে বলা যায় প্রতিষেধক (Preventive), অন্যটি ইতিবাচক (Positive) পন্থা।

প্রতিষেধক পন্থা, বিশেষ করে তা যদি স্বেচ্ছামূলক (voluntary) হয়, সাধারণভাবে মানুষের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য হয় এবং মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ম্যালথাসের মতে, মানুষ তার যুক্তিবত্তার যে বিশেষ উৎকর্ষের ফলে যে দূর ভবিষ্যতের পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে, তা থেকেই এই পন্থার উদ্ভব। ম্যালথাস জন্মশাসন (contra-ception) কে গ্রহণযোগ্য প্রতিষেধক মনে করেননি। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, শিক্ষিত মানুষের বিচারবুদ্ধিই তাকে 'আত্মনৈতিক সংযম' অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আত্ম বা 'নৈতিক সংযম' (moral restraint) বলতে ম্যালথাস বুঝিয়েছেন বেশি বয়সে বিবাহ করা এবং বিবাহ ভিন্ন অন্য কোনরকম যৌন সম্ভোগে লিপ্ত না হওয়া। বিবাহবন্ধনের বাইরে যৌন সম্পর্ক এবং সেই সংগে অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলাফল রোধ করতে কৃত্রিম ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদিকে ম্যালথাস 'অসৎ অভ্যাস বা পাপ কর্ম' (Social vices) বলেছেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, ম্যালথাস জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কখনই ছিলেন না। তার মূল আপত্তি ছিল জন্মশাসনে অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম পদ্ধতির প্রয়োগ। ম্যালথাস স্পষ্টভাবে বলেছেন জন্মশাসনে কৃত্রিমতা শুধু যে অনৈতিক তাই নয়, এই অনৈতিকতা থেকে জন্ম নেয় এমন কিছু উপসর্গ যাকে সহজেই নৈতিক ও সামাজিক পাপ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। ম্যালথাস মনে করেছিলেন, যেহেতু শিক্ষার প্রসার-সীমিত থাকবে তাই বিচারবুদ্ধিও অল্প মানুষেরই থাকবে। ফলে প্রতিষেধক পন্থার পরিবর্তে ইতিবাচক (positive) পন্থাই বেশি কার্যকরী হবে।

ইতিবাচক প্রতিবন্ধক (positive checks) বলতে ম্যালথাস সেই সমস্ত কার্যকারণ বুঝিয়েছেন যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনের মেয়াদ হঠাৎই কমিয়ে দেয়। ম্যালথাসের মতে, এর মূলে 'পাপ' অথবা 'দুঃখ-দুর্দশা' (misery) অথবা দুই-ই থাকতে পারে। এই ধরণের প্রতিবন্ধকের কতকগুলি যেমন বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্ভূত হয়। এগুলিকে দুর্দৈব বলা যেতে পারে। অন্যগুলি মানুষ নিজেই সৃষ্টি করে — যেমন যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অস্বাস্থ্যকর — পেশা, দারিদ্র্য শিশুদের লালন-পালনে শৈথিল্য, অমিতাচার, সবরকমের অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি। মানুষের অশুভ প্রবৃত্তির ক্রিয়ার ফলেই এদের উদ্ভব এবং এরাও তার দুর্দশা ডেকে আনে।

ম্যালথুসীয় তথ্যানুসারে, যদিও পরিণামে খাদ্যসরবরাহের অপর্যাপ্ততার ফলে জনসংখ্যা সীমিত হবেই, তবু মনন্তর ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণ তেমন কার্যকর হয় না। কারণ বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য আর পর্যাপ্ত খাদ্য এ দুই-এর মধ্যে একটা বিরাট প্রভেদ রয়েছে। ফলে, বহুদিন ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, কিন্তু পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে মানুষ অসন্তোষ, অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগবে এবং সার্বিক অশান্তি মানবজীবনকে পীড়িত করবে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ম্যালথাস ভবিষ্যতের একটা নৈরাশ্যজনক ছবি এঁকেছিলেন। তিনি প্রায় সমস্ত জীবন ধরে তাঁর জনসংখ্যা সংক্রান্ত বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যদিও ম্যালথাসের সময়ে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি খুবই অনুন্নত ছিল, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে ম্যালথাস পৃথিবীর নানাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক কারণগুলি পরীক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীকালের জনসংখ্যাতত্ত্ববিদরা ম্যালথাসের এই চিন্তা ভাবনায় এবং তাঁর ব্যবহৃত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে ম্যালথাস জনসংখ্যা সংক্রান্ত যেসব তাত্ত্বিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধ যেভাবে পরবর্তাকালে বিভিন্ন আলোচনা ও গবেষণাকে নানাভাবে উদ্দীপিত করেছে সেইজন্যে ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব আজও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বস্তুত, বলা যেতে পারে পরবর্তী সময়ে জনসংখ্যা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেছেন ও লিখেছেন, তাদের প্রক্যেককেই ম্যালথুসীয়, নব্য-ম্যালথুসীয় এবং ম্যালথাস বিরোধী এই তিনটি বর্গের কোনো একটিতে চিহ্নিত করা যাবে।

২.৩.২ ম্যালথুসীয়তত্ত্বের সমালোচনা

ম্যালথাস উত্তরকালে অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও ধনবিজ্ঞানী তাঁর মতের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কারণ ম্যালথাসের সময় সমাজ ছিল মোটামুটি অচল এবং মানুষের ভূমিকা ছিল গৌণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার মানুষকে খাদ্যশস্যসহ জীবনধারণের অন্যান্য আবশ্যিক পণ্যে অধিকতর উৎপাদনশীল করেছে এবং উন্নততর জীবনযাত্রার সন্ধানও দিয়েছে। এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবক্তাগণই হয়েছিলেন প্রখরতর সমালোচক। তাঁদের মতে, জনগণ বা মানুষই হল যে কোনও দেশের আসল সম্পদ। কারণ, মানুষ কেবল পেট নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না, হাত-পা মাথা নিয়েও জন্মগ্রহণ করে এবং হাত-পা-মাথা খাটিয়েই প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে মানুষই উৎপাদনের গতিশীলতা বজায় রাখবে এবং সভ্যতার রথকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাঁরা আরও মনে করতেন উৎপাদনের অপ্রতুলতা মাঝে মাঝে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বটে, তবে আসল সমস্যা নিহিত থাকে বন্টন ব্যবস্থায়। মুষ্টিমেয় ক্ষমতাবান মানুষ উৎপাদিত সম্পদকে কুক্ষিগত করে মুনাফার পাহাড় গড়ে এবং কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। এই অবস্থার অবসানের জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি মালিকানার কোনও স্থান থাকবে না।

ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়েছে। যেমন —

(১) প্রথমতঃ, পৃথিবীর বহুদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেয়েছে। তাই বলা চলে যে ম্যালথাসের ভবিষ্যৎবাণী যে ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তা প্রমাণিত হয়েছে। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে সেই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা সম্পর্ক আছে। আরও দেখা গেছে যে কোনো দেশের জীবনযাত্রার মান ও শিক্ষার হার যত বাড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও তত কমে আসে। যে সমস্ত দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে, তাদের কাছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি তেমন কোন সমস্যা নয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ, ম্যালথাস বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা চিন্তা করেন নি। ম্যালথাসের তত্ত্ব প্রচারের পর পৃথিবীর অনেক দেশে কৃষি ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে খাদ্যের যোগান যে বহুগুণ বাড়ানো

সম্ভব, ম্যালথাস তা বিচার করেননি। যখন ম্যালথাস তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন সে সময়ে কৃষিকার্য যেসব সম্পদের উপর নির্ভরশীল তা ছিল মূলত ভূমি, জল ও শ্রম। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের মানুষের কাছে কৃষিকার্য ও খাদ্যসংগ্রহ এক দশক থেকে পরবর্তী দশকে সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্রমশ ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণত হয়েছে। কৃষিকর্মে প্রধানত দু'টি সম্পদের বহুল প্রয়োগের ফলেই পরিস্থিতির এমন পরিবর্তন ঘটেছে। এর একটা হল ঃ

- খনিজ তেল থেকে লব্ধ যান্ত্রিক শক্তি, অন্যটি
- বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান

যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই —

- ট্রাক্টর ও অন্য কৃষিযন্ত্রের উৎপাদন ও পরিচালনে,
- সার, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষি — রাসায়নিকের উৎপাদন ও প্রয়োগে
- সেচের জন্য পাম্পের সাহায্যে জল উত্তোলনে, এবং
- খামার থেকে বাজারে বা খামারের মধ্যেই কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও কৃষির উৎপাদন পরিবহনে

কৃষিকার্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারেও সমপরিমাণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। এসব প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে —

- জল ও জমির রাসায়নিক প্রকৃতি নিরূপণ এবং শস্য-উদ্ভিদ ও গৃহপালিত জন্তুর জীনগত গঠন, দৈহিক গঠন ও দেহস্থ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের রূপ নির্ণয়
- কীটপতঙ্গের বাস্তব নিয়ন্ত্রণ
- সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার নক্সা তৈরি এবং
- কৃষিসম্পদের সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবহার।

অনুন্নত দেশগুলিতে সবুজ বিপ্লবের (green revolution) — অর্থাৎ চাষে রাসায়নিক সার ও উচ্চফলনশীল নূতন জাতের ধান ও গমের ব্যবহারজনিত খাদ্যোশস্যোৎপাদনে যে বিস্ময়কর বৃদ্ধি ঘটেছে তার ফলে অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। তাই ম্যালথাস খাদ্যসংস্থান সম্বন্ধে যতটা নৈরাশ্যজনক ছবি এঁকেছিলেন, বর্তমান সময়ে তার যাথার্থ্য অনেকটা হ্রাস পেয়েছে বলা চলে।

(৩) তৃতীয়ত, কোন দেশ খাদ্যোৎপাদনে স্বাবলম্বী না হলেও ঐ দেশ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে পারে। দেখা গেছে, অনেক দেশ আছে যারা শিল্পে উন্নত, অথচ খাদ্যোৎপাদনের দিক দিয়ে স্বনির্ভর নয়। অন্যদিকে দেখা যায়, শিল্পে অনগ্রসর দেশও পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যোৎপাদন করে। এক্ষেত্রে ওই দুই দেশের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য ও খাদ্যশস্যের বিনিময়ের মাধ্যমে খাদ্যসমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়।

(৪) চতুর্থত, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব কোন উন্নয়ন তত্ত্ব নয়। তাঁদের মতে, যেসব দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশি, সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য (zero) হয়। উন্নয়ন বৃদ্ধি

নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেখা গেছে, উন্নত দেশে (developed countries) জন্মহার ও মৃত্যুহার এক নয়। এইসব দেশে কাম্য জনসংখ্যার আয়তন (size of optimum population) সময়ের তালে তাল রেখে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং কাম্য জনসংখ্যার সঠিক পরিধি নির্ণয় করা যায় না। যদি তাই হত, তবে অপরিবর্তনীয় জনসংখ্যার (অর্থাৎ, কাম্যজনসংখ্যা একই থাকলে) জন্যে এত অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন হত না। অপরদিকে, উন্নয়নের প্রবাহকে এগিয়ে নিতে গেলে বেশিসংখ্যক লোকের প্রয়োজন। একইভাবে, কোনদেশের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। তাই দেখা গেছে, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, কানাডা প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ম্যালথুসীয় তত্ত্বের অসাড়তা ধরা পড়ে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে আজকের দুনিয়ার বাস্তব পরিস্থিতির ম্যালথুসীয় তত্ত্ব মূল্যহীন।

২.৩.৩ ম্যালথুসীয়তত্ত্বের যথার্থতা

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই মতবাদের আংশিক সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। ম্যালথুসীয় তত্ত্ব যদিও মূলত জৈবিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে তবুও এই তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল দরিদ্র অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা। যে স্বপ্ন তৎকালীন সমাজ দার্শনিকরা দেখেছিলেন (অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্নতি ও মানুষের যুক্তিপ্রবণমন এক নূতন সমাজবোধের সৃষ্টি করবে), ম্যালথাস শুধু যে সেই স্বপ্নের বাস্তব সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন তা নয়, ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেন ঐ স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

চীন দেশের উদাহরণ দেখিয়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ম্যালথাসের তত্ত্বের যথার্থতা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা সত্ত্বেও সেদেশে এখন অত্যন্ত কঠোরভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত একথা বলা যায় যে, পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির উন্নত অবস্থা বজায় আছে এবং সেসব দেশ মানুষের ভোগের পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে যেতে পারছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত আছে বলেই। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত একশ বছরে জনসংখ্যা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে।

জনসংখ্যাতত্ত্ববিদদের একটা বৃহৎ অংশই মনে করে যে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি। প্রকৃতপক্ষে, ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সঠিক মূল্যায়নের আলোচনা শুরু করার পিছনে মূলতঃ তিনটি কারণ পরিলক্ষিত হয় —

- জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি
- জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত ফলাফলে মানুষের অধিকার সচেতনতা এবং
- কিছু কিছু প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় ও ক্রমবিলুপ্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানী মহলে ঐকমত্য।

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে রেখেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় তিনি আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পবিণাম সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। খাদ্য ও শক্তির প্রচলিত উৎস যে অসীম নয় সে বিষয়ে আমাদের সজাগ করেছেন। একথা অনস্বীকার্য যে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিকল্প খাদ্য ও শক্তির উৎস সন্ধানে আমরা প্রত্যক্ষভাবে তার কাছে ঋণী।

অনেকে মনে করেন, পৃথিবীর জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে অস্বীকার করার উপায় নেই যে আগামী দিনে সারা পৃথিবীতে খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কোন উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের প্রথমদিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে মৃত্যুহার দ্রুত কমে যায়, অথচ জন্মহার প্রায় একই থাকে। এর ফলে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফলস্বরূপ দেশের মাথাপিছু আয় কমতে থাকে যার পরিণতি হল দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হতে থাকে। তাই উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভারতের মত স্বাল্পোন্নত অথচ জনবহুল দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে সকল স্তরের চিন্তাবিদরা — তা রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা বা অর্থনীতি হউক না কেন—বিশ্বের জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ ও উন্নত দেশগুলির সহায়তায় দেশে দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপক কর্মসূচীগ্রহণ নির্দেশ করে যে অতি উচ্চমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সত্ত্বেও ম্যালথাস বর্ণিত উদ্বেগের কারণ এখনও বর্তমান। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যখনই ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ব্যবধান বিপজ্জনক সীমার কাছাকাছি এসে যাবে তখনই ম্যালথুসীয় সূত্র কার্যকারিতা লাভ করবে।

একথাও অনস্বীকার্য যে ম্যালথাসই প্রথম চিন্তাবিদ যিনি জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার কেমন করে রোধ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত মতামত ব্যক্ত করেন। এমনকি, জন্মহার নিয়ন্ত্রণে প্রতিষেধক প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা ম্যালথাসই প্রথম উল্লেখ করেন। এক কথায় বলতে গেলে বর্তমানে আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা পরিবার পরিকল্পনার চিন্তাভাবনা মূলতঃ ম্যালথাস প্রবর্তিত প্রতিষেধক প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত।

পরিশেষে বলা যায় ম্যালথুসীয় জনসংক্রান্ত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্যান্য অনেক শাস্ত্রকে প্রভাবিত করেছে। মূলতঃ দুটি শাস্ত্রের উপর ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় —

■ অর্থনীতি ও ■ জীববিদ্যা

(১) অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo) ম্যালথাস-এর তত্ত্ব ভিত্তি করেই তার বিখ্যাত Iron Law of Wages কথা বলেন। তাঁর মতে, শ্রমিকের যোগান যখনই কমে শ্রমমূল্য তখনই উর্দ্ধগামী হয়। অপরদিকে, অধিক উপার্জন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় এবং সেই সংগে শ্রমবাজারে শ্রমিকের যোগানও বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, শ্রমবাজারে অশুভ প্রতিযোগিতা ও শ্রমমূল্য হ্রাস দুই-ই দেখা দেয়। আরেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) এর মতে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিই হল ম্যালথুসীয় তত্ত্ব। মার্শালের কথায়, এই তত্ত্ব (ম্যালথুসীয়)-কে এক কথায় সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় আরোহ অনুমান পদ্ধতির (inductive method) প্রথম সার্বিক প্রয়োগ।

(২) জীববিদ্যার ক্ষেত্রেও ম্যালথাস-এর জনসংখ্যা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Darwin সাহেবের বিশ্ববিখ্যাত Theory of Evolution (ক্রমবিকাশতত্ত্ব) অনেকাংশে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে জীবজগতে 'স্বাভাবিক নির্বাচনের' (Natural Selection) যে নিয়মের কথা Darwin উল্লেখ করেছেন তার মূল সুত্রই হল ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব। Darwin স্বীকার করেন

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের মাধ্যমেই জীবজগতে ক্রমবিকাশের যে ঘটনা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে, তাঁর প্রকৃতি অনুধাবন করা সহজ।

আধুনিক পরিবেশ জীববিজ্ঞানীরাও (Ecological Biologists) ম্যালথুসীয় তত্ত্বের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছেন। প্রাণী ও জীবজগতে যে প্রতিনিয়ত 'বাঁচার লড়াই' (struggle for survival) চলছে তার জন্যই প্রাণীজগতে ঘটছে ক্রমবিবর্তন। জীবজগতের অন্যান্য প্রজাতিদের মতই মানুষের মধ্যেও ক্রমবিকাশের বীজ নিহিত আছে। ফলে, মানবসমাজের যে অংশ সমাজের চলতি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে না তাদের অবলুপ্তি ঘটবে ও নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে। অন্যভাবে, এইসব জীববিজ্ঞানীরা ম্যালথাস-এর নৈরাশ্যবাদকে সামাজিক প্রজাতির (social progress) মূলশক্তি বলে উল্লেখ করেছেন।

ম্যালথাস-এর মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসর পর পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব সাফল্য, খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং মহাকাশ গবেষণা আমাদের সামনে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। অনেকে যদিও মনে করেন যে ইতিহাসই প্রমাণ করে দিয়েছে যে ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব ভুল, কিন্তু জনসংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌দের একটা বড় অংশই মনে করেন যে ম্যালথাস-এর তত্ত্বের যথার্থতা এখনও বিদ্যমান।

২.৪ প্রান্তলিপি

ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাবৃদ্ধির geometrical progression। — ২৫ বৎসর সময়কে 'একক' (unit) ধরলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি ২৫ বৎসর অন্তর যে হারে পরিবর্তিত হবে তা এইরকম —

	বৎসর								
	০	২৫	৫০	৭৫	১০০	১২৫	১৫০	১৭৫	২০০.....
জনসংখ্যাবৃদ্ধি	১	২	৪	৮	১৬	৩২	৬৪	১২৮	২৫৬.....
খাদ্যোৎপাদনবৃদ্ধি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯.....

অর্থাৎ মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদকের অনুপাত দাঁড়াবে ২৫৬ ঃ ৯, তৃতীয় শতাব্দীর শেষে তা হবে ৪০৯৬ ঃ ১২ এবং দু'হাজার বৎসর পর এই অনুপাত হবে অকল্পনীয়।

২.৫ সারাংশ

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের মূলে যে কয়েকটি মৌলিক ভাবনা কাজ করছে তার একটি হ'ল মানুষ সামাজিক জীব। তাই তার সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের চাপ - এই দুই শক্তির মধ্যে যে টানাপোড়েন তা মনুষ্যতের প্রাণীর তুলনায় খুবই জটিল। বংশবৃদ্ধির সহজাত সংস্কার যথেষ্ট প্রবল হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই তাকে রাশ টানতে হয়। ম্যালথাস মনে করেন যে মানুষ যদি এতে বেশি কর্নপাত করে তবে সমাজে অনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মাত্রা বেড়ে যাবে। আর রাশ না টানলে জনসংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে যে অনতিবিলম্বে বিশ্বের মোট

জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশকেই জীবন ধারনের ন্যূনতম মানেরও নীচে বাস করতে হবে। অবধারিত প্রাকৃতিক বাধাই (খাদ্য ও স্থানাভাব) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে আনবে। ম্যালথাসের মতে বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর্যালোচনা এই অমোঘ নিয়মের সত্যতাই প্রমাণ করে।

২.৬ অনুশীলনী

(১) এককথায় উত্তর দিন।

ক) কোন্ সালে এবং কোথায় Malthus রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন?

খ) কোন্ সালে Malthus জনসংখ্যা সংক্রান্ত তার বিতর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন?

গ) জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনায় ম্যালথাস কোন্ দু'জন লেখকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন?

ঘ) ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে মানুষের খাদ্যোৎপাদন মূলত কোন্ ধারায় বৃদ্ধি পেতে পারে?

ঙ) ম্যালথাসের মতে কোনো নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে জনসমষ্টির আয়তন প্রতি ২৫ বৎসর অন্তর কোন্ ধারায় বৃদ্ধি পায়?

চ) ম্যালথুসীয় তত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে কিসের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে?

ছ) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের মূলে কাজ করা মৌলিক ভাবনাগুলির অন্যতম কী?

জ) জনসংখ্যাসংক্রান্ত আলোচনায় ম্যালথাস ভবিষ্যতের কী ধরনের ছবি এঁকেছিলেন?

ঝ) ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমালোচকগণ মানুষের কী ধরনের ভূমিকার কথা বলেছেন?

ঞ) ম্যালথুসীয় তত্ত্ব মূলতঃ কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে?

(২) সঠিক / ভুল নির্দেশ করুন —

ক) ম্যালথাস মুলতঃ ছিলেন একজন বৃটিশ ধর্মযাজক।

খ) ১৭৯৮ সালে ম্যালথাস East India College-এর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

গ) ম্যালথাসের মতে কৃত্রিম জনশাসন হ'ল নৈতিক ক্রিয়াকলাপ।

ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে ম্যালথাস বিকল্প প্রতিরোধমূলক নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন।

ঙ) আধুনিক অর্থনীতিবিদ্দের মতে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব কোন উন্নয়ন তত্ত্ব নয়।

চ) ম্যালথুসীয় তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল দরিদ্র অনগ্রসর শ্রেণীর অবস্থার পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা।

ছ) উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের প্রথম দিকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে জন্মহার দ্রুত কমে যায়, অথচ মৃত্যুহার প্রায় একই থাকে।

জ) অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, কানাডা প্রভৃতি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে।

ঝ) যেসব দেশে জন্মহার ও মৃত্যুহার দুই-ই বেশি, সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য হয়।

ঞ) ম্যালথাস নিজে ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মানুষ।

(৩) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ—

ক) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ পর্যালোচনায় ম্যালথাস প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলি কী কী?

খ) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের মূল কথা কী?

গ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে ম্যালথুসীয় ইতিবাচক পন্থা কী?

ঘ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ম্যালথুসীয় প্রতিষেধক পন্থা কী?

(৪) বিশদ্ উত্তর দিন ঃ—

ক) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের মূলকথা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

খ) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন করুন।

গ) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের মূলকথা কী এবং বর্তমানে এর যথার্থতা কোথায়, দেখান?

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

ক) মহাপাত্র, অনাদিকুমার — বিষয় সমাজতত্ত্ব, Indian Book Concern [Chap - 16]

খ) কর, পরিমল ভূষণ — সমাজতত্ত্ব, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

গ) Smelser - Sociology [Chap - 3, 8, 13-18]

একক ৩ ❑ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Optimum Population)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ প্রস্তাবনা
৩.৩ কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব কী এবং কেন?
৩.৪ কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ণয়
৩.৫ কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বের মূল্যায়ন
৩.৬ সারাংশ
৩.৭ অনুশীলনী
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

আমরা পূর্ববর্তী দুটি এককে (একক ১ এবং ২) জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্বিক চিন্তাভাবনার অলোচনায় মূলতঃ ম্যালথুসীয় তত্ত্ব (একক ২) ও ম্যালথাস পূর্ববর্তী তত্ত্ব (একক ১) নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এই এককে আমরা ম্যালথুসীয় তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে প্রচলিত অন্য এক তত্ত্বের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। এই একক থেকে শিক্ষার্থী —

- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Optimum Population) সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা লাভ করবেন;
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোচনায় ম্যালথুসীয় তত্ত্বেরও একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা

জনসংখ্যাতত্ত্ব সমাজবিজ্ঞানের এমন একটি বিশেষ শাখা বা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বিজ্ঞানীদের প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করেছে। জনসংখ্যা বিশ্লেষণে ভিন্ন মতাদর্শের বহু মানুষের সমাগম ঘটলেও জনসংখ্যাতত্ত্ব তার স্বকীয়তা কখনও হারায়নি। জীবনের চলমান ও স্বতঃপরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের গঠন ও বিন্যাসের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে তার উদ্‌ঘাটনই জনসংখ্যাতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জনসংখ্যা তাত্ত্বিক ঘটনাবলীর কেন পরিবর্তন হয় এবং তার যথার্থ রূপটাই বা কী তা জনসংখ্যা বিজ্ঞানীরা বুঝতে চান।

৩.৩ কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব কী এবং কেন ?

অধ্যাপক ক্যানান (Cannan) ও সান্ডার্স (Sandars) ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের বদলে 'কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব' (Theory of Optimum Population) নামে একটি বিকল্প জনসংখ্যা তত্ত্ব প্রচার করেন। ম্যালথাসের ন্যায় এই তত্ত্বে শুধুমাত্র খাদ্যের যোগানের সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক বিচারের পরিবর্তে দেশের মোট প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সমস্যাটিকে বিচার করা হয়েছে।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসংখ্যার প্রয়োজন হয় যাকে কাম্য বা সর্বোত্তম জনসংখ্যা বলা হয়ে থাকে। যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ঐ কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় কম হয়, তবে সেই দেশটি জনস্বল্পতার (under population) সমস্যায় ভুগছে বলা যেতে পারে। এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হলে স্বাভাবিক কারণেই বলতে হবে দেশটি জনাধিক্য (over population) সমস্যায় ভুগছে। যদি কোন দেশে বর্তমান জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যা পরস্পর সমান হয়, তবে বলা যেতে পারে যে ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। বিষয়টিকে অন্যভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ সম্পদের উপযুক্ত ও পূর্ণ ব্যবহার করে কোন দেশ যতসংখ্যক মানুষের উচ্চমানের জীবনযাত্রা রক্ষা করা সম্ভব হয়, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

৩.৪ কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ণয়

কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা যায়, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশিষ্ট অধ্যাপক থিরলওয়াল (Thirhwal) চারটি উপায়ের কথা বলেছেন। এগুলি হ'ল ঃ

- কাম্য জনসংখ্যা বলতে সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে নির্দেশ করা যেতে পারে যার দ্বারা দেশের মাথা পিছু আয় সর্বাধিক হবে। অর্থাৎ, যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার অপেক্ষা কম হয়, তবে সেক্ষেত্রে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা কম রয়েছে বুঝতে হবে। এই অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তবে তার সাহায্যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ফলে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, এককথায় যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে কোন দেশের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হবে, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাই হল ঐ দেশের কাম্য জনসংখ্যা।

- কাম্য জনসংখ্যা একটি সর্বনিম্ন কল্যাণের স্তরের (lower level welfare) দ্বারাও সূচিত হতে পারে। এই ধারণানুসারে যতদূর পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উৎপাদন (marginal production) সর্বনিম্ন কল্যাণস্তরের সঙ্গে সমান হবে, সেইটি হবে কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ।

- আবার যদি আমরা ধরি যে উৎপাদন সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব, সেক্ষেত্রে কাম্য জনসংখ্যা হবে যেখানে সর্বনিম্ন কল্যাণস্তর গড় উৎপাদনের সঙ্গে সমান।

- কাম্য জনসংখ্যা হল সেই পরিমাণ জনসংখ্যা যেখানে প্রান্তিক উৎপাদন হল শূন্য অর্থাৎ যেখানে মোট উৎপাদন হল সর্বাধিক।

৩.৫ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল্যায়ন

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অপেক্ষা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি অপেক্ষাকৃত উন্নত, কারণ এই মতবাদে জনসংখ্যার সমস্যাটি শুধু খাদ্য সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে দেশের সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটির কয়েকটি দুর্বল দিক রয়েছে। সেগুলি হ'ল ঃ

- কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ কত তা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। স্বাভাবিক কারণেই আমরা বলতে পারি না যে সেই দেশটি জনস্বল্পতা না জনাধিক্য - সমস্যায় ভুগছে।
- দেখা গেছে, এই তত্ত্বটি স্থিতিশীল (Static)। কারণ, কতকগুলো বিষয় এই তত্ত্বে অপরিবর্তিত আছে তা ধরে নেওয়া হয়। যেমন, দেশের উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদন ব্যবস্থা বা দেশের মোট সম্পদ অপরিবর্তিত আছে এটা এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়। বাস্তবে কিন্তু এটা ঘটে না।
- আর একটি মূল বিষয় হ'ল জনসংখ্যা কী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই তত্ত্বে সে সম্পর্কে কোন রকম আলোকপাত করা হয়নি।
- এই মতবাদনুসারে মাথাপিছু আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংখ্যার কাম্যতা নির্ণীত হয়। কিন্তু যদি আয়ের বন্টন অসম হয়, তবে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হলেই মানবসমাজের শ্রীবৃদ্ধি যে যথেষ্ট হবে, তা বলা যায় না। তাই এই তত্ত্বটি কোন অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব একটি আদর্শ লক্ষ্য মাত্র। দাড়িপাল্লার একদিকে ওজন বেশি হলে অন্যদিকে যেমন ভারসাম্য নষ্ট হয় তেমনি জন্মহার ও মৃত্যুহার অসমভাবে ঘটলে কাম্য জনসংখ্যার স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে। যেহেতু, উপাদানগুলি গতিশীল, তাই কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ পরিবর্তনশীল।

৩.৬ সারাংশ

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের বিকল্প কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দিষ্টসংখ্যক জনসংখ্যার প্রয়োজন হয় যাকে কাম্য বা সার্বভৌম জনসংখ্যা বলা হয়ে থাকে। যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা ঐ কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় কম হয তবে সেই দেশটি জনস্বল্পতা (under population) সমস্যায় ভুগছে বলা হয়ে থাকে। এর বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হলে বলতে হবে দেশটি জনাধিক্য (over population) সমস্যায় ভুগছে। যদি কোন দেশে বর্তমান জনসংখ্যা ও কাম্য জনসংখ্যা পরস্পর সমান হয়, তবে বলতে হয় ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে সম্পদের উপযুক্ত ও পূর্ণব্যবহার করে কোন দেশে যতসংখ্যক লোকের উচ্চমানের জীবনযাত্রা রক্ষা করা সম্ভব হয়, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে।

৩.৭ অনুশীলনী

১) এক কথায় উত্তর দিন ঃ-

(ক) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

(খ) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের বিকল্প তত্ত্বের নাম কী?

(গ) কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ণয় কোন্ সমাজবিজ্ঞানী করেছিলেন?

(ঘ) কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ণয়ে কতগুলি উপায়ের কথা বলা হয়েছে?

(ঙ) কাম্য জনসংখ্যার তত্ত্বে কোন্ সম্পদের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

২) সঠিক / ভুল নির্দেশ করুন ঃ-

ক) Thirwall কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল প্রবর্ত্তক।

খ) Saundars ও Cannan-ই কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ণয় করেছেন।

গ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব হ'ল ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের একটি বিকল্প তত্ত্ব।

ঘ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি সর্বনিম্ন কল্যাণের স্তরের দ্বারাও সূচিত হতে পারে।

ঙ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে মাথাপিছু আয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংখ্যার কাম্যতা নির্ণীত হয়।

৩) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ-

ক) কাম্য জনসংখ্যা বলতে কী বোঝায়?

খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূলকথা কী?

গ) কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের উপায় গুলি বলুন?

৪) বিশদ্ উত্তর দিন ঃ-

ক) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়? ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের সঙ্গে এর পার্থক্য নির্দেশ করুন।

খ) কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সঠিক মূল্যায়ন করুন।

গ) কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা যায় তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১) মহাপাত্র, অনাদিকুমার — বিষয় সমাজতত্ত্ব, Indian Book Concern [Chap - 16]

২) কর, পরিমল ভূষণ — সমাজতত্ত্ব, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩) Smelser - Sociology [Chap - 3, 8, 13-18]

৪) M. K. Premi & Others — Social Demography and Change.

৫) MacIver & Page — Society : An Introductory Analysis, Macmillan, [Chap-22 to 29].

একক ৪ ❑ মার্ক্সীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ মার্ক্সীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা

৪.৩.১ মার্ক্সীয় চিন্তাধারার মূলকথা

৪.৩.২ মার্ক্সীয় মতের ব্যাখ্যা ও বিচার

৪.৩.৩ মার্ক্সীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের যথার্থতা

৪.৩.৪ নূতন মার্ক্সবাদীদের বাস্তববাদী নীতি

৪.৪ সারাংশ

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককগুলিতে আমরা জনসংখ্যা সংক্রান্ত তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছি। মূলতঃ আমরা ম্যালথাস পূর্ববর্তী ও ম্যালথুসীয় তত্ত্ব নিয়ে পর্যালোচনা করেছি। প্রসঙ্গতঃ কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান এককে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা তত্ত্বকে বিবেচনা করা হয়েছে। এই একক থেকে শিক্ষার্থী —

- জনসংখ্যা সম্বন্ধে মার্ক্সীয় চিন্তাধারার একটা ধারণা লাভ করবেন এবং সেই সঙ্গে
- ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব ও মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন।

৪.২ প্রস্তাবনা

আমরা জানি যে জনসংখ্যার আধিক্যের কথাটা অর্থনৈতিক ভাবনায় প্রথমে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ইউরোপে গুরুত্ব পায়। ম্যালথাস সাহেবের জনসংখ্যা তত্ত্বতে একথাটা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে। মার্ক্সবাদী দৃষ্ঠিভঙ্গীতে অত্যধিক জনসংখ্যার ধারনা — আর তাই ম্যালথুসীয় তত্ত্ব — প্রথম থেকেই নিন্দিত হয়ে এসেছে। তাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব জনপ্রিয় হবে এটাই স্বাভাবিক। যে প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বে এক জাতির তুলনায় অন্য জাতিকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট মনে করা হয় বা ধনী দরিদ্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য রয়েছে বলে মনে করা হয়, মার্ক্সবাদীদের মধ্যে ম্যালথুশীয় তত্ত্ব তারই অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ কারণেই এঙ্গেলস্ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে অভিহিত করেছেন। আর একারণেই মার্ক্স জোরের

সঙ্গে বলেছেন যে, 'ম্যালথাসের মধ্যে আমরা পাই এমন লোক যিনি কোন বিজ্ঞান-সেবক নন, বরং এমন এক ব্যক্তি যিনি কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে বিজ্ঞানের অপব্যবহার করেছেন।'

এহেন সম্পূর্ণ বিপরতীমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর মার্ক্সীয় চিন্তাধারাকে এই এককে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.৩ মার্ক্সীয় জনসংখ্যাতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা

Das Kapital এর জার্মান লেখক কার্ল মার্ক্স (Karl Marx, 1818-83) একজন প্রভাবশালী চিন্তাবিদ্ ছিলেন। সাম্যবাদ (Communism) তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেছেন। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যধিক জনসংখ্যার ধারণা — আর তাই ম্যালথুসীয় তত্ত্ব প্রথম থেকেই নিন্দিত হয়ে এসেছে। তাঁদের মতে প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব জনপ্রিয় হবে এটাই স্বাভাবিক। যে প্রতিক্রিয়াশীল তত্ত্বে এক জাতির তুলনায় অন্য জাতিকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট মনে করা হয়, বা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত বৈষম্য রয়েছে বলে মনে করা হয়, মার্ক্সবাদীদের মধ্যে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব তারই অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ কারণেই এঙ্গেলস্ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বকে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' বলে অভিহিত করেছেন। আর একারণেই মার্ক্স জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, ম্যালথাসের মধ্যে আমরা পাই এমন লোক যিনি 'কোন বিজ্ঞান-সেবক নন, বরং এমন এক ব্যক্তি যিনি কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে বিজ্ঞানের অপব্যবহার করেছেন।'

৪.৩.১ ঃ মার্ক্সীয় চিন্তাধারার মূল কথা

মার্ক্সবাদীদের মতে, পশ্চিমী দেশগুলির সকল মানুষের ক্ষেত্রেই যখন সমৃদ্ধি দেখা দিতে থাকে তখন ক্রমশ ম্যালথুসীয় নীতির উপযোগিতা হ্রাস পায়। কিন্তু এশীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে পশ্চিমী লেখকরা নূতন করে মালথুসীয় তত্ত্বকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। দেখা গেছে পশ্চিমী অর্থনীতিবিদ্রা ঔপনিবেশিক শাসনে ব্যাপক দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অনগ্রসতার মতো অস্বস্তিকর বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেন নি। এই পণ্ডিতদের অনেকে ছিলেন উদারনৈতিক এবং এরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তারে পাশ্চাত্য দেশগুলিকে মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। দেখা গেছে একদিকে তাঁরা উচ্চ আদর্শের কথা বলেছেন, অন্যদিকে তাঁদের বাস্তবজীবনে ঔপনিবেশিক দেশগুলির শোষণ লব্ধ সম্পদের উপর নির্ভর করতে গিয়ে সব ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে হচ্ছে। স্বভাবতই তাঁরা এমন একটা ব্যাখ্যা খুঁজতেন যা ঔপনিবেশিক শাসকদের ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে। মার্ক্সবাদীদের মতে এই কারণেই ঔপনিবেশিক দেশগুলির অর্থনৈতিক সমস্যার প্রশ্নে উদারনৈতিক চিন্তাবিদরা অত্যধিক জনসংখ্যার তত্ত্ব (Over population theory) নাম দিয়ে মালথুসীয় তত্ত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেন।

মার্ক্সবাদীরা মনে করেন জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধের প্রবক্তরা সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে কাজ করেছেন। কারণ, মার্ক্সবাদীদের মতে, সাম্রাজ্যবাদ অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা সীমিত করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাকে খর্ব করতে চায়। বস্তুত, তাঁদের মতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসংখ্যার আধিক্য কোন সমস্যাই নয়। উৎপাদন ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশে জনসংখ্যা বরং সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির অর্থ শোষক সম্প্রদায়ের ধনবৃদ্ধি, পক্ষান্তরে শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের

রিক্তাবস্থা। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজের সকল সদস্যের কল্যাণস্বার্থেই উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

৪.৩.২ ঃ মার্ক্সীয় মতের ব্যাখ্যা ও বিচার ঃ

মার্ক্স যে ম্যালথাসের উপর ব্যক্তিগত ভাবে এবং তাত্ত্বিক দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছিলেন তাঁর কারণ এই নয় যে, জনসংখ্যা সম্বন্ধে মার্ক্স-এর কোন বিকল্প তত্ত্ব ছিল। বরং বলা যেতে পারে মূল কারণটি হল এই যে, ম্যালথাসের জীবতাত্ত্বিক নিয়মের সঙ্গে মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক নিয়মের কোন সাযুজ্য নেই। মার্ক্সের কথায় ''যদি ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব অভ্রান্ত হয়, তবে আমি এই মজুরির লৌহ কঠোর নিয়ম (Iron law of wages)-এর যথার্থ খণ্ডন করতে পারি না কারণ, এই নিয়মের স্থান শুধু মজুরি-শ্রম ব্যবস্থার উপর নয়, প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থার উপর।'' মার্ক্স তাই যুক্তি দেখালেন যে, জনসংখ্যাধিক্য শুধু ধনতান্ত্রিক মালিকানা প্রথার মধ্যেই ঘটতে পারে। তিনি দাবী করলেন ধনতান্ত্রিক মালিকানা-প্রথারই দরকার বেকারি বা 'আপেক্ষিক অর্থে উদ্বৃত্ত শ্রমিক'।

এই দাবীর অযৌক্তিকতা নির্দেশ করতে গিয়ে সমকালীন জার্মানী ও জাপানের অবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে বিপুলতম বেকারসমস্যা দেখা যাবে সেসব দেশে যে দেশগুলি কৃষিভিত্তিক এবং যেখানে বৃহৎ ও দ্রুত বর্তমান জনসমষ্টি রয়েছে। আবার সেসব দেশেও দেখা যাবে যেখানে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পূর্ণভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

মার্ক্স-এর মতানুসারে, শুধু মানুষের শ্রমই কাঁচা মালে মূল্য আরোপ করতে পারে। তাই যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমশ সাম্যতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে তার পক্ষে অতিরিক্ত শ্রমমাত্রই অনুকূল হবে। কিন্তু শ্রমের অতিরিক্ত একক থেকে ক্রমশ ক্ষীয়মান উৎপাদনের সম্ভাবনা; অর্থাৎ বলা যেতে পারে যন্ত্র ও হাতিয়ারের সরবরাহ সমান থাকলে, অতিরিক্ত শ্রমনিয়োগ সত্ত্বেও মাথা পিছু উৎপাদন কমে আসে। আবার যদি শুধু শ্রমের সংযোজনেই কাঁচা মালে মূল্য আরোপিত হত, তবে বিভিন্ন জাতি-তা ব্যক্তিগত মালিকানারই হোক বা সামাজিক মালিকানারই হোক — শিল্পায়নের জন্যে সামান্যই উৎসাহ পেত।

মার্ক্স-এর জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল কথা এইরূপ ঃ

- শ্রমিক শ্রেণী তাদের পরিশ্রম দিয়ে শুধু যে পুঁজিই বৃদ্ধি করে তা নয়, এই পুঁজি বৃদ্ধি করে তারা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয় এবং এক কথায় কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধৃত। একমাত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেই ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা দেখা যায়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসংখ্যাবৃদ্ধির গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব নয়।
- স্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে নিয়ন্ত্রিত শ্রমশক্তির উদ্ভব হয়, পুঁজিবাদী-উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। শ্রমিক নিয়োগের স্বাধীনতা যাতে অক্ষুন্ন থাকে এবং কার্যত শ্রমিকদের যাতে শোষণ করা যেতে পারে সেই হেতু স্বাভাবিক বৃদ্ধির অতিরিক্ত এক বিশাল শিল্প শ্রমিক বাহিনীর প্রয়োজন হয়।

- ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব। বেকার ও আধাবেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি এমনকি দারিদ্র্যবৃদ্ধি ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার কৃত্রিম ফসল।

৪.৩.৩ ঃ মার্ক্সীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের যথার্থতা ঃ

একথা ঠিক যে ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্ব মূলত ধ্রুপতী অর্থনীতিবিদ্ অ্যাডাম্ স্মিথ (Adam Smith) এর চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত। এই ধ্রুপদী অর্থনৈতিক চিন্তাভাবনার মূলকথা হল ব্যক্তি স্বতন্ত্র, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, নিজস্বার্থ ও সীমাহীন প্রতিযোগিতা। এই চিন্তাভাবনার বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে কার্ল মার্ক্স স্বাভাবিক কারণেই ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

মার্ক্স যদিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে জনসংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু কার্যত দেখা গেছে মার্ক্স এর এই বিশ্বাসের ভিত্তি খুব একটা দৃঢ় নয়। মার্ক্স এর জনসংখ্যা সম্পর্কিত বক্তব্য গভীরভাবে অনুধাবন করলে এটা পরিষ্কার হয় যে কেবলমাত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমর্থকদের সমালোচনা করবার জন্যই তিনি জনসংখ্যা সমস্যা সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন।

আশ্চর্যের কথা এই যে মার্ক্স এর Das Kapital গ্রন্থে আমরা কোথাও পরিষ্কারভাবে কম্যুনিস্ট জনসংখ্যা তত্ত্ব কি তাঁর উল্লেখ পাই না। অন্যদিকে মার্ক্স বলেছেন যে মানব প্রজাতি সম্বন্ধে কোন সাধারণ ও সার্বভৌম জনসংখ্যাতত্ত্ব সম্ভব না হলেও প্রতিটি উৎপাদন ব্যবস্থায় তার একান্ত নিজস্ব জনসংখ্যাতত্ত্ব থাকা সম্ভব। এবং সেই যুক্তিতেই বলা যেতে পারে যে কম্যুনিজম ও জনসংখ্যাবৃদ্ধির একটি বিশেষ সূত্র মেনে চলে যা কিনা ম্যালথুশীয় তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু সেই সুত্রটি ঠিক কি তা মার্ক্স কোথাও পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেন নি।

সর্বোপরি, ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বকে সমালোচনা করতে গিয়ে মার্ক্স মূলত ম্যালথাসকে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ ও ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। এতে একটা কথা পরিষ্কার হয় যে ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বকে বাস্তবোচিত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমালোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও যুক্তির অভাব ছিল।

৪.৩.৪ ঃ নূতন মার্ক্সবাদীদের বাস্তববাদী নীতি ঃ

আমাদের দেশের মার্ক্সবাদীদের মধ্যেও দু-একজন আছেন যাঁরা বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি বিচার করতে চেয়েছেন। এখানে আমরা অধ্যাপক জ্ঞানচাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। অধ্যাপক জ্ঞানচাঁদের মতে, ম্যালথাস কর্তৃক তৎকালীন বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি ও ধর্মযাজক হিসেবে তাঁর জীবন দর্শন-এ দুটি বিষয়ই মার্ক্সকে প্রভাবিত করেছিল ম্যালথাসের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণে তাঁর জনসংখ্যাতত্ত্বের কঠোর সমালোচনায়।

কিন্তু ম্যালথাসের তাত্ত্বিক স্বীকারগুলি সম্বন্ধে মার্ক্সের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে তাঁর পক্ষে ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি। সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতেও বলা যেতে পারে যে, জনসংখ্যা এমন হারে বাড়তে পারে যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে দৈন্য-দুর্দশার সৃষ্টি হয় এ কথাটা যদিও ঠিক, তবুও মানবিক জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে সেই সময় যতটুকু জানা যেত তা থেকে ধরা হত যে, মানুষের প্রজনন ক্ষমতা সমাজের প্রগতির পক্ষে এমন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে যা সমাজব্যবস্থা নিরপেক্ষ।

জ্ঞানচাঁদ স্বীকার করেন যে, জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় খানিকটা যুক্তিহীন বিতর্কে মার্ক্সের জড়িয়ে পড়ার ফলে তাঁর অনুগামীদের পক্ষে আজ পর্যন্ত ও খোলা মনে জনসংখ্যা সমস্যার আলোচনা সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করে দেখা যাবে যে, মানুষের জন্মদান ক্ষমতা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে একটা বিরাট গতিশীল শক্তিতে পরিণত করেছে, যে শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ মুক্ত রাখা সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়।

অধ্যাপক জ্ঞানচাঁদ দুটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

- বিজ্ঞানের উপর মার্ক্সবাদীদের অগাধ আস্থা। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শোষণ-মুক্ত ও যেখানে সকলের সমান সুযোগ রয়েছে সেখানে প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে প্রাচুর্য আনা সম্ভব এমন প্রত্যয়।
- পক্ষান্তরে, সত্যিকারের মার্ক্সবাদী তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে, যদি জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও সম্পদের পূর্ণবিকাশ সত্ত্বেও সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে কার্যকর প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারার কোন কারণ নেই।
- জ্ঞানচাঁদ আরও বলেন যে, অতীতের ভুলগুলি শুধরে নিতে হবে এবং জন্মশাসনের মাধ্যমে পরিবার সীমিত রাখাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নের সমস্যা গোড়া ম্যালথুসীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও গোঁড়া মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব নয়। উভয়ই অংশত সঠিক; কিন্তু উভয়রই সার্থকতা সীমিত। মানবজীবনের মান উন্নয়নের জন্য শুধু অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস বা শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ যথেষ্ট নয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে।

৪.৪ সারাংশ

Marx-এর জনসংখ্যা তত্ত্বের সারাংশ এইরকম —

শ্রমিকশ্রেণী (পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের পরিশ্রম দিয়ে শুধু যে পুঁজিই বৃদ্ধি করে তা নয়, এই পুঁজি বৃদ্ধি করে তারা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যার ফলে তারা নিজেরাই হয়ে পড়ে অপ্রয়োজনীয়। সোজা কথায় কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্বৃত্ত (Surplus)। এবং এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। একমাত্র ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেই ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা। বস্তুত, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যতরকম উৎপাদন ব্যবস্থার সন্ধান আমরা পাই তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই তার একান্ত নিজস্ব জনসংখ্যা তত্ত্ব যুক্ত আছে। তাদের ঐতিহাসিক বৈধতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু বিমূর্ত জনসংখ্যাতত্ত্ব (law of population in the abstract) কেবলমাত্র গাছপালা ও জীবজন্তুদের ক্ষেত্রেই সম্ভব এবং তাও সম্ভব যদি না মানুষ তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। অর্থাৎ Marx-এর মতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যত দ্রুত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তত দ্রুত কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় না। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি সম্ভব নয়। সেই কারণেই বেকার বা আধাবেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় দারিদ্র্য।

Marx-এর মতে, স্বাভাবিক জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যে নিয়ন্ত্রিত শ্রমশক্তির উদ্ভব হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা কখনই তাতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। শ্রমিক নিয়োগের স্বাধীনতা যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই কারণে স্বাভাবিক বৃদ্ধির অতিরিক্ত এক বিশাল শিল্প শ্রমিক বাহিনী তার দরকার। অর্থাৎ শ্রমিকদের হাতে ইচ্ছেমত শোষণ করা যায় সেই কারণেই প্রয়োজনের তুলনায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা সব সময়েই বেশী রাখা হয়।

৪.৫ অনুশীলনী

১) এক কথায় উত্তর দিন ঃ-

(ক) Karl Marx কোন্ দেশের লোক ছিলেন?

(খ) Das Kapital কার রচনা?

(গ) কোন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে Marx জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে বলেছেন?

(ঘ) ম্যালথুসীয় তত্ত্বের উপযোগিতার হ্রাস প্রসঙ্গে Marx কোন্ দেশের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন?

(ঙ) Marx কোন্ সমাজ ব্যবস্থার কথা বিশেষভাবে বলেছেন।

(চ) জ্ঞানচাঁদ কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন?

(ছ) মানব জীবনের মান উন্নয়নে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাথে কিসের সমন্বয় সাধন আবশ্যক হয়ে পড়েছে?

(জ) ম্যালথুসীয় তত্ত্বের বাস্তবোচিত সমালোচনার ক্ষেত্রে Marx -এর কোথায় ত্রুটি ছিল?

(ঝ) Marx কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে / ক্ষেত্রে উদ্বৃত্তের কথা বলেছেন?

(ঞ) প্রয়োজনের তুলনায় কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা সব সময়েই বেশী রাখা হয় কেন?

২) সঠিক / ভুল নির্দেশ করুনঃ-

(ক) Marx ম্যলথুসীয় তত্ত্বকে শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে 'যুদ্ধ ঘোষণা' বলে অভিহিত করেছেন।

খ) মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে স্বাভাবিক কারণেই প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে ম্যালথুসীয় তত্ত্ব জনপ্রিয়।

গ) মার্ক্সবাদীদের মতে সাম্রাজ্যবাদ অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা সীমিত করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করে।

ঘ) ম্যালথাসের জীবতাত্ত্বিক নিয়মের সঙ্গে মার্ক্সীয় অর্থনৈতিক নিয়মের কোন সাযুজ্য নেই।

ঙ) মাক্স-এর মতে জনসংখ্যাধিক্য শুধু মাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে।

চ) Marx-এর মত অনুসারে শুধু মানুষের শ্রমই কাঁচা মালে মূল্য আরোপ করতে পারে।

ছ) Marx-এর Das Kapital-এ কম্যুনিষ্ট জনসংখ্যা তত্ত্বের পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়।

জ) বর্তমান বিশ্বের উন্নয়নের সমস্যা গোড়া ম্যালথুসীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও গোড়া মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সমাধান করা যায় না।

ঝ) ম্যালথুসীয় জনসংখ্যাতত্ত্ব মূলতঃ ধ্রপদী অর্থনীতিবিদ Adam Smith-এর চিন্তাভাবনার দ্বারা প্রভাবিত।

ঞ) কম্যুনিজমও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি বিশেষ সূত্র মেনে চলে।

৩) **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ-**

ক) মার্ক্স-এর জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল কথা কী?

খ) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকা কী?

গ) মার্ক্সীয় ও ম্যালথুসীয় তত্ত্বের পার্থক্য নির্দেশ কর।

৪) **বিশদ্ উত্তর দিন ঃ-**

ক) মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে জনসংখ্যা তত্ত্বের যথার্থতা নির্দেশ করুন।

খ) মার্ক্সীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব ও ম্যালথুসীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

গ) মার্ক্সীয় জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রকৃতি নির্ধারণ করুন এবং এই প্রসঙ্গে নূতন মার্ক্সবাদীদের বাস্তববাদী নীতি নিয়ে আলোচনা করুন।

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১) মহাপাত্র, অনাদিকুমার — বিষয় সমাজতত্ত্ব, Indian Book Concern.

২) কর, পরিমল ভূষণ — সমাজতন্ত্র, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩) Michael Haralambos — **Sociology : Themes and Perspectives.**

৪) R. M. MacIver & C. H. Page — **Society : An Introductory Analysis.**

একক ৫ ❑ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্ব (Theory of Demographic Transition)

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের উদ্ভব ও মূলকথা

৫.৪ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের প্রবক্তাগণ

৫.৫ জনসংখ্যার সম্ভাবনাসূচক বৃদ্ধির পর্যায়

৫.৬ জনসংখ্যার সংক্রমণগত বৃদ্ধির পর্যায়

৫.৭ জনসংখ্যার উপক্রান্ত বৃদ্ধির পর্যায়

৫.৮ **Bougue** প্রবর্তিত জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়

৫.৯ **Peterson** প্রবর্তিত জনসংখ্যা পরিবর্তনের তত্ত্ব

৫.১০ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

৫.১১ প্রান্তলিপি

৫.১২ সারাংশ

৫.১৩ অনুশীলনী

৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককগুলির আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করলাম যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি কতকগুলো বিশেষ কারণের ওপর নির্ভরশীল/তাদের মধ্যে জনসংখ্যা। জনসংখ্যাই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যে কোন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য জনসংখ্যাই হল একটি সক্রিয় উপাদান। এই এককটিতে মূলত, জনসংখ্যাবৃদ্ধিতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি থেকে শিক্ষার্থী —

- জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্ব (Theory of Demographic transition) সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করবেন;
- জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতামত জানতে পারবেন।

৫.২ প্রস্তাবনা

একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা একটি নির্দিষ্ট সমাজবিজ্ঞানের শুধুমাত্র একার চারণক্ষেত্র হওয়া উচিত নয়। গণতত্ত্ব বা জনমিতি (demography), সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে জনসংখ্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। জনমিতি (Demography) ছাড়া অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা খুবই সীমিত। সমাজতত্ত্ববিদদের (Sociologists) জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। নৃতত্ত্ববিদদের (Anthropologists) কাছে মানুষের তিনটি সমস্যা জনসংখ্যা আলোচনায় স্থান পেয়েছে —

- মানুষের বিবর্তন
- মানুষের বংশপরম্পরা, এবং
- মনুষ্যজাতির শ্রেণীবিভাগ

অর্থনীতিবিদরা তাদের কোন প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জনসংখ্যার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন জনমিতি ধাঁচের (Demography pattern) কোন অর্থনীতিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় তাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। অনুরূপভাবে, ইতিহাসবিদরা জনসংখ্যার ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করেন অর্থাৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের আলোচ্য বিষয় হল কালের বিবর্তনে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি।

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীরা এই মত পোষণ করেন যে কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম বা দ্রুত তা অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ দেশের অর্থনীতি ও শিল্পোদ্যোগ কোন স্তরে রয়েছে তার ওপর। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সম্পর্ক আলোচনায় যে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত — এই এককে আমরা তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

৫.৩ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের উদ্ভব ও মূলকথা ঃ

অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বহুদেশে জনসংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খ্রীষ্টের জন্মের সময় থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দু'গুণ বেড়েছিল। কিন্তু পরবর্তী মাত্র একশ-পঞ্চাশ বছরে সেই জনসংখ্যা দু'গুণ হল। এ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই জাগে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে কোনটি কারণ ও কোনটি ফলাফল? অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে না প্রতিহত করে?

সমাজবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা এই অভিমত পোষণ করেছেন যে কোন দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ভর করে ঐ দেশের অর্থনীতি ও শিল্পোদ্যোগের অবস্থানের উপর। অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয়, তাই জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সমক্রমণ তত্ত্ব (Theory of Demographic Transition) নামে পরিচিত।

১৯২৯ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই তত্ত্বের কথা প্রথম বলেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হল ঃ

- শিল্পোন্নয়নের ফলে যে কোন দেশেই জন্মহার, মৃত্যু নিবারণ ও জন্মপালন প্রযুক্তি প্রয়োগের দরুণ প্রথমে কমতে থাকে মৃত্যুহার এবং জন্মহার কমতে শুরু করে আরও অনেক পরে।
- মৃত্যুহার ও জন্মহার হ্রাসের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।
- সময়ের এই ব্যবধান থাকে বলেই উন্নতিশীল দেশগুলির জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- দেখা গেছে উচ্চহারে জন্ম ও মৃত্যু ঘটবার জন্যই সংক্রমণ পুরু হবার লগ্নে জনসংখ্যা প্রায় একটা স্থির বিন্দুতে অবস্থান করে।

জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু কিছু মিল লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল ঃ

- জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ
- নিম্ন উৎপাদনশীলতা
- চাষবাসের উপর অত্যধিক নির্ভরতা
- অপর্যাপ্ত ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
- চিকিৎসার যথাযথ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা
- প্রতিষেধক ঔষধের অভাব এবং সর্বোপরি
- উচ্চহারে জন্ম ও মৃত্যু।

এই তত্ত্ব অনুসারে শিল্পোন্নত নয় এমন সব দেশেরই সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো এমন যা উচ্চ জন্মহারে সহায়তা করে। আবার এই উচ্চ জন্মহারের জন্যই উচ্চ মৃত্যুহারের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় না। দেখা গেছে, শিল্পের প্রসার না হওয়ায় এই সমস্ত দেশে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কৃষিক্ষেত্রে চলে আসে। কিন্তু কার্যত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের ভাগ্যে পুরো সময়ের কাজ জোটে না। অন্যদিকে, ভোগ্যপণ্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, কিন্তু শ্রমমূল্য প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে যায়। তারফলে, দারিদ্র্য সীমার নীচে জনসংখ্যার একটি বড় অংশকে বাস করতে হয়।

এককথায় বলা যেতে পারে জনসংক্রমণ তত্ত্বের মধ্যে এমন একটা সহজ কাঠামো আছে যার সাহায্যে যে কোন দেশের জন্ম ও মৃত্যুহারের ধরণধারণের পর্যালোচনা সহজ ও যুক্তিসম্মত হয়।

৫.৪ জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের প্রবক্তাগণ

আগের এককে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের উদ্ভব ও মূলকথা নিয়ে সংক্ষিপ্তকারে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এই এককে বিশিষ্ট কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানীর চিন্তাধারাকে তুলে ধরা হয়েছে।

তিরিশের দশকে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ওয়ারেন থমসন (Warren Thomson) অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জনসংখ্যাবৃদ্ধির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে তত্ত্বের কথা বলেন তাই জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্ব (demographic transition theory) নামে পরিচিত লাভ করে। থমসন যদিও এই তত্ত্বের কথা ১৯২৯ সালে প্রথম বলেন এবং পরবর্তীকালে আর এক সমাজবিজ্ঞানী C. P. Blacker ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত তার ''Population and Peak in the Pacific'' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন, তবুও এদের দু'জনের কাউকেই জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের জনক বলা হয় না। কেননা এরা কেউই জন্মহারের কেন পরিবর্তন ঘটে তার সঠিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেননি। তবে ১৯৪৫ সালে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় (University of Chicago) এক প্রবন্ধে বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Frank Notestein এই সংক্রমণতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। আমরা এখানে Notestein-এর চিন্তাভাবনাগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করবো।

জন্মহার কেন কমছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে Notestein বলেন যে অনগ্রসর দেশগুলিতে উচ্চ জন্মহারের পশ্চাতে কিছু কিছু বিশেষ কারণ দেখা যায়। এর মধ্যে ঃ

- ধর্মীয় উপদেশ
- নৈতিক বাণী
- সামাজিক আইনকানুন
- শিক্ষা
- সাম্প্রদায়িক প্রথা ও
- পরিবারের গঠন, ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Notestein আবার এও দেখিয়েছেন যে অনগ্রসর দেশগুলিতে উচ্চহারে মৃত্যুর ফলে জনসংখ্যা যাতে কমে না যায় সেই জন্য প্রয়োজন ছিল দ্রুত বংশবৃদ্ধির। Notestein এর মতে মৃত্যু হার যখন কমতে শুরু করে উচ্চ জন্মহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশাসনগুলির গুরুত্ব ক্রমশ কমতে থাকে এবং সেই কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বাধা নিষেধ ধীরে ধীরে উঠে যায়, জন্মহারও ক্রমশ কমতে থাকে।

Notestein এর মতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জন্মহার কমার পিছনের কারণগুলি যদি হয় নেতিবাচক (Negative) তাহলে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে জন্মহার কমছে ইতিবাচক (Positive) কারণে। এই কারণগুলি হ'ল ঃ

- শহরাঞ্চলের পরিধির দ্রুত বৃদ্ধি

- শহরাঞ্চলের বিশাল ও দ্রুত পরিবর্তনশীল জনসংখ্যা এবং
- যৌথ পারিবারিক জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন ও শহরকেন্দ্রিক এক নতুন সংস্কৃতির (New culture) উদ্ভব।

নতুন এই শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির মূল মন্ত্র হল ব্যক্তিগত উচ্চাশা (individual ambition)। দেখা গেছে বড় পরিবার অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির বাধাস্বরূপ হয়ে দাড়ায়। এ হেন বৃহৎ পরিবারে প্রচলিত বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা ও সামাজিক অনুশাসনের প্রাধান্যই বেশি। এক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা ও আকাঙ্খার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না।

Notestein এর মতে শহরকেন্দ্রিক শিল্পসভ্যতার বিকাশই জন্মহারে প্রার্থিত পরিবর্তন আনে। এককথায় বলা যেতে পারে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিত্যনতুন ব্যবহার এবং তার ক্রমবর্ধমান উন্নতি মানুষকে শুধু উন্নতমানের জীবনেরও সন্ধান দেয় না, তার ব্যক্তিগত জীবনেও নতুন গতির সঞ্চার করে।

Notestein এর মূল বক্তব্য হল দরিদ্র রক্ষণশীল দেশে জন্মহার বেশী হবার কারণ মূলতঃ তিনটি ঃ

- উচ্চ মৃত্যুহার
- ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্খা চরিতার্থ করবার যথেষ্ট সুযোগের অভাব, এবং
- শিশুর আর্থিক মূল্য (economic value of children)

অবশ্য শহরাঞ্চলের বিস্তার, শিল্পপ্রসার ও জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটি কারণেরই আস্তে আস্তে অবলুপ্তি ঘটে।

Notestein ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জনসংক্রমণ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন উন্নত দেশগুলিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে তাকে মোট চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। এই পর্যায়গুলি হল ঃ

- উচ্চ জন্মহার ও মৃত্যুহার
- উচ্চ জন্মহার, মৃত্যুহার নিম্নমুখী
- জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইই নিম্নমুখী
- নিম্ন মৃত্যুহার কিন্তু জন্মহারের তুলনায় বেশী

উপরোক্ত চারটি পর্যায়গুলির মধ্যে চতুর্থ পর্যায়টির অর্থাৎ নিম্ন মৃত্যুহার কিন্তু জন্মহারের তুলনায় বেশী, স্থায়িত্ব খুবই সাময়িক। কারণ, এই অবস্থায় জনসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। অনেক সময়ে দেখা গেছে সাময়িকভাবে বহিরাগতদের সাহায্যে কলকারখানা ইত্যাদিতে উৎপাদনে স্থিতাবস্তা বজায় রাখা গেলেও খুব তাড়াতাড়িই জন্মহারকে এমন একটা পর্যায়ে তুলে আনা হয় যার ফলে জনসংখ্যা হ্রাসজনিত স্থায়ী পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে এ ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

বস্তুতঃ Notestein প্রবর্ত্তিত পর্যায়গুলির প্রথম তিনটি পর্যায় নিয়েই আজকের জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্ব গঠিত। Notestein এই তিনটি পর্যায়কে ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে ঃ

- উচ্চ সম্ভাবনা সূচক বৃদ্ধি (High Potential Growth)
- সংক্রমণগত বা ক্রান্তি পর্যায় বৃদ্ধি (Transitional Growth)
- উপক্রান্ত বৃদ্ধি (latipient Growth)

Notestein এই পর্যায়গুলিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটাও বলেছেন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই ত্রি-স্তর ভাগকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। যেমন ঃ

- বিশ্বের জনসংখ্যার পরিবর্তনের এক কালানুক্রনিক বর্ণনা
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতির শ্রেণীবিন্যাস
- জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ নির্ণয় ও তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
- আগামী দিনে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা নির্দেশ করা।

আমরা এবার এই তিনটি পর্যায় কে পরের এককগুলিতে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

৫.৫ জনসংখ্যার উচ্চ-সম্ভাবনা সূচক বৃদ্ধির পর্যায় (Stage of High Ptential Growth):

জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্বে Notestein বর্ণিত প্রথম পর্যায়টি হল পুরাতন স্থিতাবস্থারই অনুরূপ। আর এই পুরাতন স্থিতাবস্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা। একথা ঠিক যে জীবনযাত্রার মান কোনো না কোনো কারণে উন্নত হলেই দেখা গেছে মৃত্যুহার কমতে থাকে এবং সেই সঙ্গে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি এই পর্যায়ে মানুষের গড় লক্ষ্য করা যায়। বয়সের বিন্যাস (Age distribution) জনসমগ্রকে উচ্চ জন্মহার বজায় রাখতে সাহায্য করে। আর এই সব কারণেই জনসংখ্যার এই প্রথম পর্যায়কে বলা হয় উচ্চ সম্ভাবনা সূচক বৃদ্ধির পর্যায় (Stage of High Potential Growth)।

এই পর্যায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ

- নিম্নমানের উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন প্রযুক্তি
- গতানুগতিক শক্তি ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা এবং
- অনতিবিলম্বে জীবনধারণের মানোয়ন্নয়নের ক্ষীণ সম্ভাবনা।

অতীতের অভিজ্ঞতা বলে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশই কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই পর্যায়ভুক্ত ছিল। আবার সাম্প্রতিক কালে এইসব দেশে মৃত্যুহার কমতে থাকায় জনসংখ্যা প্রবল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কয়েকটি দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এখনও সুযোগ রয়েছে, কারণ জনঘনত্ব (Population Density) সেখানে কম। তবে বেশীর ভাগ দেশেই এই চিত্র যে সম্পূর্ণ বিপরীত তা বলা যেতে পারে। দেখা গেছে, জনসংখ্যার ক্রমাগত ও দ্রুত বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনে যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ঐসব দেশে জীবনযাত্রার মান সেইমাত্রায় উন্নত নয়। একথা বলা যেতে পারে যে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশই এই প্রথম পর্যায়ভুক্ত নয়।

৫.৬ জনসংখ্যার সংক্রমণগত বৃদ্ধির পর্যায় (Stage of Trasitional Growth):

প্রথম পর্যায়ের জন্ম ও মৃত্যুহারের সমতার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি বর্তমান তা যদি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে আমরা পৌঁছে যাবো এই দ্বিতীয় পর্যায়ে যা সংক্রমণগত বৃদ্ধির পর্যায় (Stage of Transitional Growth) হিসেবে পরিচিত। দেখা গেছে, যে সমস্ত দেশে মৃত্যুহার কমতে শুরু করেছে কিন্তু জন্মহার প্রায় প্রথম পর্যায়ের স্তরে (অর্থাৎ উচ্চ-জন্মহার) অথবা জন্মহার কমতে শুরু করেছে কিন্তু তার গতি মৃত্যুহার কমার গতির তুলনায় অনেক কম, সেই সব দেশ জনসংখ্যা পরিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়-এ পৌঁছে গেছে।

Notestein দেখিয়েছেন যে, নিম্নমুখী মৃত্যুহারের কারণগুলি হ'ল ঃ

- অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে জীবন ধারণের মানের কিছুটা উন্নতি
- যোগাযোগ ও খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় উন্নতি
- জনস্বাস্থ্য সচেতনতা ও জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ মনোযোগ
- পরিশ্রুত পানীয় জলের সরবরাহ ইত্যাদি।

আবার, অন্যদিকে অপরিবর্তিত বা ধীরে ধীরে জন্মহার হ্রাসের কারণগুলি এই রকম ঃ

- মানুষের পুরাতন অভ্যাস
- মানুষের অন্ধ বিশ্বাস ও
- মানুষের মূল্যবোধ

একথা ঠিক যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটে, তবে তা ঘটে অত্যন্ত ধীর গতিতে। শিক্ষায় অনগ্রসর যারা তারা যুক্তির থেকে প্রচলিত রীতিকেই গ্রাহ্য করে থাকে। এবং দেখা গেছে এইসব কারণেই মৃত্যু ও জন্মহার কমার মধ্যে সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। এবং এই মধ্যবর্তী সময়ে (Transition Period) জনসংখ্যার গড় বৎসরে ২-৩% বা তারও বেশী হতে পারে। জনসংখ্যার এই দ্রুতবৃদ্ধির জন্য অনেকে এই পর্যায়কে 'জন বিস্ফোরণ অধ্যায়' (Stage of Population Explosion) আখ্যা দিয়ে থাকেন।

বিশ্বের দেশভিত্তিক জনসংখ্যার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে সমস্ত দেশ মৃত্যুহার হ্রাসে যথেষ্ট সফলতা পেয়েছে অথচ জন্মহার রোধে তেমন কিছু করে উঠতে পারেনি, তাদের জনসংখ্যা প্রচন্ড গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ, লাতিন আমেরিকার দেশগুলি, দক্ষিণ ইউরোপ, পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই তুলনায় ইউরোপের দেশগুলি অনেক আগেই প্রথম পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমনকি এদের এক বৃহৎ অংশ তৃতীয় পর্যায়েও পৌঁছেছে। আমরা এখন এই তৃতীয় পর্যায় নিয়ে আলোচনা করবো।

৫.৭ জনসংখ্যার উপক্রান্ত বৃদ্ধির পর্যায় (Stage of Incipient Decline):

জনসংখ্যার উপক্রান্ত বৃদ্ধির পর্যায়কে বুঝতে গেলে আমাদেরকে এক কুণ্ডলীকৃত স্প্রিং (Spring)-এর আচরণকে জানতে হবে। আসলে কোন দেশের জনসংখ্যার পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনকে কুণ্ডলীকৃত আচরণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রথম পর্যায়কে যদি আমরা তুলনা করি পুরো মাত্রায় দম দেওয়া একটা স্প্রিং এর সঙ্গে, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়কে তুলনা করা যায় হঠাৎই চাপ মুক্ত প্রবলভাবে প্রসারিত ঐ স্প্রিং ঘর আচরণের সঙ্গে এবং দম শেষ হওয়া প্রসারিত ঐ স্প্রিং কে তুলনা করা যেতে পারে জনসংখ্যা পরিবর্তনের শেষ পর্যায়ের সঙ্গে।

স্প্রিং এ যখন মাত্রায় দম থাকে তখন আয়তনে তা ছোট দেখালেও তার মধ্যে সঞ্চিত থাকে প্রচুর পরিমাণে শক্তি (Potential energy)। হঠাৎ চাপমুক্তের ফলে স্প্রিং প্রচন্ড গতিতে (Kinetic energy) প্রসারিত হয়। এবং এই প্রচন্ড গতির জন্য প্রসারণ ক্ষমতার স্বাভাবিক মাত্রা থেকেও কিছুটা বেশী প্রসারিত হয়। এর ফলে সম্প্রসারণের পরই কিছুটা সংকোচন হয় এবং প্রসারণ ও সংকোচন পর্যায়ক্রমে কিছুক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়।

অনুরূপ ভাবে জনসংখ্যা পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও এই সূত্র লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে, উন্নত দেশগুলিতে জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে একটা সমতা এসেছে যাকে আমরা নতুন স্থিতাবস্থা বলতে পারি। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা হয় খুব ধীরে ধীরে বাড়ছে নয়ত বাড়ছেই না। আবার প্রথম পর্যায়েও জনসংখ্যা প্রায় স্থিতিশীল ছিল যাকে আমরা 'পুরাতন স্থিতাবস্থা' বলতে পারি, অর্থাৎ যেখানে ছিল উচ্চ জন্ম ও মৃত্যুহারের সমতা। তৃতীয় পর্যায়ে আবার যখন ঐ স্থিতাবস্থা ফিরে এলো তখন জন্ম ও মৃত্যুহার অনেক হ্রাস পেয়েছে। বিশেষকরে মৃত্যুহার এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে সেখান থেকে তা আর কমানো সম্ভব নয়। যদিও বা কমে তা কমবে অতি ধীরে ধীরে।

মৃত্যুহার হ্রাসের পিছনে যে সমস্ত কারণ থাকে তা সহজবোধ্য এবং দেখা গেছে সবদেশেই তার প্রকৃতি মোটামুটি একই রকম। অন্যদিকে, জন্মহার হ্রাসের পিছনে যেসব কারণ কাজ করে তাদের প্রকৃতি মোটেই সহজ ও সরল নয়। আসলে, জন্মহার হ্রাসের কারণগুলো খুব সূক্ষ্ম ও জটিল। এককথায় বলা যেতে পারে এগুলি মূলতঃ

- সামাজিক ও
- মনস্তাত্ত্বিক

এই পর্যায়ে যেসব ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে তারা সকলেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত এবং স্বাভাবিক কারণেই তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই উঁচু। ইউরোপের বিস্তৃত অংশ, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ ইতিমধ্যেই তৃতীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এইসব উন্নত দেশের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল ঃ

- উচ্চ উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কাঠামো
- উচ্চমানের কর্মদক্ষতা এবং
- উচ্চ জীবনযাত্রার মান

আমরা আগেই জেনেছি যে চতুর্থ পর্যায়টি (অর্থাৎ, নিম্নমৃত্যুহার যা জন্মহারের তুলনায় বেশী) তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় স্থান পেলেও বাস্তবে এর অস্তিত্ব দেখা যায় না। যদি তা দেখাও যায় (যেমন বর্ত্তমানে সুইডেনে) তা নিতান্তই সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী।

৫.৮ Bougue প্রবর্তিত জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায় ঃ

সত্তর দশকে সমাজবিজ্ঞানী J. J. Bougue তাঁর Principles of Demography গ্রন্থে সারা বিশ্বের জনসংখ্যা পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়কে অন্য নামে অভিহিত করেছেন। যেমন ঃ

Stage I ● সংক্রমণ পূর্ব অবস্থা (Pre-transitional Stage)

Stage II ● সংক্রমণ অবস্থা (Transitional Stage)

Stage III ● সংক্রমণ উত্তর অবস্থা (Post transitional Stage)

Bougue দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ সংক্রমণ অবস্থাকে আরও ধাপে ভাগ করেছেন। তা হ'ল ঃ

- **সংক্রমণের প্রাথমিক অবস্থা (Early Transitional Stage)** ঃ এক্ষেত্রে সাধারণত মৃত্যুহার কমার দিকে ও জন্মহার উপরের দিকে থাকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মায়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য জন্মহার সামান্য বৃদ্ধি পায়।
- **সংক্রমণের মধ্যবর্তী অবস্থা (Mid Transitional Stage)** ঃ এক্ষেত্রে দেখা যায় জন্মহার ও মৃত্যুহার দুইই হ্রাস পায়, যদিও জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় যথেষ্ট বেশী।
- **সংক্রমণের শেষ-অবস্থা (Late Transitional Stage)** ঃ এক্ষেত্রে জন্ম ও মৃত্যুর হার যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায় যদিও জন্মহার মৃত্যুহারের তুলনায় কিছুটা বেশী লক্ষ্য করা যায়। জন্ম ও মৃত্যুহারের ব্যবধান যথেষ্ট হ্রাস পাবার জন্য জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

৫.৯ Peterson প্রবর্তিত জনসংখ্যা পরিবর্তন তত্ত্ব ঃ

বিভিন্ন দেশের জনবৃদ্ধির প্রকৃতিতে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আগেই দেখেছি যে এক একজন সমাজবিজ্ঞানী এই বৃদ্ধির হারকে এক একটি নাম দিয়েছেন। আমরা এখানে সমাজবিজ্ঞানী Peterson এর সামাজিক বিশ্লেষণকে সংক্ষিপ্তকারে বলার চেষ্টা করবো।

Peterson এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে তিনটি মূল পর্যায়ে ফেলা যায়। তা হ'ল ঃ

- প্রাক্ শিল্পীয় পর্যায় (Pre-Industrial Stage)

- নবীন পাশ্চাত্য পর্যায় (Early Western Stage)
- আধুনিক পাশ্চাত্য পর্যায় (Modern Western Stage)

সমাজবিজ্ঞানী Peterson জনবৃদ্ধির হার অনুযায়ী তিনধরণের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। নীচের সারণি থেকে এর একটি চিত্র পাওয়া যাবে।

পর্যায় / হার	জন্ম	মৃত্যু	জনবৃদ্ধি	অর্থনীতি
1. প্রাক্-শিল্পীয় (Pre-Industrial)	বেশী	বেশী পরিবর্তনশীল	স্থান থেকে কম (State to low)	আদিম বা কৃষিভিত্তিক
2. নবীন পাশ্চাত্য (Early Western)	বেশী	কমের দিকে	বেশী	মিশ্র
3. আধুনিক পাশ্চাত্য (Modern Western)	নিয়ন্ত্রিত সাধারণভাবে কম থেকে মাঝারি	কম	কম থেকে মাঝারি	শহর শিল্পায়িত ও মিশ্র

৫.১০ 'জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সংক্রমণ তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Demographic Transition Theory)

আক্ষরিক অর্থে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির তত্ত্বকে (Theory of Demographic Transition) ঠিক তত্ত্ব বলা যায় না। মানব ইতিহাসে জনসংখ্যার ক্রমবিবর্তনের যে অভিজ্ঞতা আমরা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা ধরনের উৎস থেকে পাই, তারই একত্রিভূত রূপ হ'ল এই Demographic Transition Theory.

জনসংখ্যা পরিবর্তনের মূল সূত্রটি (অর্থাৎ, পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন) সব দেশের পক্ষেই প্রযোজ্য হলেও অনেক অন্য বিষয়ে দেশে দেশে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মহার ও মৃত্যুহার পরিবর্তনের গতি একের পরিবর্তনের সংগে অন্যটির পরিবর্তনের সম্পর্ক, সময়ের প্রেক্ষাপটে হ্রাস-বৃদ্ধির গতি ইত্যাদি বহু বিষয়েই এক দেশের সংগে অন্য দেশের পার্থক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

দুটি দেশের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুহারের যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (Natural Increase) সমান হতে পারে।

আবার কোন কোন দেশ শিল্পোন্নত না হয়েও মৃত্যুহার যথেষ্ট কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে।

অন্যদিকে কোন কোন দেশে শিল্পোন্নয়ন সত্ত্বেও মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে বেশী।

আবার এও দেখা গেছে, দুটি দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও শিল্পোন্নয়ন একই ধরনের হওয়া সত্ত্বেও জন্ম ও মৃত্যুহার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

মূলতঃ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির জনসংখ্যা পরিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতেই জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির তত্ত্বের সূত্রপাত। ইউরোপের এইসব দেশগুলিতে মৃত্যুহার হ্রাস, শিল্প প্রসার, নগরায়ন ও শিক্ষার বিস্তার প্রায়-একই সংগে ধীরে ধীরে ঘটেছে এবং জন্মসংখ্যা হ্রাস কিছু পরে হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুহারের নিম্নগতি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিক্ষার বিস্তার জন্মহার নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা শুরু থেকেই নিয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে অনুন্নত দেশগুলি যদি জন্মহার নিয়ন্ত্রণে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির উদাহরণ অনুসরণ করে তাহলে জন্ম ও মৃত্যুহারের সমতা যতদিনে আসবে ততদিনে এইসব দেশের জনসংখ্যা এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যে তখন সবরকম অগ্রগতির পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

একথাও ঠিক যে উন্নত দেশগুলিতে জন্মহার নিয়ন্ত্রণে প্রায় কখনই সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়নি। এমন কি প্রয়োজন হয়নি জন্মহার কমিয়ে আনবার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বে সব উন্নয়নশীল দেশেই জন্মনিয়ন্ত্রণ জাতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শুধু হয়নি, অগ্রাধিকারও পেয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। সব উন্নতিশীল দেশই স্বীকার করে নিয়েছে যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত কমিয়ে আনতে হবে।

জনসংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি তত্ত্বের প্রয়োগগত সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি দেশকেই তার জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে একটা সমতা আনতেই হবে। কোন দেশ যদি তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নাও করে তবুও এই সমতা আসবেই। বর্তমানে শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসাবাণিজ্য ও প্রযুক্তির উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিটি কিছু না কিছু দেশের উপর নির্ভরশীল। বলা হয়, আন্তর্জাতিক দাবিকে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং জন্ম ও মৃত্যুহারে সমতা আসবেই।

৫.১১ প্রান্তলিপি

Thompson এবং Notestein এর মত আর কয়েকজন সমাজবিজ্ঞানী জনসংখ্যার ক্রমবিবর্তনের সংগে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে আমরা কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি।

- C. P. Blaker
- Karl Sax ও
- Adolphe Landry

সম্প্রতি United Nations Population Division-এর জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ Tabbrah জনসংখ্যা পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি আকর্ষণীয় তত্ত্বের কথা বলেছেন। তাঁর মতে আকাঙ্খিত সন্তানসংখ্যা (desired number of children) এবং গড়ে কটি সন্তানের পক্ষে সাবালকত্যে পৌঁছানো সম্ভব তার ভিত্তিতে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিবর্তনের পর্যায় নির্ধারণ করা সম্ভব।

৫.১২ সারাংশ

আমরা এই এককে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের একটা সংক্ষিপ্তরূপ তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার এইরকম ঃ শিল্পোন্নয়নের ফলে যে কোন দেশেই মৃত্যুহার প্রথমদিকে কমে আসে, জন্মহার কমতে শুরু করে অনেক পরে মূলতঃ মৃত্যু নিবারণ ও জন্মশাসন প্রযুক্তি-প্রয়োগের ফলে। মৃত্যুহার ও জন্মহার হ্রাসের মধ্যে থাকে বেশ কিছুটা সময়ের ব্যবধান। এবং এই ব্যবধান থাকে বলেই উন্নতিশীল দেশগুলির জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে সংক্রমণ শুরু হবার ঠিক আগে জনসংখ্যা প্রায় একটা স্থির বিন্দুতে অবস্থান করে। উচ্চহারে জন্ম ও মৃত্যু ঘটবার জন্যই তা হয়ে থাকে। সংক্রমণ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশেই সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়ে কিছু কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় — জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, চাষবাসের উপর অত্যধিক নির্ভরতা, নিম্নমানের প্রযুক্তি, অপর্যাপ্ত ও অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য বিষয়ে উদাসীনতা, চিকিৎসার অপ্রতুলতা, রোগ প্রতিষেধক ঔষুধের অভাব এবং উচ্চহারে জন্ম ও মৃত্যু। সুষম ও পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে মৃত্যুহার শুধু যে বেশী তাই নয়, জনসংখ্যার আকস্মিক হ্রাস ও বৃদ্ধিও প্রায়ই দেখা যায়। শিল্পোন্নত নয় এমন সব দেশেরই সামাজিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো এমন যা উচ্চজন্মহারে উৎসাহ যোগায়। উচ্চ জন্মহারের জন্যই উচ্চ মৃত্যুহারের প্রভাব প্রায় বোঝাই যায় না। এই সমস্ত দেশে শ্রমিকের সংখ্যা বিপুল। শিল্পের প্রসার না হওয়ার জন্য এইসব শ্রমিক গিয়ে ভিড় করে চাষবাসে। কৃষি উৎপাদন তার ফলে বৃদ্ধি পেলেও বেশীর ভাগ শ্রমিকেরই পুরো সময়ের কাজ জোটে না। ভোগ্যপণ্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু শ্রমমূল্য প্রায়ই পরিবর্তিত হয় না। ফলে দারিদ্রসীমার (poverty line) নীচে জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশকে বাস করতে হয়।

৫.১৩ অনুশীলনী

(১) এক কথায় উত্তর দিন ঃ-

ক) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণতত্ত্ব বলতে কি বোঝায়?

খ) কোন্ সমাজবিজ্ঞানী কবে এই তত্ত্বের কথা প্রথম বলেন?

গ) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের সাহায্যে আমরা জনসংখ্যার কোন্ কোন্ বিষয়ের পর্যালোচনা করতে পারি?

ঘ) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের জনক কে এবং কেনই বা তাকে এই আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে?

ঙ) Notestein উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলির জন্মহার কমার কারণগুলি কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

চ) Notestein কোন্ প্রেক্ষাপটে এবং কিভাবে জনসংক্রমণ তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করেছেন?

ছ) পরিবর্তিত বা ধীরে ধীরে জন্মহার হ্রাসের কারণগুলি কী?

জ) কোন সময়ে এবং কোথায় সমাজবিজ্ঞানী Bougue জনসংখ্যা পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করেন?

ঝ) Thompson ও Notestein, Peterson ও Bougue ছাড়া আরও তিনজন সমাজবিজ্ঞানীর নাম উল্লেখ করুন।

(২) নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি 'সঠিক' না 'ভুল' নির্দেশ করুন ঃ

ক) সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা মূলতঃ জনসংখ্যার ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করে।

খ) জনসংখ্যা সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্‌দের আলোচ্য বিষয় হ'ল কালের বিবর্তনে জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি।

গ) জনসংখ্যা সংক্রমণ তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ঘ) ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত Population and Peace in the Pacific গ্রন্থের লেখক হলেন - C. P. Blacker।

ঙ) সমাজবিজ্ঞানী Thompson Warren জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের জনক।

চ) Notestein জনসংক্রমণ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উন্নত দেশগুলির পরিবর্তনকে মোট তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন।

ছ) Notestein বর্ণিত জনসংখ্যার উচ্চ-সম্ভাবনা সূচক বৃদ্ধির পর্যায়ে মানুষের গড় আয়ু খুব বেশী।

জ) সমাজবিজ্ঞানী Bougue তার Principles of Demography গ্রন্থে জনসংখ্যা পরিবর্তনের মূল চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন।

ঝ) সমাজবিজ্ঞানী Peterson তিরিশের দশকে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রান্ত তত্ত্ব পেশ করেন।

(৩) সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ

ক) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্ব বলতে কি বোঝায়? কবে, কোথায় এবং কিভাবে এর উদ্ভব হয়?

খ) জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল কথাগুলি ব্যক্ত করুন।

গ) জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্ত করুন।

ঘ) অনগ্রসর দেশগুলিতে উচ্চ জন্মহারের পশ্চাতে কারণগুলি কি কি?

ঙ) Notestein প্রবর্ত্তিত জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি তত্ত্বে মূল চারটি পর্যায়ের উল্লেখ করুন।

চ) জনসংখ্যার উচ্চ-সম্ভাবনা সূচক বৃদ্ধির পর্যায় বলতে কী বোঝায়? এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করুন।

ছ) নিম্নমুখী মৃত্যুহার ও অপরিবর্তিত বা ধীরে ধীরে জন্মহার হ্রাসের কারণগুলির উল্লেখ করুন।

জ) সমাজবিজ্ঞানী Bougue প্রবর্ত্তিত জনসংখ্যা পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়গুলির উল্লেখ করুন।

ঝ) সমাজবিজ্ঞানী Peterson বর্ণিত জন্মবৃদ্ধিহারজনিত সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করুন।

(৪) **বিশদ উত্তর দাও ঃ**

ক) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি সংক্রমণ তত্ত্বের মূলকথা কি? এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তাগণের চিন্তাভাবনাগুলি আলোচনা করুন।

খ) জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির সংক্রমণ তত্ত্বের উদ্ভব ও মূলকথা নিয়ে আলোচনা করুন। এই তত্ত্বের মূল্যায়ন করুন।

৫.১৪ গ্রন্থপঞ্জী

১) মহাপাত্র, অনাদিকুমার — বিষয় সমাজতত্ত্ব, Indian Book Concern.

২) কর, পরিমল ভূষণ — সমাজতন্ত্র, প. ব. রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩) Michael Haralambos — **Sociology : Themes and Perspectives.**

৪) R. M. MacIver & C. H. Page — **Society : An Introductory Analysis.**